বাংলার মতুয়া ধর্ম ও ধর্ম সাহিত্যের আলোচনা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

স্নিগ্ধা মণ্ডল

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০১৭

ঘোষণা

আমি **'বাংলার মতুয়া ধর্ম ও ধর্ম সাহিত্যের আলোচনা'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এটি অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্টের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোন অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

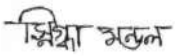

(স্নিগ্ধা মণ্ডল)

গবেষক

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,

সূচক - ৭৩৪০১৩

ড. অঙ্কুশ ভট্ট
অবসৃত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকঘর : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটি
রাজা রামমোহনপুর, জেলা : দার্জিলিং
সূচক - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : ..... তারিখ : .....

শংসাপত্র

স্নিগ্ধা মণ্ডল আমার তত্ত্বাবধানে **'বাংলার মতুয়া ধর্ম ও ধর্ম সাহিত্যের আলোচনা'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভ তাঁর মৌলিক রচনা।

এটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি। আমি স্নিগ্ধা মণ্ডলের সাফল্য কামনা করি।

অঙ্কুশ ভট্ট
১৭/৩/২০১৭

অঙ্কুশ ভট্ট
অবসৃত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
সূচক- ৭৩৪০১৩

গবেষণা অভিসন্দর্ভের
বস্তুসার

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে ধর্মজাগরণের আলোক সম্পাতে নগরকেন্দ্রিক সমাজ জীবন কিঞ্চিত উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও গ্রামীণ সমাজে সেই আলোক পৌঁছায়নি। বাংলাদেশের যে ধর্মজাগরণ তা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজে ছিল গণ্ডীবদ্ধ। সমাজ কল্যাণে সর্বব্যাপী শিক্ষার বিস্তার তখনও ঘটেনি। সেকথা বলা যায়, ধর্মীয় শিক্ষায়, আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি; গ্রামীণ সমাজ তখনও লাভ করতে পারে নি। ঊনবিংশ শতকে সমাজ সংস্কার হচ্ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভারতের প্রাচীন ধর্ম সংস্কৃতির সন্ধান করে পুরানো সংস্কৃতিতে যুক্তি বিচারের আলোয় নতুন জীবনচর্যা গঠনের প্রয়াসী হয়েছেন সংস্কারকগণ। যেমন—রাজা রামমোহন রায় ধর্মসংস্কার করে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেন। এবং নব্য হিন্দুধর্মের জাগরণ হচ্ছিল; হিন্দুত্ববোধ প্রবল আকার ধারণ করে সংস্কারকগণের হাতে। এই ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের প্রেক্ষাপটে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের ধর্ম ধর্মজাগরণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই ধর্মজাগরণের প্রভাব আলোচনা করবো।

গবেষণা প্রকল্পের অভিপ্রায় হল ধর্মমত হিসাবে মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকার আলোচনা এবং জনজীবনে মতুয়া ধর্মের প্রভাব ও তাঁর মূল্যায়ন। মতুয়া ধর্মকে আলোচনার জন্য ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জাগরণ

হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের ধর্মজাগরণের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি উনিশ শতকের নব আলোড়িত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার পল্লীগ্রামে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মজাগরণের অন্যতম কর্মক্ষেত্র হল গ্রামীণ সমাজের মানুষ। তিনি ধর্মকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করেছেন

সমাজ বাস্তবতার ভিত্তিতে। তিনি মানুষের জ্ঞানালোক দান করেছেন ধর্ম পালনের মধ্যে। তিনি যে ধর্ম নব ভাবে প্রচার করলেন সেই ধর্ম হল সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম যাকে মতুয়া ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়। এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের আলোচনা করেছি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক কাল থেকে। সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মতুয়া ধর্মের পরিচয়

হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম প্রবর্তনের আগে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সন্ধান করেছি এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম ভাবনাকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রাক্‌আর্য ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির সন্ধান করেছি স্বল্প পরিসরে। হরিচাঁদ ঠাকুর যে সমাজ মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই জাতির পরিচয় সন্ধান করেছি। এবং মতুয়া ধর্মের উদ্ভব ও ভক্ত সংগঠনের পরিচয় দিয়েছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

মতুয়া ধর্মের পূজা পার্বণ ও পালনীয় রীতিনীতির বিস্তারিত আলোচনা

হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়াধর্মের পালনীয় কর্তব্য সমূহ ও ভগবানের আরাধনা করা হয় যে রীতি পদ্ধতিতে সেই নিয়মাবলী এই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন হরিচাঁদ ঠাকুর ও জগৎমাতা শান্তিদেবীকে মতুয়া ভক্তগণ যেভাবে পূজা করেন সেই নিয়ম ও পূজার সামগ্রী; সাধন প্রণালীর পরিচয় গ্রহণ করেছি। পূজার উপকরণ, পূজার ফল, মিষ্টি, ও ঠাকুরের ভোগ নৈবেদ্যগুলির আলোচনা করেছি। মতুয়া ভক্তগণ কি কি ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠান পালন করেন তাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

মতুয়া ধর্মের গোসাঁইগণ বা আচার্যগণ মতুয়া ভক্ত মানুষের সামাজিক ক্রিয়া কর্মগুলিও মতুয়া ধর্মের নিয়মানুযায়ী করেন। যেমন—বিবাহ, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন, শিশুর অন্নভোজন, নামকরণ, গৃহ প্রবেশ, আরও পালনীয় কর্তব্য কর্মগুলি মতুয়া ধর্ম মতে করেন মতুয়া ভক্তগণ।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ সংগঠনে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা

হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, নারীর ধর্মীয় অধিকারের সঙ্গে শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন, নারীদের জন্য ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে, এমনকি তৎকালীন সময়ে বিধবাদের জন্য ধাত্রী ট্রেনিং স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং স্কুল গড়েছেন।

শিক্ষার জন্য স্কুল গড়েছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে। আর মতুয়া ধর্মকে দেশ থেকে দেশান্তরে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন তৎকালীন সাধু, গোসাঁই ও পাগলগণ। তাঁরা সকলেই ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্ম সমর্পিত ভক্ত। তাঁরাই হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে বহন করেন। এমনকি হরিচাঁদ ঠাকুর রোগের আরোগ্য করতেন বিভিন্ন ভাবে। ঠাকুরের কাছে যে সকল মানুষ আসতেন সমস্যা নিয়ে তাদের সকল সমস্যা সমাধান করতেন তিনি ও তারা আত্মসমর্পণ করে ভক্ত হতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের। এভাবে বহুভক্ত হয়েছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠনের ভূমিকা ছিল বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি চতুর্থ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমাজ বাস্তবতা

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জীবনী মূলক সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের ঘটমান ঘটনা যেমন সাহিত্যে স্থান পায় তেমনি বহু পূর্বের ঘটনাও সাহিত্যের পাতায় বসবাস করে থাকে। ধর্ম সাহিত্যে হিসাবে পরিচিত মতুয়া সাহিত্যগুলির মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় সংকট, তাদের পূর্ব বিরণের নিটোল কাহিনি। এই পঞ্চম অধ্যায়ে সেই পূর্ব ধর্ম বিবরণের সন্ধান করেছি মতুয়া সাহিত্যগুলির মধ্যে। মতুয়াধর্মের সাহিত্যকারগণ ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম সাময়িক ভক্ত ও কবি। তাই ভক্তির পাবল্য থাকলেও কল্পনার আতিশয্য এই সাহিত্যে নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য

মতুয়া ধর্মের মূল আকর গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। মতুয়া ধর্মের কবি সাহিত্যিকগণ যে সাহিত্য সম্ভার রচনা করেছেন ঊনবিংশ শতকে তাতে যেমন রয়েছে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার চিত্র তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক ভক্তিবাদের দিক। মতুয়া কবিগণের রচনায় মানব জীবনের নিপুণ জীবনালেখ্য ধরা পড়েছে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। তাই এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সাহিত্য রচনা রীতি ও এই পর্বে আলোচনা করেছি।

ধর্ম মানে শুধুমাত্র জীবনী সাহিত্যই নয়, এখানে গানের গুরুত্ব থাকে গভীরভাবে। সেই গানের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যেও ভক্ত কবিগণ তাদের ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে। সেই গানের ভূমিকাও আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে।

মতুয়া ধর্ম যে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম যা প্রাচীন ভারতে ভূতের ধর্ম নামেও অভিহিত হত। যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। সেই ভূতের ধর্মকে নব ভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর সংস্কার করেন ঊনবিংশ শতকে। সেই আলোচনাও করেছি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

উপসংহার

মতুয়া ধর্মকে আলোচনা করে দেখা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর কত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কর্ম সম্পাদন করে গেছেন মানুষের কল্যাণে। উনিশ শতকের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে দূরে গ্রামীণ সমাজে ধর্মজাগরণের আলোক দান করলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর। মতুয়াধর্ম হল ধর্ম ও কর্মের সম্মিলন। হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মকর্মের সম্মিলন করে জাগরণ ঘটান ও গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ করেছেন কর্মের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মতুয়া ধর্মের উদ্ভব উনিশ শতকে হলেও তার শিকড় রয়েছে প্রাগ্ ঐতিহাসিককালের সনাতন ধর্মের মধ্যে। মতুয়া ধর্মের প্রভাব পড়েছে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে।

সূচিপত্র

কথারম্ভ	.....	ক - গ
প্রথম অধ্যায় : **ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মজাগরণ**	.....	১- ২৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : **মতুয়া ধর্মের পরিচয়**	.....	৩০ - ৯৭
তৃতীয় অধ্যায় : **মতুয়া ধর্মের পূজা-পার্বণ ও পালনীয় রীতি-নীতির বিস্তারিত আলোচনা**	.....	৯৮ - ১২৪
চতুর্থ অধ্যায় : **সমাজ সংগঠনে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা**	.....	১২৫-২২৬
পঞ্চম অধ্যায় : **মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমাজ বাস্তবতা**	.....	২২৭-২৬২
ষষ্ঠ অধ্যায় : **মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য**	.....	২৬৩-৩০৩
উপসংহার :	.....	৩০৪-৩০৬
পরিশিষ্ট :	.....	৩০৭-৩২৮
গ্রন্থপঞ্জি :	.....	৩২৯-৩৩৪
নির্ঘন্ট :	.....	৩৩৫-৩৫১

কথারম্ভ

ঊনবিংশ শতক ধর্মজাগরণের সূচনাকাল হিসাবে চিহ্নিত। এই কালপর্বে ভারতীয় জনজীবনে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। এই সময়ে বাঙালি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে মুষ্টিমেয় বাঙালির চৈতন্যের জাগরণ ঘটলেও তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। ঊনবিংশ শতকের একেবারে গোড়াতেই এই গ্রাম বাংলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। গ্রামের প্রকৃতির সহজাত ধর্ম সংস্কৃতিতে বড় হয়েছেন। তাই বাংলার পল্লীজীবনের ধর্মভাবনা, সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি একাত্ম ছিলেন যেমন তেমন ভাবেই তিনি বাংলার মানুষের উন্নতি করেছেন। ধর্ম কর্মের জন্যই তিনি যেন জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর ধর্ম ভাবনা ও কার্যাবলীকে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁদের ভক্ত সমাজকে নিয়ে সমাজ কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের সমাজ কল্যাণের কার্যাবলীকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের মূল বিষয় ছিল, তৎকালীন সমাজ সংস্কারকগণ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন আধুনিক কালে যুক্তি বিজ্ঞানের নিরিখে। যেমন রাজা রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কার করেছেন। তিনি বেদের নিয়মাবলীতে ভারতের সংস্কৃতি সন্ধান করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান ঘটান। এই প্রাচীন ভারতীয় সনাতনী ঐতিহ্যকে পুনজাগরণ ঘটাতে প্রাক্-ঐতিহাসিক পর্বের ধর্মানুশীলকগণের ধর্মভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে।

সনাতনী ধর্ম সংস্কারের ধর্মজাগরণ ঘটালেন নতুন ভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকেই বলে মতুয়া ধর্ম। হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে কত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আপন কর্তব্য কর্ম করেছেন মানব কল্যাণে এবং তিনি উত্তরসূরীকেও যোগ্য করে নিয়েছেন তাঁর কার্য ভার বহন করার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজ কল্যাণের জন্য কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাফল্যে পৌঁছেছেন তারই কাহিনি যেমন আলোচনা করেছি তেমন ভাবে এই নব ধর্ম জাগরণের সমাজ প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেছি যথাসাধ্য।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম-কর্ম ভাবনা সমাজে প্রয়োগ করে মানুষের জীবনকে উন্নত ভাবে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে প্রাক্ আর্য-পূর্ব ভারতের ধর্ম ভাবনার সন্ধান করেছি তাদের জীবনী মূলক ধর্মসাহিত্যে ও আরো অনেক গ্রন্থের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতকের সমাজের বাস্তবচিত্র ও তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজ জীবনকে আলোচনা করেছি। এভাবে সামগ্রিক দিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। গবেষণার বিষয়কে ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি।

গবেষণা কাজটি যাদের সহায়তায় পরিপূর্ণ ভাবে করতে পেরেছি তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের কথা। গবেষণার জন্য যে বিপুল অর্থের দরকার সেই জন্য তিনি আমাকে আবেদনপত্র পাঠাতে বলেন 'রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপের' জন্য। আমি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের সুপরামর্শ অনুযায়ী আবেদন পাঠাই সিনপসিস সহ। আমি রাজীব গান্ধী ফেলোশিপ পাই যার সাহায্যে আমার গবেষণা কাজ সম্ভব হল। আমার বাংলা বিভাগের অবসৃত অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. নিখিলচন্দ্র রায়, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. সুবোধ কুমার যশ, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. দীপককুমার রায় সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন। ড. দীপককুমার রায়, বর্তমানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থকারিকগণ আমার চাহিদামত বইয়ের যোগান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার টুঙ্গীদিঘির চিরসবুজ পল্লী পাঠাগারটিও আমি ব্যবহার করেছি গবেষণা কাজে। আর যার শুভ প্রেরণায় এই গবেষণা কাজটি করলাম তিনি হলেন মতুয়াচার্য শ্রীমণিন্দ্রনাথ ঠাকুর বা মণি গোঁসাই। আমার বাবা শিবদাস মণ্ডল ও মা সবিতা মণ্ডল এবং আমার পরিবারবর্গ আমাকে সাহায্য করেছে। আমার সহপাঠী নন্দিতা মণ্ডল ও আমার কলেজের অধ্যাপক অসিত বিশ্বাস আমাকে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সহায়তা করেছে। লেখক মনিমোহন বৈরাগী, লেখক ড. মণিন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হরি গোঁসাই, শঙ্কর গোঁসাই সকলেই আমাকে সাহায্য করেছে গবেষণা কাজে। বুবুন কুমার বর্মণ যার অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অক্ষর বিন্যাস করে আমার গবেষণা কাজটিকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। সকলকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রণাম জানালাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দু-একটি বইয়ের নতুন সংস্করণ না পাওয়ায় পুরানো সংস্করণ

থেকে তথ্য আহরণ করায় বইয়ের ছেঁড়া মলাটের জন্য প্রকাশনা, সংস্থার নাম ও সন তারিখ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমার গবেষণার বিষয়কে যথাযথাভাবে পরিস্ফুটনের জন্য উদ্ধৃতিকে একবারের বেশি ব্যবহার করেছি। প্রুফ দেখার কাজ যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে করা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

স্নিগ্ধা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মজাগরণ

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয় একথা সর্বজন স্বীকৃত। এই আধুনিকতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব জাত একথাও স্বীকার্য। চলমান সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতি এদেশে আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জীবন দৃষ্টির ভিন্নতা, নতুন সামাজিক শ্রেণির বিকাশ, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। উনিশ শতকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রায় পরস্পর বিরোধী দুই ধারা সচেতন মনে মানব জীবন সম্বন্ধে নবজিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে। জিজ্ঞাসা সচেতন বাঙালির জীবনে তা প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত ধর্ম সমাজিক রীতিনীতি ও রাজনৈতিক ভাবনাকে কেন্দ্র করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে খ্রীষ্টধর্মের অভিঘাত বাঙালির জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে একটা প্রবল আলোড়ন আনে। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত পাশ্চাত্য দর্শনের শিক্ষা পুষ্ঠ মানুষেরা হিন্দুধর্মের নানা আচার, বহুদেববাদ এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর ধর্মের অনুশাসন মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের নামে লোকাচার, কুসংস্কারগুলির দিকে আঙুল তুলে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগল। তখন সনাতনীরা যুগধর্মের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাচীন সংস্কারকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর নব্য শিক্ষিত মানুষেরা সনাতন হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করতে চাইলেন। নব জাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। অতীতের শাস্ত্রগ্রন্থ অন্বেষণ করে ভারতীয় ঐহিত্য থেকে জীবনের নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের চেষ্টা অনেকে করলেন। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু, একাজের অন্যতম পথিক। ঊনবিংশ শতকের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম ব্যক্তি হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মানুষদের সঙ্গে সমপর্যায়ে চলার যোগ্যতা তাঁর কর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর ভারতের জ্ঞানচর্চা ও প্রজ্ঞার গভীর থেকে তুলে আনলেন মানুষের ধর্মীয় সনাতনী ভাবধারাকে।

অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে ধর্মের নামে কুসংস্কার ব্যভিচার সামাজিক ভ্রষ্টাচার, সামাজিক ভেদ বৈষম্য, অস্পৃশ্যতাও দারিদ্র চরম আকার ধারণ করেছিল। এই সময়ে ধর্মের নামে গুরুবাদ ও গুরুমন্ত্রের একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজে গুরুবাদের প্রাবল্য ধরা পড়েছে বিনয় ঘোষের 'বাংলার সামাজিক হতিহাসের' মধ্যে। তিনি গুরুবাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, ঊনবিংশ শতকের সমাজ বাস্তবতার রূপের তার কিছুটা অংশ তুলে ধরলাম—

> ''গুরু ব্যবসা আজকাল যে রূপ ভাব ধারণ করিয়াছে আফ্রিকার দাস ব্যবসা তাহার নিকট হার মানে। ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত কোন লোকে যদি আমাদের ধর্মের উপর একটুও বা কটাক্ষপাত করে অমনি আমাদের স্বধর্ম প্রিয়তার বৃদ্ধি হয়। সর্পের লাঙ্গুলে অমনি যেন পা পড়ে। বিলাতে গিয়া যদি কেহ কখনও অখাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, অমনি সংস্কারকগণ সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বধর্মে ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, সমাজের ভিতর তাহাদের একটা শাসন করিবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই।''[১]

হরিচাঁদ ঠাকুর বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় বড় হয়েছিলেন। ফলে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ সামাজিক জীবন থেকেই জ্ঞাত ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন নামে সনাতন ধর্মের পুনরজাগরণ ঘটান উনিশ শতকে। গ্রামের ধর্মীয় পরিবেশে হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন বাস্তবতার মূর্ত প্রতীক। হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বলেছেন—

> ''নমঃশূদ্র কুলে এল পতিত পাবন।।
> ঘুচাতে জীবের সন্দ চিত্ত অন্ধকার।
> ওড়াকান্দি ধামে হরিচাঁদ অবতার।।''[২]

হরিচাঁদ ঠাকুর স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ধর্মের নামে গোটা দেশ অধর্মের মধ্যে ডুবে আছে। একটা দুটো আচার নিয়ম রীতির সংশোধন করে ধর্মীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি শুদ্ধ মানুষে ভক্তি বিশ্বাস রেখে নব ভাবে ধর্মীয় পথ নির্মাণে

আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দীক্ষার অছিলায় গোটা ভারত যখন গুরুবাদে বুঁদ হয়ে ছিল তখন তিনি মানুষকে গুরুবাদ মুক্ত করবার জন্য বললেন দীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তীর্থ ভ্রমণেও কোন পূণ্য নেই, সৎ আদর্শ মানুষের সান্নিধ্যেই অনেক বেশি পূণ্য অর্জিত হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর দীক্ষা সম্পর্কে মানুষকে মোহ মুক্ত করেন। সত্যের জ্ঞানাআলোক দান করেন মানুষের কল্যাণে। সমাজে প্রচলিত দীক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা পূজাপার্বণকে বর্জন করে 'হরিনাম' মহামন্ত্র জানালেন। তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজনকে গৃহে থেকেই গৃহী মানুষকে পূর্ণ করার পথ নির্দেশ করলেন এভাবে—

"যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।"[৩]

গৃহধর্ম পালন ও তীর্থ ভ্রমণের পূণ্য লাভ করার দিক নির্দেশ করলেন। তীর্থ ভ্রমণে যে পূণ্য লাভ হয় সেই সম পূণ্য লাভ হয় জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী মানুষের দরশনে। গৃহী মানুষেরা যদি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গহধর্ম পালন করেন; তাহলে তাঁকে দরশন করলেও সর্ব তীর্থ দর্শন হয় মানুষের। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বললেন

"দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।"[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই গৃহধর্ম পালন করেছেন ও সকল ভক্ত মানুষকেও গৃহধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই মানুষের, জ্ঞান, ভক্তির বিকাশ ঘটান সম্ভব। গৃহধর্ম গৃহকর্ম পালনের মধ্য দিয়েই মহাসাধু হওয়ার কথা বলেন।

"গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।"[৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'আত্মানুভূতিও আত্মদর্শন' থেকে জানা যায় ধর্মকে কীভাবে গঠন করলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ হয়, সেই পথ অবলম্বন করে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হলেন তিনি। হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর সমকালে দেখেছিলেন ধর্ম পালনের প্রকৃতিকে। আত্মদর্শন করে হরিচাঁদ ঠাকুর সিদ্ধান্ত নেন—প্রচলিত ধর্মের থেকে মানুষকে বের করে মোহমুক্ত করে মানুষকে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্ম শিক্ষা দিতে উদ্দ্যোগী হন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায়—

"শুদ্ধচারী, বীজমন্ত্রী, নামে জপে মালা।
একা একা যেতে চায় সমুদ্রেতে ভেলা।।
গুরুরূপে ব্যবসায়ী কানে দেয় মন্ত্র।
প্রাণহীন দেহ যেন জুড়ে অঙ্গে যন্ত্র।।
এসব সামান্য কূপ সব ডুবে যাবে।
হরি প্রেম প্লাবণেতে জীব মুক্তি পাবে।।
দেহ মন শুদ্ধ হলে স্থির হবে আত্মা।
তখন শিখাতে হবে গৃহ ধর্ম কথা।।"[৬]

মানুষের মোহ মুক্তির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মাদর্শ এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যেই রাখলেন সংঘবদ্ধভাবে চলার আদর্শকে। ধর্মসাধনায় একক মুক্তির প্রয়াসকে তিনি বিস্তার ঘটালেন নামকীর্ত্তনের মধ্যে। একা মুক্তির স্বপ্ন হরিচাঁদ ঠাকুরের ছিল না। তাই 'হরিবল' নাম কীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ভক্তিভাবের মহাতরঙ্গ। সব জাতপাতের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে 'হরিনাম' মহানামের মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন এক অভূতপূর্ব ঐক্য।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জাগরণ ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। হরিচাঁদ ঠাকুর ভারতীয় ধর্ম প্রবাহের ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই তার কর্ম ও চিন্তাকে সংগ্রহ করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর 'ভারতীয়ত্বের আধারে' নামক প্রবন্ধে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জাগরণের বিষয়বস্তুকে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার কিছুটা অংশকে তুলে ধরলাম—

"...দেশীয় ইতিহাসের অনিবার্য গতি আর ভারতীয় লোক ঐতিহ্যের পরম্পরার ভিতর থেকেই তিনি উঠে এসেছিলেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হবার পর তাদেরই অনুকরণে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন বিষয়টা এমন ঘটে নি। ... বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেব কিম্বা কবীর, নানক প্রমুখরা যেমন ভারতের প্রবহমান লোকচৈতন্যের ভেতর থেকেই নিজেদের কর্ম ও চিন্তার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন, হরিচাঁদ ঠাকুরও তাই। তাঁকে আমরা সেই

ধারার সর্বশেষ এবং আধুনিকতম মহামনীষী (ধর্মের ব্যাখ্যায় অবতার) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। তথাকথিত সনাতন ধর্মের অচলায়তন ভেঙে ধর্ম ব্যবসায়ী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিস্তার করা মোহজাল ছিঁড়ে ভারতীয় চেতনার পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়েই তিনি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। একে তিনি বলেছেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম।''[৭]

সনাতন ধর্ম দর্শনের বিবর্তিত রূপ সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্ম দর্শন :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সময় অনুযায়ী হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক যুগে। এই আধুনিকতা বাঙালির চেতনায় ধরা পড়ে উনিশ শতকে। ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালির আত্মচেতনার জাগ্রত কাল। যে মানবতাবাদ বাঙালি গ্রহণ করল তা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। এই মানবতাবাদ প্রচলিত হল তা কিন্তু মূলত শহরাঞ্চল ভিত্তিক। কিন্তু বাঙালি জীবন শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক নয়, মূলত গ্রাম নির্ভর বা কৃষিনির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের যে ভাবধারার সূচনা হয় সেই ধর্মীয় জাগরণের দুই রূপকার সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক তারা কীভাবে কি ধর্মীয় ভাব দ্বারা মানুষকে মনুষত্ববোধের মহিমায় উন্নীত করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের দুই ধর্ম জাগরণের রূপকার হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সফলাডাঙা গ্রামে। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্মভাবনা ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে মানুষকে চালনা করেছেন। সেই সমস্ত কাজকর্মের তথা তার জীবনের যে আলেখ্যপূর্ণ আকরগ্রন্থটি হল—কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'। গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্ম ও ধর্মজীবনের আকরগ্রন্থ হল আচার্য মহানন্দ হালদার বিরচিত 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত'। এছাড়াও হরিচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম দর্শনের প্রবর্তন হল সেই ভক্ত সাধকেরা তাদের ধর্মগুরুর কথা গানের মাধ্যমেও প্রকাশ করলেন। সেই আকরগ্রন্থগুলিও এই সময়ের এক বিশেষ সাহিত্য ধারা তথা ধর্মসাহিত্য ধারা। ধর্মভাবনার কথা বলতে গেলেই পূর্ব পূর্ব ধর্ম ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য মূল আকরগ্রন্থগুলিই ব্যবহার

করব। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে 'পুনর্ব্বার অবতারের প্রয়োজন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবত ও পুরাণ প্রসঙ্গ' থেকে জানতে পারি হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের মানুষকে নিয়ে কোন ধর্ম ভাবনার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কবির বর্ণনায়—

"মানব কুলে আসিয়ে যশোবন্ত সুত হয়ে,
জন্ম নিল সফলা নগরী।।
প্রচারিল গঢ়াগম্য সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম,
জানাইল এজগত ভরি।।"[৮]

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর প্রবর্তিত ধর্ম দর্শনই ভারতের আদি ধর্মদর্শন। যা সনাতন (পুরানো) ধর্মদর্শন নামে খ্যাত। যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ৬৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের ও পূর্বে। সিন্ধু সভ্যতার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল এই ধর্ম দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্মকে আবার ভূতের ধর্মও বলা হয়। কারণ এই ধর্ম মূলত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। ১৯৮৫ সালের ১৪ অক্টোবর বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই সনাতনী ভূতের ধর্ম দর্শনের। সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতিগত বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা সভায় বলা হয়, আর্যদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করার প্রায় ৫০০০ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় অতি উন্নত মানের এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের তত্ত্ব আর্য সভ্যতা বহির্ভুত প্রাচীনতম ভারতীয় ধারকদেরই আবিষ্কার। তাই সনাতন ধর্মকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম বলা হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর এই প্রাচীন ভারতীয় সনাতনধর্মকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে পুনজাগরণ ঘটান। এই ভূতের ধর্ম বা সনাতন ধর্ম ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। এই সনাতন ধর্ম সংস্কারকদের বলা হত বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। গৌতম বুদ্ধ এই সনাতনধর্মকে সংস্কার করেন বৌদ্ধধর্ম নামে। আবার হরিচাঁদ ঠাকুরও সনাতনধর্মকেই সংস্কার করেন ঊনবিংশ শতকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। হরিচাঁদ ঠাকুর সনাতন ধর্মকে যুগ প্রয়োজনে মানুষের উপযোগী করে সংস্কার করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বলেছেন—

"বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।

যশোবন্ত গৃহে হরি হৈলা অবতীর্ণ।”[৯]

গৌতম বুদ্ধ পঞ্চভূতের ধর্মকে সংস্কার করেন। আবার হারিয়ে যাওয়া ভূতের ধর্মের বা সনাতন ধর্মের সংস্কার করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে সনাতন ভূতের ধর্মে কীভাবে মানবদেহ গঠিতও মানুষ কেমন করে জাগতিক জীবন অতিবাহিত করে তাই বর্ণনা করেছেন। আচার্য মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

“পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে ঘুরে ব্রহ্ম পরাৎ পর।
ব্রহ্ম ধরে আত্মানাম তত্ত্বে দেহ কয়।।
উভয়ে মিলন হলে জীব সৃষ্টি হয়।।
ভূত’ত আধার মাত্র দেহ নাম ধরে।
চিৎ শক্তি আত্মা আছে তাই চলে ফিরে।।”[১০]

ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতনধর্মকে গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই এক যোগে পালন করার রীতি প্রচার করলেন। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে আধ্যাত্ম জীবন গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে বিরোধ নেই। হরিচাঁদ ঠাকুরও আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে গৃহধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন যাপনের পথ নির্দেশ দিলেন। মুক্ত প্রাণে মানুষের জীবন যাপনের পথ নির্দেশ দিলেন। গৃহধর্ম পালন করার আদর্শ স্থাপন করার কথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম-কর্ম নীতিতে গৃহধর্ম জীবনের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত হল—

“হাতে কাম মুখে নাম, মন খোলা চাই।
সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সর্ব ধর্ম সার।
গৃহীকে বিলাবে মুক্তি শ্রীহরি আমার।।”[১১]

গৃহ ধর্মকেই সমাজ জীবনের সর্বধর্ম শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয় ‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত’ গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সেই প্রসঙ্গটি যথাযোগ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম শিক্ষা যে মানুষের আদি শিক্ষা, গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই সর্ব তীর্থ সব পূণ্য অবস্থান করে সঠিক ভাবে পালনের মধ্যে সেই বাণীই ব্যক্ত করেছেন। আচার্য

মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

"শোন পুত্র প্রাণাধিক, তব প্রতি সমধিক,

স্নেহ কৃপা কৃতজ্ঞতা আছে বিদ্যমান।

....

.....

শাস্ত্র গ্রন্থ আদি যত পড়িয়াছ অবিরত

তত্ত্বজ্ঞান তার মধ্যে লভিয়াছ কত।

নিশ্চয় শিখেছ তুমি সংসার করম ভূমি

গৃহাশ্রম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী মত।।"[১২]

হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গৃহধর্ম পালনের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। হরিচাঁদ ঠাকুর সেভাবে গৃহাশ্রম ধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন তা ভারতবর্ষীয় সমাজের মূল ভিত্তি। হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে আদর্শ গৃহ ধর্ম পালনের মধ্যেই রক্ষা করার নির্দেশ দেন।

"গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম ভূতলে নরের জন্য।

সর্ব তীর্থ সর্ব পুণ্য গৃহাশ্রমে রয়।।

গৃহীকে আশ্রয় করি জীব রহে দেহ ধরি,

গৃহাশ্রম সর্বোত্তম সেই হেতু কয়।"[১৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব হওয়ার কারণ হিসাবে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বলেছেন প্রসস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম শিক্ষা ও সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জানানোর জন্যই হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম।

"প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।

অবতীর্ণ হরিচাঁদ আসি অবনীতে।।"[১৪]

এই জীব জগতের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের সমাজের মূলে রয়েছে সৃষ্টি প্রবাহ। সৃষ্টি প্রবাহকে অব্যহত রাখতে মানুষকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে হয়। নিজ জন্মদাতা পিতামাতাকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করা সন্তানের কর্তব্য। মাতা পিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ভক্তি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি স্বকর্তব্য পালন, মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন এইসব সামাজিক কর্ম সাধনের জন্য সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে গার্হস্থ্য ধর্মের সঙ্গে এক যোগে প্রবর্তন করেন হরিচাঁদ

ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুর বিবাহ করতে অসম্মতি জানালে শান্তিদেবী গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বলেছিলেন গৃহধর্ম রক্ষা করতে। গৃহধর্ম ও সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম পালনের জন্য। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিচরণ পাগল এভাবে বর্ণনা করেছেন শান্তিদেবীর শিক্ষাকে—

"শান্তিমাতা বলে শুন আমার বচন।
পিতৃধর্ম রক্ষা কর সুযোগ্য নন্দন।।
গৃহধর্ম হয় বাপ সূক্ষ্ম সনাতন।
সৃষ্টিতত্ত্ব মূল সূক্ষ্ম ধর্ম সনাতন।।
সেই ধর্ম পালিবারে অমত কর না।
মোরা না আসিলে তুমি কভু আসিতে না।"[১৫]

পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও মাতা শান্তিদেবীর আদেশ হল সংসার ধর্ম পালন করে সমাজের সাংসারিক মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। সংসার ধর্ম-কর্ম পালনের মধ্যেই সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করা যায়। মতুয়া ধর্মে গার্হস্থ্য আশ্রমই সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রম। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও পরবর্তী সময়ে ভক্তগণকে আদর্শ গৃহধর্ম পালনের নির্দেশ দিতেন। গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই ধর্ম জীবন পালন করলে তার মতো মহাসাধু অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতে। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ গৃহাশ্রমের নীতি শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে—

"গার্হস্থ্য আশ্রম তাই সর্ব্বাশ্রম মূল।
তুলনা মিলেনা তার অমূল্য অতুল।।
এই গৃহাশ্রমে যেবা খাঁটি ভাবে রয়।
তার মত মহাসাধু কোথা পা'য়া যায়।"[১৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্মকে আদর্শ গৃহ জীবনের মধ্যেই পালন করে মানুষের পূর্ণতা চেয়েছিলেন। ধর্মকর্মের মিলনে সংসার জীবন গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। সেকথা আচার্য মহানন্দ হালদার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"মতুয়া জীবনে হ'ল পূর্ণ পরাকাষ্ঠা।
গৃহস্থ সন্ন্যাসী মিশি, এক আসনে রহে বসি,
এক ক্ষেত্রে মিলে সব ধর্ম কর্ম নিষ্ঠা।।"[১৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ভক্ত মতুয়া সমাজের সকল কর্তব্য কর্ম করার

জন্য নিয়োজিত করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার আজ্ঞানুসারে মতুয়া ভক্তগণের চারিত্রিক দৃঢ়তা নির্মাণ, সমাজ গঠন, শিক্ষা নিকেতন গঠন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যথাসাধ্য কর্ম সম্পাদন করেছিলেন ভক্তগণ সহযোগে। গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তগণের ভবিষ্যৎ কালের কলুষতা মুক্তির উদ্দেশ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মাদর্শকে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন—

"দীক্ষা, শিক্ষা কোন কিছু নাহি প্রয়োজন।
হরিনাম মহামন্ত্র জান সর্ব্বজন।।"[১৮]

মতুয়াধর্ম যাতে মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমাজের মানুষের ধর্মীয় মোহ মুক্তির আদর্শ হয় তার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার দ্বাদশ আজ্ঞা মত আরও সাতটি আজ্ঞা পালনের নির্দেশ দেন। এই সাতটি আজ্ঞায় মতুয়াধর্ম সমাজের মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও নির্ভয় প্রদান করেছেন। মতুয়া ভক্তগণ যাতে ভিন্নদল উপদলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত হন তার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই নির্দেশাবলী থেকে বোঝা যায় মতুয়া ভক্তগণকে সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সপ্ত নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তুলে ধরলাম। আচার্য মহানন্দ হালদারের গুরুচাঁদ চরিত থেকে সংক্ষিপ্তভাবে—

১. ধর্মক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব জমিদারী লোপ।
২. অঙ্গসেবা বারণ।
৩. পরনারী থেকে দূরে থাকা।
৪. পরিহাস বাচালতা ত্যাগ।
৫. মদ, গাজা প্রভৃতি অস্পৃশ্য।
৬. তাস, দাবা প্রভৃতি পরিত্যাগ।
৭. শঙ্কা ত্যাগ।

মতুয়া ধর্মে 'হরিবোল' নামের অর্থ প্রেমবন্ধন :

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে 'হরিনাম' সাধনা করার নির্দেশ দেন। মতুয়াধর্মে এক হরিনামই সারবস্তু। হরিচাঁদ ঠাকুর নারী-পুরুষ, সকল মানুষকে 'হরিবোল' মহামন্ত্রের দ্বারা সমস্ত মানুষকে

এক মহান প্রেম বন্ধনে এক সূত্রে আবদ্ধ হতে বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই আদর্শকে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। কবির বর্ণনায়—

''হরিনামে প্রেম প্রাপ্ত সাধুদের বাণী।

.....

যেই নাম সেই হরি শ্রীমুখের বাক্য।

জীবে কেন মনে প্রাণে নাহি করে ঐক্য।

.....

বিশুদ্ধ পিরিতি ব্যাখ্যা আর বাক্য নাই।

শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি নৈষ্ঠিক ভজন।।''[১৯]

সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্মে ব্রহ্ম উপলব্ধি :

ব্রহ্ম জ্ঞান সমস্ত মানুষের মধ্যেই সুপ্ত রূপে বিরাজমান। সঠিক জ্ঞান লাভের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা মানুষ সুপ্তরূপে বিরাজমান দেহের মধ্যের ব্রহ্ম শক্তির ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ব্রহ্ম জ্ঞানালোক প্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজের গৌরব। ব্রহ্ম জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর স্বীয় পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন ব্রহ্মকে বাইরে খোঁজা বৃথা। নিজের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজ করেন। আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

'' শোন শশী কিছু তত্ত্ব কহি তব ঠাঁই।

'শক্তিরূপ' ব্রহ্ম তুমি জানিবে সদাই।।

এই শক্তি দেখ রহে জীবের শরীরে।

পরম অমূল্য নিধি বীর্য্যরূপ ধরে।।''[২০]

ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালনের দরকার হয়। ব্রহ্মশক্তিকে জাগাতে গুরুচাঁদ ঠাকুর নির্দেশ দেন ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনের।

''ব্রহ্মচর্য পালে যেই কায়মনো বাক্যে।

ব্রহ্ম তারে রহে ঘিরে সবার অলক্ষে।।

.....

ব্রহ্ম যদি পেতে চাও ব্রহ্মচারী হও।।''[২১]

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর শ্রীশ্রীশশীভূষণ ঠাকুরকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মশক্তির সন্ধানের পথকে উন্মুক্ত করেছেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর যে সনাতন ধর্মকে উনিশ শতকে সংস্কার করেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে সেই সনাতন ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা মনিমোহন বৈরাগী আলোচনা করেছেন। সনাতনী যুগের ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি ও তার ঐতিহাসিক যুগ ভিত্তিক অবস্থান সহ মূলনিবাসী ভারতীয়দের নানাপ্রকার উত্থান পতনের চার্ট আকারে দেখিয়েছেন মনিমোহন বৈরাগী। তাঁর যুগভিত্তিক চার্টটিকে তুলে ধরলাম—

''মূলনিবাসী ভারতীয়দের যুগভিত্তিক ধর্মীয় অবস্থান ও ধর্মগ্রন্থ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ (৬৫০০ খ্রিস্ট পূর্বের আগে)

সনাতনী ধর্মভাবনার উন্মেষ ঘটে এই সময় থেকে

বৈদিক আর্য পূর্ব পূর্ববুদ্ধ সনাতনী যুগ (৬৫০০-১৫০০ খ্রিঃ পূঃ) সিন্ধু সভ্যতা এ যুগেরই নিদর্শন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম নামক পঞ্চভূতের সনাতনধর্মী আদি পুরাণ সনাতনী ভারতীয়দের এই সময়কার সৃষ্ট জ্ঞান ভাণ্ডার হিসাবে স্বীকৃত।

বৈদিক যুগ

(১৫০০-৫০০ খ্রিঃ পূঃ)

ঋগবৈদিক যুগ (১৫০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ)

পরবর্তী বৈদিক যুগ (১৫০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ)

(১৫০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ)

ঋগবেদ এবং ব্রাহ্মণ এই সময়কার সৃষ্টি।

(১০০০-৫০০ খ্রিঃ পূঃ)

শ্যামবেদ, যযুর্বেদ, অথর্ববেদ, আরণ্যক উপনিষদ, ঋগবেদের পুরুষসুক্ত, গৌতমধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি এই সময়ের সৃষ্টি। তবে অথর্ববেদ এবং উপনিষদ সৃষ্টি করেন সনাতনপন্থী অথর্ববেদীয় মূলনিবাসীগণ।

বৌদ্ধযুগ (৫০০-১৮৭ খ্রিঃ পূঃ)

এই সময় ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের ধর্মকে সংস্কার করে গৌতমবুদ্ধ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চার মহাভূতের মহাসত্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ধর্মীয় বর্হিপ্রকাশ কর্ম ভিত্তিক সত্য প্রেম এবং যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধধর্ম দর্শন রূপে প্রকাশিত।

মিশ্র যুগ (১৮৭ খ্রিঃ পূঃ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)
(বৈদিক ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মিশ্র অবস্থা)

মনুসংহিতা, বেদান্তসূত্র (উপনিষদের অনুকরণ) মহাভারত (তবে এর রচনাকাল চলে ১২০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) গীতা, রামায়ণ, এবং ব্যাসের কলমে আদি পুরাণের বিকৃতরূপ বর্তমানের ১৮টি পুরাণের অধিকাংশের সৃষ্টিই এই সময়ে। যেমন—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, মৎস পুরাণ (তবে এর রচনাকাল চলে ১১০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) ভাগবত পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বামন পুরাণ (এর রচনাকাল চলে ১০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত), পদ্মপুরাণ (এর রচনাকাল চলে ৯৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত), স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ।

পরবর্তী বৌদ্ধ যুগ (৭৫০-১১৩০ খ্রিঃ)

ব্রহ্ম নারদীয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মা পুরাণ, বরাহ পুরাণ (তবে এর রচনাকাল চলে ১৫০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) এই সময়ের সৃষ্টি।

মুসলিম যুগ (সূত্রপাত থেকে) ও খ্রিস্টান যুগ ও আধুনিক যুগ
(১১৩০-১৯৪৭ খ্রিঃ)

মহাভারত এবং বরাহ পুরাণের রচনাকাল এই যুগেই শেষ হয়। ঠাকুর হরিচাঁদের জন্ম এবং সনাতন ধর্মের নবরূপ মতুয়া ধর্ম প্রবর্তন। এবং মহান মতুয়া ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত ও গুরুচাঁদ চরিত তথা অনেক মতুয়া ধর্ম সাহিত্য গান এই সময়ের সৃষ্টি।

আধুনিক যুগ (১৯৪৭-২০১৭ খ্রিঃ)

মতুয়া ধর্ম গ্রন্থ এক অবৈদিক সনাতনী দর্শন হিসাবে বৌদ্ধ ও মতুয়া দর্শন, হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত

ইত্যাদি এই সময়ের সৃষ্টি।”[২২]

কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের লেখা ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ থেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশ পরিচয় জানা যায়। কবি বংশ পরিচয় এভাবে জানিয়েছেন—

“নাম ছিল রামদাস রাঢ় দেশে ছিল বাস,
তীর্থযাত্রা করি বহুদিন।
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে, শেষে যান বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে উদাসীন।।
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, ধারা বহিত নয়নে,
হেরিলে পবিত্র হয় জীব।
কাশী কাঞ্চী মধুপুরী, সরস্বতী গোদাবরী,
শান্তিপুর আদি নবদ্বীপ,
বিষয় সম্পত্তি ত্যজ্যে, তীর্থ যাত্রী পদব্রজে,
পরে যান শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবগঙ্গানাম শুনি, দেখিবারে সুরধনী,
লক্ষ্মী পাশা এল তার পর।।
কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি, সব লোকে ধন্য মানি,
যত্ন করি রাখিল তথায়।
কৃষ্ণ ভকতের সঙ্গে, প্রেমকথা রসরঙ্গে,
থাকিলেন শ্রীলক্ষ্মী পাশায়।।
চন্দ্রমোহন তার পুত্র ক্রমে শুন তার সূত্র,
তার পুত্র সুকদেব নাম।”[২৩]

আমার আলোচনার সুবিধার জন্য ঠাকুর বংশলতাকে নিম্নলিখিতভাবে দেখালাম—

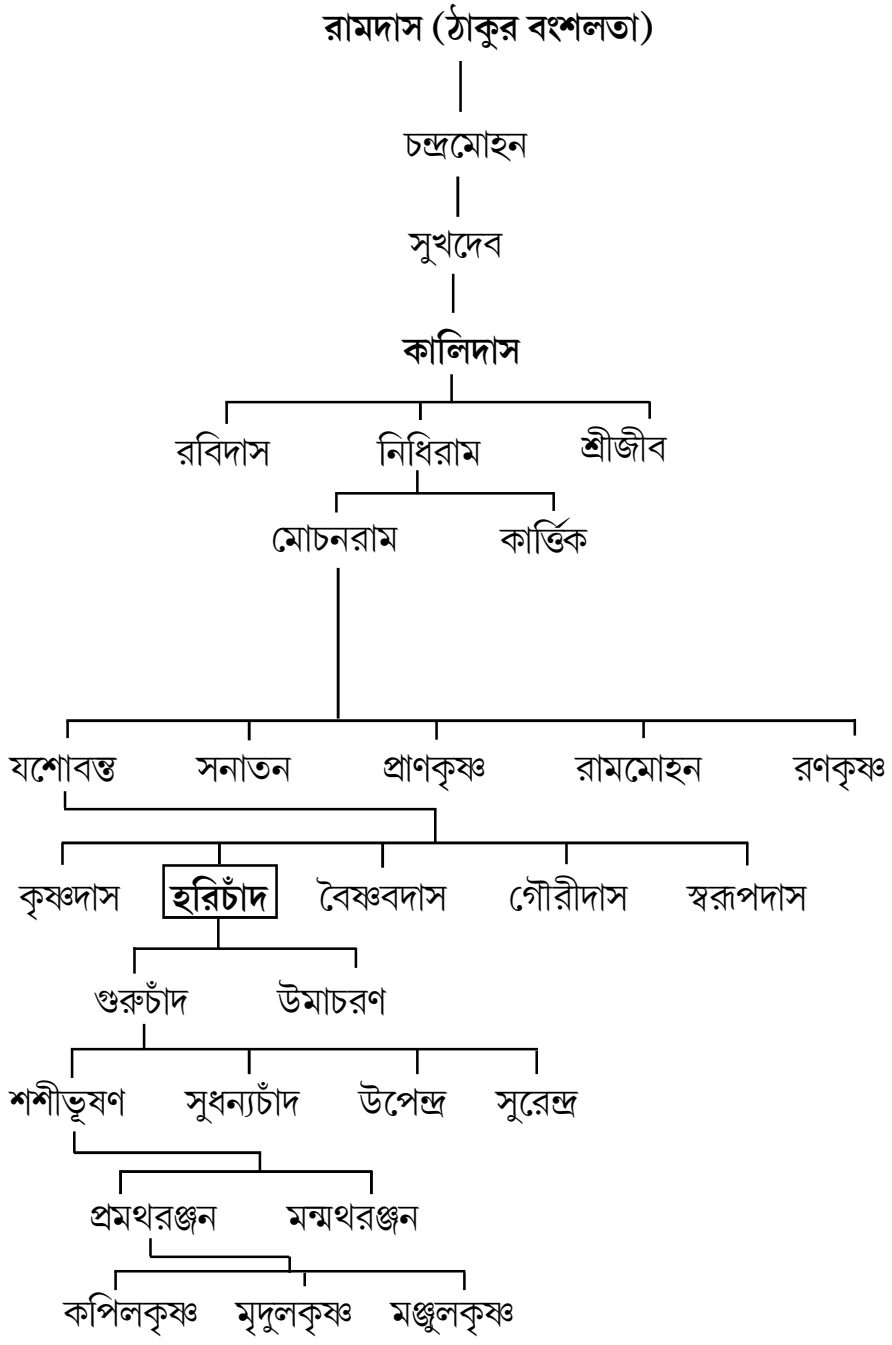

“তস্য পুত্র কালিদাস বহুদিন কৈল বাস,
তিনি যান পাথর ঘাটায়।।
রবিদাস নিধিরাম কনিষ্ঠ শ্রীজীবনাম,
তিন পুত্র সহিত তথায়।।
সর্বদাই সাধু সেবা, সংকীর্ত্তন রাত্রিদিবা,
মাঝে মাঝে বাণিজ্য করিত।
যাহা করে উপাজ্জন তাহাতে সাধুসেবন
ক্ষেত্র কার্য অল্প পরিমিত।।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
শ্রীনিধিরামের ঘরে, দুই পুত্র জন্মধরে,
মোচনরাম, কনিষ্ঠ কার্ত্তিক।।
জেষ্ঠ্য শ্রীমোচন রাম, অশেষ গুণেরধাম,
ঠাকুর মোচাই নামে খ্যাত।
সফলানগরী এসে, বাস করিলেন শেষে,
পঞ্চ পুত্র লয়ে আনন্দিত।।
যশোবন্ত সনাতন প্রাণকৃষ্ণ রামমোহন,
রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।
র্সব জেষ্ঠ্য যশোবন্ত, তার হ’ল পঞ্চ পুত্র,
এপঞ্চের ঠাকুর আখ্যান।।
এ বংশে জন্মিল যত শুদ্ধ শান্ত কৃষ্ণভক্ত,
সবেমত্ত হরিগুণ গানে।
কৃষ্ণ ভকতির গুণে তার এক এক জনে,
সাধুকি বৈষ্ণব সবে মানে।।
এ কয় পুরুষ মাঝে মত্ত সাধু সেবা কাজে,
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।

কেহ বা হল সন্যাসী, কেহ বৃন্দাবনবাসী,

তাতে বংশে ঠাকুর উপাধি।।

ঠাকুরের এ বংশেতে, হরিচাঁদ অবনীতে,

করিলেন জন্মগ্রহণ।।''[২৪]

এছাড়াও 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থ থেকেও ঠাকুরের বংশ পরিচয় জানা যায়। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থটির রচয়িতা আচার্য মহানন্দ হালদার। এটিও আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী ধর্ম-কর্মময় কাহিনির সমাহার। হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র কীভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের তিরোধানের পর মতুয়া ধর্মকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের মাধ্যমে ভক্ত মানুষের উপকার করেছেন; সেই কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার তাঁর 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে। শিক্ষা ভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক সচেতনতা সামাজিক ঐক্য স্থাপনের জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান বিস্ময়কর।

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতামাতা ও ভাইদের বাল্যকালের পরিচয় :

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুর ও মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে তাদের চরিত্র মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুরসহ তাঁর ভাইদের। তাঁদের চরিত্র গঠন ও হয়েছিল পিতা মাতার আদর্শ অনুযায়ী। আলোচনার সুবিধার জন্য আকর গ্রন্থের চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা তুলে ধরলাম—

''সফলা নগরী ধন্য ওড়াকান্দি ধন্য।

যে গ্রামে হরিচাঁদ হৈল অবতীর্ণ।।

সফলা নগরী শ্রীযশোবন্ত ঠাকুর।।

তাহার মহিমা কথা কহিতে প্রচুর।।

কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ প্রাণ তার।।

কৃষ্ণের নৈবিদ্য বিনে না হত আহার।।

সদা করে কৃষ্ণ কথা কথোপকথন।

কৃষ্ণ বলে অশ্রুজলে ভাসিত বয়ন।।

প্রতি পক্ষে করাইত বৈষ্ণব ভোজন।

হরি ব্রত একাদশী নাম সংকীর্তন।।"[২৫]

'অথযশোবন্ত চরিত্র কথা'—অংশে যশোবন্ত বৈাগীর চরিত্র মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে—শ্রীশ্রীতারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"ঠাকুর বৈষ্ণব বলে উপাধি যাহার।

আমি মূঢ় কিবা গুণ বর্ণিব তাহার।।

বৈষ্ণব সঙ্গেতে সাধু কীর্ত্তন করিত।

ভাবেতে বিভোর হয়ে কত ভাব হত।।

কোনদিন কৃষ্ণ গোষ্ঠে পোহাইত নিশি।

বৈষ্ণবেরা যশোবন্তে বলিত বৈরাগী।

বৈষ্ণব উপাদি বৈষ্ণবের পদ সেবি।

অন্নপূর্ণা মাকে সবে বলিত বৈষ্ণবী।।

বৈরাগী ঠাকুর আর ঠাকুর বৈষ্ণব।

এহেন উপাধিতে হইল জনরব।।

যতকিছু সংসারেতে করিতেন আয়।

যত্র আয় তত্র ব্যয় বৈষ্ণব সেবায়।।

গো সেবা করিত বহু করিয়া যতন।

দুই তিন গাভী সদা থাকিত দোহন।।

ঘৃত বানাইত দধি করিয়া মন্থন।

বৈষ্ণবেরা দধি দুগ্ধ করিত ভোজন।।

মন্থন সময় হলে বৈষ্ণবাগমন।

বৈষ্ণবের মুখে তুলে দিতেন মাখন।।"[২৬]

উপাস্য ভগবানের নামে ভক্ত মানুষ পরিচিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কারের দ্বারা জীবন গঠিত হয়। যশোবন্ত বৈরাগী ও অন্নপূর্ণাদেবী দু'জনেই বৈষ্ণবসেবা করতেন প্রতিপক্ষে। হরিব্রত একাদশী তাদের বাদ যেত না। বৈষ্ণব সেবার দ্বারা তারাও বৈষ্ণব উপাধি পান। এমনকি তাদের সন্তানদেরও নামকরণ করেন বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দ্বারা। তাঁদের বড় ছেলের

নাম কৃষ্ণদাস, দ্বিতীয় হরিচাঁদ, তৃতীয় বৈষ্ণবদাস, চতুর্থ গৌরীদাস, পঞ্চম স্বরূপ দাস। 'প্রভুদের বাল্যখেলা' অংশে পঞ্চভ্রাতার বাল্যকালের বর্ণনা করেছেন কবি। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভ্রাতাদের বাল্যকালের চরিত্র সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে তা হল—

হরিচাঁদ ঠাকুরের অগ্রজ কৃষ্ণদাস চরিত্র :

''ফরিদপুর জিলা গ্রাম সফলাডাঙায়।
পঞ্চভ্রাতা জন্মিলেন এসে এ ধারায়।।
প্রভু আগমনে ধন্য হল মর্ত্ত্য পুরী।।
বঙ্গদেশে ধন্য গ্রাম-সফলা নগরী।।
অগ্রগণ্য কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ ভজনেতে।
শুদ্ধচারী কৃষ্ণভক্ত আর্ত্তি বৈষ্ণবেতে।।
একাদশী উপবাসী তুলসী ভজন।
শ্রীহরি বাসর হরিব্রত পরায়ণ।।
নাম সংকীর্ত্তন আদি সদা সাধু সঙ্গ।
অন্তরে মাধুর্য্য শুধু প্রেমের তরঙ্গ।।''[২৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের তৃতীয় ভাই বৈষ্ণবদাস চরিত্র :

''বৈষ্ণব দাসের মন বৈষ্ণব সেবায়।
বৈষ্ণবের সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণগুণ গায়।।
.....
বৈষ্ণবেরা পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জন।
বৈষ্ণব প্রসাদ নিতে বড়ই মনন।।
বৈষ্ণবে নিশ্বাস ছাড়ে হরে কৃষ্ণ বলে।
তখন আমার মনে আনন্দ উথলে।।
যার গলে মালা, ভালে তিলক ধারণ।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন।।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন।।

বালক নিকটে যেত বাল্য খেলা লাগি।

বলে ভাই এস খেলি বৈরাগী বৈরাগী।।

একত্র হইয়া সব বালকের সনে।

বলে ভাই ভাল মাটি পাব কোন খানে।।

যে স্থানে বিশুদ্ধ মাটি আনিত তুলিয়া।।

অষ্টাঙ্গে লইত ফোঁটা সে মাটি গুলিয়া।।

বৈষ্ণবেরা যেমন পরিত বহির্ব্বাস।

তেমতি পরিত নিজ পরিধান বাস।।

তুলসীর চারা আনি করিত রোপণ।

বলে ভাই হেথা কর নাম সংকীর্ত্তন।।

হরি বলি বাহু তুলি নাচিয়া নাচিয়া।

ভূমে দিত গড়াগড়ি মাতিয়া মাতিয়া।।

নামরসে খেলা বসে মত্ত সুধা পানে।

আহার আদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত মনে।।"[২৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের তৃতীয় ভাই গৌরীদাস চরিত্র :

"গৌরীদাস গুণভাষ কহন না যায়।

অহরহ বদনেতে হরি গুণ গায়।।

থাকিতেন বৈষ্ণব দাসের অনুগত।।

বৈষ্ণব দেখিলে হইতেন পদানত।।

মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা মানি করিতেন কার্য্য।

ভাতৃগণ আজ্ঞা করিতেন শিরোধার্য্য।।

পৌগণ্ডেতে বালকের সঙ্গেতে মিশিয়া।

হরি হরি বলিতেন নাচিয়া নাচিয়া।।"[২৯]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ছোট ভাই স্বরূপদাস চরিত্র :

"স্বরূপদাসের বাল্য লীলা চমৎকার।
পিতৃসেবা মাতৃসেবা বিশুদ্ধ আচার।।
ভ্রাতৃগণ আজ্ঞাধীন সদা করে কার্য।
ভৃত্যবৎ ভ্রাতৃ পরিচর্য্যাদি গাম্ভীর্য।।
অতিথি বৈষ্ণব পেলে করিত সেবন।
বালক বৈষ্ণব সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন।।"[৩০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে 'মহাপ্রভুর বাল্যলীলা' অংশে—

"এই ভাবে চারি ভাই করে বাল্যখেলা।
এবে শুন মহাপ্রভু স্বীয় বাল্য লীলা।।
মহাপ্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু।।
ধরিয়া গোপাল বেশ বাঞ্চা কল্পতরু।।
আবা ধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল।
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল।
গোপনীয় ভাব যেন ছিল বৃন্দাবনে।
করিত তেমনি খেলা রাখালের সনে।।
ব্রজেতে যেমন ভাব ছিল ভঙ্গি বাঁকা।
সেই ভাবে দাঁড়াতেন যষ্ঠি দিয়ে ঠেকা।।
ভাব দেখে রাখালেরা জিজ্ঞাসিত নাম।
বলিতেন নাম কৃষ্ণ দূর্ব্বাদল শ্যাম।।"[৩১]

কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস, স্বরূপ দাসের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে দেখা যায় তাদের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী কর্মধারার পরিচয়। এবং বৈষ্ণব পরিবারের বৈষ্ণব সন্তানদের চরিত্র, তাদের আচার আচরণ ক্রিয়া কর্ম পিতৃ মাতৃ অনুরূপ হবে এটাই সাধারণ রীতি। এখানেও সেই নিয়মানুযায়ীই তাদের চরিত্রের নানা দিক ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণবের ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবভক্তদের পালনীয় রীতি নীতিরই ব্যবহার দেখা যায়—যথা;

নামসংকীর্ত্তন, একাদশী উপবাস, তিলক ধারণ, তুলসী পূজা, নামসংকীর্ত্তন বাহু তুলে হরিনাম করা, নিরামিষ ভোজন, আহারের পরিচয় পাই তা একান্তই বৈষ্ণব ভক্তির পালনীয় রীতির পরিচায়ক। ভক্তির লক্ষণ অর্থাৎ প্রণাম করাও তাদের মধ্যেই রয়েছে সমভাবে ব্যক্ত।

হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্র থেকেও ভগবদভক্তির কথাই মনে পড়ে। একে তো হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবার ছিল বৈষ্ণব পরিবার আর তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণভক্তির ভাবধারা যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তা আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশাবলীর থেকে জানতে পারি। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব সময়েও এই ভাব ধারা যে ছিল তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটিও ভক্তি ভাবনার দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম লগ্নের অনেক আগে থেকেই এই পরিবারে তথা এ সময়ের সমাজের যে ধর্ম শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাতে দেখা যায় পুরাণগুলি ধর্ম সাহিত্য হিসাবে পরিচিত ছিল, এছাড়াও মনসামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্র কথা জানার মাধ্যমে যেমন হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যবাদিতা, কর্মদক্ষতা, ন্যায় পরায়ণতা, তথা একটি আদর্শ চরিত্রের যা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তা বাল্যকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রও সেই প্রথম লগ্নেই বোঝা গিয়েছিল তার সমগ্র জীবনের তথা কর্মজীবনের কাঠামোটির স্বরূপ। 'মহাপ্রভুর গোপাল বেশ' অংশটিতে দেখা যায় গোচারণের সময় রত্নডাঙায় বিভিন্ন সাপের দেখা পাওয়া যেত। তখন হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে সেই সাপ ধরে খেলা দেখাতেন রাখাল বন্ধুদের। এতে বোঝা যায় তাঁর চরিত্রে প্রথম থেকেই ভীতি হীনতার পরিচয়। আর তিনি কেবলমাত্র খেলা দেখাতেন তা নয় 'মনসা ভাষাণ গান' গাইতেন। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়েও যে গ্রামাঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল মনসাভাষান গানের। কবির বর্ণনায়—

"গোষ্ঠেতে দেখিলে সর্প, করিতেন ঘোর দর্প,
ধেয়ে গিয়া করিত ধারণ।।
দেখি ঠাকুরের দর্প পালাইত কাল সর্প,
কোন সর্পে ধরিতেন ফণী।।
ঠাকুর পানে চাহিয়ে সভয় প্রণাম হয়ে
ফিরে দূরে যাইত অমনি।।

কোন ফণী বৃক্ষ পরে, ঠাকুর দেখিলে পরে,

বলিতেন রাখাল গণেরে।।

এনে দেরে বেত্র শিষ, তোরা অন্তরে থাকিস,

আমি আনি ঐ ফণী ধরে।।

শিষ অগ্র ফিরাইয়া, তাতে এক গ্রন্থি দিয়া,

ফাঁসী বানাইয়া ধরে ফণী।

ফণী টানিয়া আনিয়া, গোষ্ঠের মাঝারে গিয়া,

ছেড়ে দিয়া খেলিত অমনি।।

গাইত পদ্মপুরাণ মনসা ভাষাণ গান,

বেহুলার করুণ কাহিনি।

রাখালে দিতেন বলি আমি সাপ লয়ে খেলি

তোরা নাচ দিয়া হরিধ্বনি।।"[৩২]

হরিচাঁদ ঠাকুরের বালক বন্ধুদের পরিচয় :

"নাটু আর বিশ্বনাথ থাকিত ঠাকুর সাথ,

হরিচাঁদ প্রেমে বড় আর্ত্তি।।

যেখানে যেখানে যেত, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত

কার্য্য করে আজ্ঞা অনুবর্তী।।

লইয়া রাখালগণ করে গোষ্ঠ গোচারণ,

কভু বসে বৃক্ষের ছায়ায়।।"[৩৩]

'রাখাল বিশ্বনাথের জীবনদান' অংশ দেখা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের খেলার সাথী বিশ্বনাথ মৃত্যু পথের যাত্রী হয় ভেদ বমিতে। আর তৎকালীন সময়ে এই ভেদবমিতে গ্রামের মানুষের মৃত্যু ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। আধুনিক কালের মত ডাক্তার ছিল না। তখন জীবনের রোগ শোক সমস্ত ব্যাপারেই মানুষ সংকুচিত হয়ে থাকত। তাই বিশ্বনাথকে অন্তর্জ্জলি করার কথায় হরিচাঁদ ঠাকুর প্রতিবাদ করেন যে এই তুচ্ছ ভেদ বমিতে বিশে মারা যেতে পারে না। আর

হরিচাঁদ ঠাকুরের সহায়তায় মৃতপ্রায় বিশে প্রাণ ফিরে পায়। তাঁর ক্রিয়া কর্মগুলিও প্রথম থেকেই তাই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত একজন আদর্শ দৃঢ় নিষ্ঠ মানুষকে পাওয়া যায়।

'বিশ্বনাথের জীবনদান' অংশের বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায়—

"বিশ্বনাথ নামে এক রাখাল চতুর।
আত্মাসম ভাল তারে বাসিত ঠাকুর।।
সকল রাখাল এল গোষ্ঠ গোচারণে।
বিশ্বনাথ এল না দৈবের নির্ব্বন্ধনে।।
ঠাকুর বলেন তবে সব সখাগণে।
সকলে আসিলি তোরা বিশে কোন খানে।।
নাটু কহে ওহে হরি কি কহিব আর।
আসিলাম বলিতে বিশের সমাচার।।
বিশের হয়েছে রাত্রে বিসূচিকা ব্যধি।
মৃতপ্রায় সবে করিতেছে কাঁদাকাঁদি।।
ঠাকুর বলেন নিদানের কর্তা আমি।
বিশাইর কি করিবে তুচ্ছ ভেদ বমি।।
নাটুকে করিয়া সঙ্গে ঠাকুর চলিল।
হেনকালে বিশ্বনাথ অজ্ঞান হইল।।
বিশাইর হইয়াছে মৃত্যুর লক্ষণ।
ঘনশ্বাস বহে তার উত্তার নয়ন।।
বিশারে বাহিরে নিয়া কর অন্তর্জ্জলি।।
হেনকালে প্রভু নাটু সঙ্গে তাড়াতাড়ি।
উঠিতেছে হরিচাঁদ বিশেদের বাড়ী।।
বিশার জননী কাঁদে আগুলিয়া পথ।
বলে আজ ছেড়ে যায় তোর বিশ্বনাথ।
আর কি করিবি খেলা লয়ে বিশ্বনাথে।।

প্রভুবলে আইলাম বিশারে কিনিতে।।

ঠাকুর বলেন বিশে শীঘ্র উঠে আয়।

বয়ে যায় রাখালিয়া খেলার সময়।।

খেলা ছাড়ি কেন বা রইলি অন্তর্জ্জলে।

অন্তর্জ্জলে তুই দেখে মোর অন্তর জলে।।

এতবলি হস্ত ধরি বিশারে তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে যেন বিশে গোষ্ঠেতে চলিল।।

বিশ্বনাথ গোঠে গেল ঠাকুরের সঙ্গে।

রাখাল মণ্ডলে গিয়া খেলা করে রঙ্গে।।

উঠিল মঙ্গল রোল জুড়িয়া মেদিনী।

বাল বৃদ্ধ যুবা করে জয় জয় ধ্বনি।।

কেহ বলে বলে রামকান্ত দিয়াছিল বর।

এছেলে মনুষ্য নয় ব্রহ্ম পরৎ পর।।''[৩৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর যে পরবর্তীকালে সকলের প্রিয় হরিচাঁদ ঠাকুর রূপে পরিচিত হবেন এ যেন তারই প্রথম প্রকাশ। রাখালের সঙ্গে গোচারণ সময়ে সকল রাখালের সঙ্গে খেলা করতেন। ফুলসাজে সাজতেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে—

''রাখাল সঙ্গেতে করিতেন গোচারণ।

নতুন মাধুর্য্য খেলা খেলিত তখন।।

গোপাল রাখিতে হত গোপাল আবেশ।

গোপালক সঙ্গে হোত গোপালের বেশ।।

খেলিতে খেলিতে সঙ্গীগণ সমিভ্যরে।

যাইতেন রত্নডাঙ্গা বিলের ভিতরে।।

বলিতেন সঙ্গীগণে থেকে বিলকূল।

উঠাইয়া আন গিয়া কস্তুরীর ফুল।।

আন ভাই অই ফুল আমি অঙ্গে পরি।

রাখালেরা এনে দিত কুসুম কস্তুরী।।

সেই কস্তুরীর ফুল পরিত কর্ণেতে।

পদ পরে পদ রেখে দাঁড়াত ভঙ্গীতে।।''[৩৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবারটি ছিল পূর্ব থেকেই রামকান্তের সহায়তায় বাসুদেব কৃষ্ণ ভক্ত। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রের ক্রিয়া কর্মের যে রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম থেকে। তাঁকে পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাব ধারার মানুষ বিভিন্ন ভাবে ভক্তির চোখে দেখতেন। তাই তিনি কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণ, চৈতন্য ভক্তের শ্রীচৈতন্য, আবার রামভক্তের রাম, আবার কখনো লক্ষ্মী নারায়ণের ভক্তের সেই লক্ষ্মী নারায়ণ রূপী শান্তিদেবী ও হরিচাঁদ ঠাকুরকে কল্পনা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভক্তরা। আসলে ভক্তি ভাবনার গভীরতাই প্রকাশিত হয় এই কল্পনার মাধ্যমে। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তের এই শ্রদ্ধা ভক্তিকে উপেক্ষা না করেই সেই ভক্তি ভাবনাকে মূল শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে তিনি তাদের ধর্ম জীবন ও কর্মময় ও সুখময় জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমকালে ও তৎপূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়েও একটি জনপ্রিয় ভক্তিবাদ রাম ভক্তি ধারা। এবং রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য তা সাহিত্য বিচারের সময়। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম সাহিত্য হিসাবেও জনপ্রিয় কাব্য। তাই তৎকালীন সময়ে রামায়ণ গান একটি উল্লেখযোগ্য গান। রামায়ণ গান গ্রামাঞ্চলের মানুষের একটি পরিচিত গান। কীর্ত্তনীয়ারা গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান পরিবেশন করতেন। তাই 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' পাওয়া যায়—'মাঝে মাঝে শুনে থাকি গীত রামায়ণ।।' রামায়ণ কাহিনির জনপ্রিয়তা ছিল তৎকালীন সময়ে। রামায়ণের অন্যতম কাহিনি যে রাম থেকেই আশ্বিন মাসে অম্বিকা পূজা হয়। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে তার বর্ণনা পাওয়া যায়—

''অকালে বোধন করে রাম দয়াময়।

কস্তুরী কুসুম পেয়ে দেবী তুষ্ঠা হয়।।

বসন্তে বাসন্তী দুর্গা পূজিত সবায়।

রাম হতে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা হয়।।''[৩৬]

সাহিত্য যেমন আধুনিক সমাজের দর্পণ, তেমনি ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতেও ধর্ম ভাবনা, তৎকালীন সমাজ ও সমকালের ঘটনাবলীর প্রতিফলন থাকে। এই ধর্ম সাহিত্যগুলিতে অবতার

বা মহামানবের অলৌকিক ও লৌকিক জীবনের মধ্যে দেশ কাল ও সমাজের বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আমার আলোচ্য কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের মর্ত্যজীবনের লীলাকাহিনির মধ্যে সেই সব মানুষের কথা বলা হয়েছে—যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই। হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের ঊষালগ্নে বঙ্গদেশের জরাজীর্ণ সমাজ সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অনাচার ব্যভিচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মের শুধুমাত্র সংস্কার চান নি, চেয়েছিলেন তার আমূল পরিবর্তন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক ও গ্রামজীবনের মানুষেরা কীভাবে তিলে তিলে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে সেই বেদনার ইতিহাসকে ধর্মের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত করে তিনি তাদের ভাষা দিয়েছিলেন। তারই কাহিনি পরপর অধ্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), প্রকাশভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, অক্টোবর, ২০০৯, পৃ. ৩২০-৩২১।

২. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৯।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

৭. বিশ্বাস, নীতিশ, সম্পাদনা, শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন, ৮৮, এম. জি. রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩, মে, ২০১৫, পৃ. ১১৪।

৮. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১০. হালদার, আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস,

ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

১১. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৯।

১২. হালদার আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৪১।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

১৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৭।

১৫. পাগল, বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশক, আমতলী বরিশাল, পৃ. ৩৪।

১৬. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৮।

১৭. হালদার, আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৭০।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪।

২০. হালদার আচার্য মহান্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশন, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪৮।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮।

২২. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রকাশক, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ, রবিবার, ২০১২, পৃ. ৯৫।

২৩. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, ৪র্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৩।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মতুয়া ধর্মের পরিচয়

ঊনবিংশ শতক নবজাগরণের সময়। এই সময়ই ভারতবর্ষে শুরু হয় আধুনিক শিক্ষার প্রচলন, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্যার ও সুযোগ হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল হিসাবে প্রথম বাঙালি সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে। উনিশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সমাজ সংস্কার । সমাজের মধ্যে যে ধর্ম ভাবনা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল সেই প্রাচীন প্রবাহিত ধর্ম ধারার মধ্যেই ছিল কুসংস্কারের মারী বীজ নিহিত। একথা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত কয়েক জন মানুষ প্রথম অনুভব করতে পারেন এবং তারা সেই কুসংস্কার থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ধর্ম সংস্কার করেন। সংস্কারের দ্বারা সমাজে অনেক ধর্মভাবনার প্রকাশ ঘটলেও সমাজের অতি অল্প মানুষই তাতে উপকৃত হন। নব শিক্ষার যে জাগরণ তা হল গ্রন্থনির্ভর জাগরণ বা সহজ ভাবে বলা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে মানুষ; যে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেছিল তারই একটি দিক। মানুষের উন্নতি হৃদয় বত্তার দ্বারাই একমাত্র অগ্রগামী হয়। এ সত্য সর্ব যুগে সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায়ই সমান ভাবে প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতক নব আলোকের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ ছিল গভীর ভাবে। সমাজের সকল মানুষের জাগরণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই বিভেদ নীতি।

ঊনবিংশ শতকের নব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে, প্রতিয়মান, তাঁরা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত। নব আলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হলেন—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকান্দ প্রভৃতি মানুষেরা ছিলেন ঊনবিংশ শতকের নক্ষত্র রূপ। কিন্তু এই যে মানুষগুলি প্রত্যেকেই ছিলেন নবজাগরণের মাধ্যম কলকাতাকেন্দ্রিক মানুষ। তাদের চিন্তা চেতনার বিস্তারের সুযোগ ছিল ব্যাপক। অপরদিকে ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের অধিপতি হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন গ্রাম বাংলার মানুষ। আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের সময়ে হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের জাগরণ ঘটালেন তারই অন্বেষণ।

ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলার ঘরে জন্ম নিলেন। পল্লীবাংলার

চিরশোভা 'ছায়া সুনীবিড় শান্তির নীড়' গ্রাম বাংলার পল্লী প্রকৃতিতে। সেই পল্লীবাংলার মায়ের আদরের সন্তান হরিচাঁদ ঠাকুর। জন্মগত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ধর্ম শিক্ষার আদর্শকে। পিতা যশোবন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণাদেবীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর দ্বিতীয় পুত্র। আর পল্লীগ্রামের তথা সমগ্র দেশে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল তা মূলত ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা। ঊনবিংশ শতক থেকে প্রথম আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পল্লীবাংলার বড় কৃষক পরিবারের সন্তানটি ছিল বাল্যকাল থেকেই প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ও অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। এই হরিচাঁদ ঠাকুরই পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের দ্বারা দিশাহীন মানুষকে তাঁদের চিরায়ত মানবাদর্শকে ফেরত দেন নিজ কর্মবলের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুর যে আদর্শ পরিবারের সন্তান ছিলেন তাঁর চরিত্রাদর্শ থেকেই বোঝা যায়। আধুনিক শিক্ষার প্রাক্‌কালে সমাজের যে নিয়মনীতির প্রচলন ছিল হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সকল নিয়ম প্রথাগুলিকে জানতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর যে জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সেই জাতির নাম হল নমঃ জাতি। এবং সে অঞ্চল ছিল নমঃ জাতির মানুষে পরিপূর্ণ।

মতুয়া ধর্মের আলোচনার পূর্বেই সন্ধান করা প্রয়োজন এই নমঃ জাতির পরিচয় সম্বন্ধে এবং হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকে যে ধর্মভাবনার দ্বারা মানুষকে আত্মশক্তি দান করেন সে ধর্ম হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনায় কেমন ছিল তারই সন্ধান করবো; বিভিন্ন গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ আজও যে প্রগতিশীল ভাবে মানব সমাজে অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই সন্ধান করবো।

প্রাক্-আর্য জাতি পরিচয় ও সংস্কৃতির সন্ধান :

প্রাক্-আর্য ভারতের জাতির পরিচয় গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হলেও অনেক তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাক্ আর্য ভারতের জাতি পরিচয়, ধর্মভাবনা, সংস্কৃতির পরিচয় সামগ্রিক ভাবে না পেলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙালি জাতি যে একটি মিশ্র সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত তা সকলেই স্বীকার করেন। আজকের এই আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের ভূমিকায় আর্য পূর্ব যুগের মানুষের অবদানই বেশি সে কথা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানব। আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে তিনটি অনার্য জাতি বা মূল ভারতীয় জাতির বাস ছিল। 1. Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবাটু শ্রেণীর অনার্য। 2. Austric

অস্ট্রিক জাতি ও দ্রাবিড় জাতি। ভারত সভ্যতার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে সুসভ্য বাঙালি জাতির পরিচয় আমরা পাই সেই সংস্কৃতির মূল উপাদান ধর্ম উপাসনা। সেই ধর্ম উপাসনার বড় বড় দেবতাগুলি প্রাক্-আর্য ভারতেই বর্তমান ছিল। আজ বৃহৎ ভারতে যে হিন্দু ঐতিহ্যের জন্য এত গর্ব বোধ করে থাকেন গোঁড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ তাও অনার্য সংস্কৃতির দান। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন হিন্দু সভ্যতার মূল ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। তিনি আলোচনায় যা বলেছেন তাকে উদ্ধৃতি হিসাবে উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে আজকের হিন্দু সভ্যতা মার্জিত অনার্য সভ্যতারই বিবর্তিত রূপ। শুধুমাত্র গঠন বৈচিত্রটিরই পরিবর্তন ঘটেছে। মূলত দেশীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চলেছে। দ্রাবিড় জাতির পরিচয় বর্ণনা করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন তা হল—

> ''আর্য্যেরা ভারতে আসবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটেছিল বলে অনুমান হয়। পশ্চিম ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের প্রচুর বাস ছিল; তবে অনুমান হয়, এরা উত্তর ভারতে আর পূর্ব ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে মিলে একত্রে বাস করত। অস্ট্রিক (কোল) আর দ্রাবিড়, অই দুই জাতির খুব মিলন আর মিশ্রণও ঘটেছিল বলে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; বড়ো বড়ো বাড়িঘর নগর প্রভৃতি বানাত, — হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীকল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ সাধনার মূলতত্ত্ব ও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার বিরাট সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে বোধ হয়।''[১]

আর্য্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল, তখন দেশে সুসভ্য দুটি বড়ো অনার্য জাতি বাস করত। আর আজকের এই যে উন্নত নাগরিক সভ্যতা তা মূলত দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রথম

প্রচলিত ছিল। আর অস্ট্রিক সভ্যতা ছিল মূলত গ্রামীণ সভ্যতার পরিচায়ক। নবাগত আর্য্যদের সভ্যতা ছিল মুখ্যত যাযাবরও অংশ গ্রামীণ সভ্যতা। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং নবাগত আর্য্য এই তিন জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও রক্তের সংমিশন ঘটলে নবভাবের জন্ম হয় ধীরে ধীরে। এই সংমিশ্রণ ও পাশাপাশি বসবাসের ফলে প্রথমে যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক দিনের ভাবের আদান প্রদানের মধ্যে স্থান পেল দুই সংস্কৃতির মানুষের জীবনের ধর্মকর্ম ও তত্ত্বদর্শন ও ভাবের। এর ফলে দেখা যায় অনার্য্য বা মূল ভারতীয় যে সংস্কৃতি, অনার্য্যের দেবতা, অনার্য্যের ধর্মানুষ্ঠান, অনার্য্যের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান, অনার্য্যের ভক্তিবাদ, আর্য্যদের বিশেষ উপসনা রীতি 'হোম' এর জায়গায় বা সহাবস্থানে স্থান করে নেয়। এবং এদেশীয় রাজা বা অনার্য্য রাজাগণ ও আর্য্যদের ভ্রাতৃ ভাবে গ্রহণ করতে থাকে। ফলে আর্য্যদের ভাষা যা সংস্কৃত ভাষা বা দেবনাগরী হরফ ও বঙ্গীয় অনার্য্য ভাষা বা আদিতম যে ভাষায় মূল ভারতীয়গণ কথা বলত সেই ভাষার ও সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে গড়ে ওঠে মিশ্র আর্য্যানার্য্য সভ্যতা, বা হিন্দু সভ্যতা, এই মিশ্রণ ঘটে আর্য আগমনের পর। এই যে তথাকথিত হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় National বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠতে আনুমানিক হাজার বছরের মত সময় লাগে। অর্থাৎ খ্রিস্ট-পূর্ব-১৫০০ -র পরে। বুদ্ধদেবের সময়কাল খ্রিস্ট-পূর্ব, ৫০০ দিকে—হিন্দু সভ্যতার কাঠামো তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একথাও জোর দিয়ে বলা যায় যে মূল ভারতীয়দেরই ছিল লীলাকথা, প্রাচীন রাজা রাজরাদের কাহিনি। সম্প্রতি অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে অনেক নতুন তথ্যের যা অনেককাল ধরে ছিল গোপনে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে—

> ''ক্ষত্রিয়েরা মুখ্যতঃ অনার্য্য রাজন্য সম্প্রদায়ের লোক; দেশে আবহমান কাল থেকে যে অনার্য্য রাজারা রাজত্ব করতেন, নবগঠিত মিশ্র হিন্দু-সমাজে তাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখে তাঁরাই ক্ষত্রিয় রূপে গৃহীত হলেন।''[২]

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও প্রাক্-আর্য্য পর্বের সন্ধান দিলেন এভাবে—

> ''১৯২০ সালে যখন পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলেন, এবং তাহার পরে যখন দক্ষিণ পাঞ্জাবের হড়প্পায় ও সিন্ধুপ্রদেশের মোহেন-জো-দড়ো ও অন্যত্র এক বিরাট নাগরিক সভ্যতার বহু নিদর্শন বাহির হইতে লাগিল, তখন বিশেষজ্ঞগণ এই সভ্যতাকে বেদ বর্ণিত জগৎ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক দেখিয়া ভারতের আর্য্য-পূর্ব যুগের জাতিদের সঙ্গে ইহার সংযোগ অনুমান করিতে লাগিলেন।..... সুতরাং ভারতের যে আর্য্য পূর্ব জাতি মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমের অধিবাসী জাতিদের যোগ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হইল।''[৩]

ভারতের আদি জাতির মানব গোষ্ঠী কারা এ প্রশ্নের ও উত্তর দিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন—

''নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া মনে হয় যে, আদিম দ্রাবিড় জাতি-ই ভারতের সুপ্রাচীন যুগের আর্য্যদের আসিবার পূর্বের কালের এই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল; 'স্রষ্টা' জোর করিয়া বলিতে না পারি-তাহাদের মধ্যেই এই সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, একথা বলিতে পারি।''[৪]

দ্রাবিড় জাতি যে আর্য্য পূর্ব ভারতে একটি সমৃদ্ধিমান জাতি ছিল একথা সর্বজন স্বীকৃত। আর্য্য পূর্ব ভারতে যে প্রাচীন অধিবাসীরা বাস করত তাদের নিজস্ব ভাষাও ছিল। আর প্রাচীন ভারতবাসীর ভাষা হারিয়ে যাওয়ার নয়। বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার পরিবর্তন বা বিবর্তনের মধ্য দিয়েও সেই মূল ভারতবাসীদের ভাষার সন্ধান করলে দেখা যায় মিশ্র ভাষায় ও আদি ভারতীয় ভাষা তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও ড. অতুল সুর আমাদের প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনার্য্য ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—

''আর্য্যদের প্রথম আগমণের সময়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে দ্রাবিড় কোল প্রভৃতি অনার্য্য ভাষা বল্‌ত তাতে কোন সন্দেহ

নেই। আর্য্যদের আসবার বহু শত বৎসর পর পর্য্যন্তও এই সব অনার্য্য ভাষা জীবন্ত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ে, এমনকি তার ৫০০/৬০০ বৎসর পরেও—উত্তর-ভারতবর্ষেরও অনেকখানি জুড়ে জন সাধারণ অনার্য্য ভাষা বলত, ...। এইসব অনার্য্য ভাষীদের দ্বারা আর্য্য ভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, আচার-অনুষ্ঠানও আর্য্যীকৃত হয়ে গেল, সেগুলি সর্বজন-গৃহীত হয়ে পড়ল- পৌরাণিক দেববাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল- বৈদিক ধর্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল' অনার্য্যদের বড়ো বড়ো দেবতা-শিব, উমা, বিষ্ণু- অনুরূপ আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেন, তাদের আরও মহনীয় করে তুললেন। অনার্য্যদের বৃক্ষদেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ নাগ, আর দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতারূপে কল্পিত নানা পশুপক্ষীর প্রতীকের মাধ্যমে পূজা এসবও এসে গেল।''[৫]

আর্য্য ও অনার্য্য জাতির যে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠল তাদের ভাষায়ও এল মিশ্রণ। এই মিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি হল সে ভাষা হল সংস্কৃত ভাষা। সেই মিশ্র ভাষার মূলেও রয়েছে অনেক দ্রাবিড় শব্দ। Kittel-এর (কিটেল) বিখ্যাত কানাড়ী অভিধানের ভূমিকায় ৪৫০টি শব্দের আলোচনা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার অনেক উপাদান যা মূলত বেদ বিরোধী ও বৈদিক জগতের বহির্ভূত তা এই ভারতীয় মূল আদিবাসী দ্রাবিড় সভ্যতার থেকে গৃহীত হয়েছে।

আলোচনার মাধ্যমে দেখব 'হিন্দু সভ্যতার গঠনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান' সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন ড. অতুল সুর মহাশয়। ড. সুরের আলোচনার কিছু অংশকে তুলে ধরলাম ভারত সংস্কৃতির প্রাথমিক রূপের পরিচয় গ্রহণের জন্য। ড. অতুল সুর নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

''সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার যে সকল লক্ষণ, তার সবই আমরা সিন্ধু সভ্যতার নগর সমূহে লক্ষ করি। পেনসিলভেনিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল বলেন যে চীন, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র সমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেছি। নগরগুলির রাস্তাঘাট বেশ সুপরিকল্পিত ছিল। ঘরবাড়ি দগ্ধ-অদগ্ধ ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত হত। নগরের মধ্যে ছিল সুদৃঢ় উচ্চ প্রাকার বিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, দেবালয় ও সমাধিস্থান। এক কথায় সংবদ্ধভাবে নাগরিক জীবন যাপনের সব লক্ষণ এই সভ্যতার কেন্দ্র সমূহে উপস্থিত ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসন ব্যবস্থাও ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহ সামগ্রী নির্মাণে তামা ও ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহার ছিল। পরিবহনের জন্য চক্র বিশিষ্ট যান ছিল। ভাষার রূপ দানের জন্য লিখন প্রণালীর ও ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার মানে সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষায়তনও ছিল। নগরগুলির নির্মাণ রীতি ও বিন্যাসের ঐক্য দেখে মনে হয় যে, বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কিত কোন সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যার নির্দেশ অনুযায়ীই নগরগুলি নির্মিত হত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের যে পাটি গণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির বিশেষ রকম জ্ঞান ছিল তার বহুল নিদর্শন আমরা পেয়েছি। ধাতু বিদ্যাতেও তাদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।''[৬]

আজকের মিশ্র বাঙালি বাংলাদেশের বাসিন্দা বাঙালি সংস্কৃতির গঠন একদিনে হয়নি। আর হিন্দু সভ্যতার মূলে যে প্রাগার্য সভ্যতার অবদান অনেক বেশি একথা অনস্বীকার্য। আর একটি ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান দ্বারা একথা প্রমাণ করবো আর্য সভ্যতা নবাবিস্কৃত পৌরাণিক সভ্যতার স্রষ্টা নন। তার পরিচয় গ্রহণ করবো। ড. অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থ থেকে। বৈদিক সভ্যতার থেকে পৃথক এই সিন্ধু সভ্যতা একথার পাশাপাশি এও জানাচ্ছেন এদেশীয় আদিবাসী বা অনার্য্যদের জীবন ধারাই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়। ড. অতুল সুর মহাশয়ের বর্ণনাই তুলে ধরলাম আলোচনায় সুবিধার জন্য। অনেকেই মনে

করেন যে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক আর্য সভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু এটা ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুই সভ্যতার মৌলিক পার্থক্যগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায়। দুই সভ্যতার মূলগত পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হল—

> " ১. সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন উপাসক ছিল ও মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন-উপাসক ছিল না শিশ্ন উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। আর্যরা পুরুষ দেবতার উপাসক ছিল। মাতৃকা দেবীর পূজার কোন আভাসই আমরা ঋগ্বেদে পাই না।
>
> ২. আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল। ঘোড়াই ছিল তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তু। এখানে বলা দরকার যে, ঘোড়ার কোন অশ্মীভূত অস্থি আমরা সিন্ধু সভ্যতার কোন কেন্দ্রে পাই নি। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দের প্রতিকৃতি ক্ষোদন থেকে বুঝতে পারা যায়। পশুপতি শিব আরাধনার প্রমাণও মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীর্বদ শিবেরই বাহন। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র সমূহে বলীবর্দের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়।
>
> ৩. সিন্ধু সভ্যতার বাহকেরা নগরবাসী ছিল। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস করত। সে জন্য তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম পুরন্দর রেখেছিল।
>
> ৪. আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতকে সমাধিস্থ করত।
>
> ৫. আর্যদের মধ্যে লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন-প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল।
>
> ৬. সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু পাঞ্চাল দেশ অর্থাৎ যেখানে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্য মূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ। সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র সমূহ থেকে যে সব মৃৎ

পাত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলির রঙ 'কালো লাল'।

৭. সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষি ভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষি কার্য জানত না। এটা আমরা শত পথ ব্রাহ্মণের এক উক্তি থেকে জানতে পারি।

৮. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা হাতির সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যদের কাছে হাতি এক নূতন জীব বিশেষ ছিল। এজন্য তারা হাতিকে 'হস্ত বিশিষ্ট মৃগ' বলে অভিহিত করত। বস্তুত হাতিকে প্রাচ্য ভারতের পালকাপ্য নামে এক মুনিই প্রথম পোষ মানিয়ে ছিল।''[৭]

অনার্যদের দেশে আর্যদের আগমন হলে স্বাভাবিক কারণেই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পর সংস্কৃতির সমন্বয় একসময় হয়। আর এই সভ্যতার সংস্কৃতির মানুষের সে সময় কীভাবে তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে মিলন ঘটেছিল সে সম্পর্কে ড. অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে যা বলেছেন তাতে দুই সংস্কৃতির মধ্যে কোন সংস্কৃতির প্রাধান্য বজায় থাকল তার নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্তিগুলির কিছু অংশ গ্রহণ করলাম—

''আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে আমরা 'কুরু-পঞ্চাল' দেশ বলতাম যা গঙ্গা ও যমুনার অন্তবর্তী অঞ্চল। সেখানে আর্যদের আপস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতিগান করে না। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করে না। নূতন দেবতা মণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের ঘৃণার

চক্ষে দেখতেন ও যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সমূহেরই জয় হল। বেদ সংকলন ও মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদি রচনার ভার ন্যস্ত হল এক অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের উপর।"[৮]

আজকের ধন ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার প্রচলন তাও হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকেই উদ্ভূত একথা জানা যায়। বাঙলাই মাতৃদেবীর পূজার লীলাকেন্দ্র। ধান্যের চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী পূজার অপর নাম খন্দ পূজা। খন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফসলাদি। আবার লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী'। 'শ্রী' প্রাচীন ভারতের এক লোকায়ত দেবী ছিলেন। আর হিন্দুদের অপর দেবতা শিব ও শক্তি যে কেবলমাত্র নরাকারে পূজিত হতেন তা নয় লিঙ্গ ও যোনি হিসাবেও পূজিত হতেন। আর সেটার উল্লেখ পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরা যে লিঙ্গ যোনি উপাসক ছিলেন তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলাকারে গঠিত প্রতীক সমূহ থেকে। এছাড়াও প্রাগার্য সূর্য পূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। ছট পূজা, ইতু পূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ। এই যে প্রাগার্য দেবতা বা শক্তির উপাসনা পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে দেবতাদের রূপের পরিবর্তন ঘটে নি; কিন্তু দেবতাদের প্রকাশের ভিন্নতার রূপটি ধরা পড়ে। একটি বিষয় আলোচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে মূলত একটি ভাবধারাই প্রকাশিত সেটা রচনা বৈশিষ্ট্য থেকেই বোঝা যায়, যেমন—ভগবদগীতা ও ব্যাসের রচনা এবং ব্যাস পুরাণগুলির রচয়িতা। আমার গবেষণা গ্রন্থের আলোচনার পূর্বে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করব।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ :

ধর্ম সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সাধারণত তাতে প্রথমেই যে নামগুলো উঠে আসে তা হল রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ সাহিত্যগুলির কথা। এরপর ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে পড়ে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য সম্ভার। আর ধর্ম সাহিত্য বলতে আর একটি কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতকে। এর আগের যা কিছু সাহিত্য রয়েছে তা দেবদেবীরই কাহিনি। মানুষের উপস্থিতি ভক্তরূপে মানব কুলে জন্মে মানুষের জীবনাচারণের কাহিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করত। আর এই যে ধর্ম সাহিত্য সম্ভার তাতে যতই ভগবান বা ঈশ্বর কথা থাক না কেন এখানে মানুষ ও গৌণভাবে স্থান পেয়েছে। ঊনবিংশ শতকে এল নবজাগরণ ফলে ধর্ম সাহিত্যগুলি বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা আবার বিশ্লেষিত হতে থাকল পণ্ডিতদের কাছে। নবজাগরণের মাধ্যমে প্রথম মানুষ ধর্ম সাহিত্য থেকে মানুষের বাস্তব জীবনধর্মী সাহিত্য রচনা করতে অগ্রসর হলেন। ইতিহাস পুরাণ শ্রেণির রচনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। এ দুটি আমাদের ঐতিহ্য সমর্থিত জাতীয় মহাকাব্য। মহাকাব্য দ্বয়ের মধ্যে রামায়ণই প্রাচীনতর। রামায়ণ কাহিনির মূল কাহিনির যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে সেটাই তুলে ধরলাম—

> ''ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে তো বটেই রামকথার মধ্যেও রূপ কথার কাঠামো অথবা প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করা যায়। সুয়োরাণীর বশীভূত রাজা যে সে রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দিবেন দুয়ো (বড়) রাণীর ছেলের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া-এ তো রূপকথার অত্যন্ত সাধারণ মোটিফ। বনে গিয়া নানারকম দুঃখভোগ ও শেষে দেশে আসিয়া রাজ্য লাভ ইহাও তাহাই।.....। যাহাই হউক বাল্মীকি তাঁহার সংগৃহীত ও উদ্ভাবিত উপাদানকে একটি সুসঙ্গ ত সুগঠিত মহাকাব্য আখ্যানে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব কারিগরির একটি প্রধান বাহাদুরি ছিল ভূমিকাগুলির নামের মধ্যে রূপক প্রতীকের ব্যবহার। রাম-লক্ষণ-সীতা-রাবণ এই চারিটিই বাল্মীকি অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চরিত্র। 'রাম' নামের অর্থ বিরত শান্তি ও শান্ত অবস্থিতি। রাম বরাবর সেই কাজই করিয়াছেন। তিনি পিতৃসত্য মানিয়া বনে গিয়া পিতার সংসারে শান্তি দিয়াছিলেন, যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষস বিনাশ করিয়া বনবাসী মুনিদের শান্তি দিয়াছিলেন, বালিকে বধ করিয়া মিত্রকে শান্তি দিয়াছিলেন, রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের দ্বারা আপনার চিত্তকে শান্ত

করিয়াছিলেন, এবং উত্তরকাণ্ডকে ধরিলে, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রজাদের শান্ত করিয়া ছিলেন। 'সীতা' নামের মূল অর্থ চাষা জমিতে লাঙ্গলের রেখা। কৃষি সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে সীতা বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে শ্রীসমৃদ্ধির প্রতীক রূঢ় হইয়া দেবতায় উন্নীত হইতে চলিয়া ছিলেন। কৃষিলক্ষ্মী শান্তির অনুগামিনী। তা 'সমগ্রা রূপিনী লক্ষ্মী' সীতা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'লক্ষ্মণ' নামের মানে শুভচিহ্নকারী। লক্ষ্মণ-লক্ষ্মী-শ্রীর পুরুষ রূপ। তাই তিনি শান্তির সহচর। 'রাবণ' নামের বুৎপত্তিগত অর্থ যুদ্ধ, যুদ্ধ বাহিনী।.....। বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইবার পরে দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যখানি উচ্চ সাহিত্যের মঞ্চেই স্থাপিত ছিল। জনসাধারণে যে রাম কথা জানিত তাহা লৌকিক আখ্যায়িকা, নীতি কথা অথবা রূপকতা রূপেই। বিষ্ণুর অবতার বলিয়া, গৃহীত হইয়া পূজা পাইবার পরেই তবে রামায়ণ জন পদ সাহিত্যের ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছিল। বাল্মীকির কাব্যের নায়ক দেবকল্প নহেন, তিনি সুকৃতকর্মা বীর, তাই তিনি আসল অর্থে নারায়ণ।''[৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় রামায়ণের মূল কাহিনিটি ছিল লোক গাঁথা। পরে আদি কবি বাল্মীকির দ্বারা গ্রন্থবদ্ধ হয়ে মহাকাব্য আকার ধারণ করেছে। আর বাঙালি রামায়ণের লেখক তথা অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝাঁ। আর মহাভারতের বাঙালি অনুবাদক কাশীরাম দাস। এ দু'জনকেই শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের মর্যাদা দেওয়া হয়। যাদের জন্য 'রামায়ণ' 'মহাভারত' বাঙালির ঘরের কথায় পরিণত হয়েছে।

'মহাভারত' সংহিতা অনেক রচনার সংকলন। সংকলিত রচনাগুলি প্রায় সবই নারাশংসী গাঁথা বা আখ্যায়িকা। মহাভারতের মেরুদণ্ড হল বিরাট নারাশংসী গাঁথা তার বিষয় কৌরব ও পাণ্ডব দলের বিরোধ। আখ্যান-আখ্যায়িকা কাব্য-গাঁথা, গাঁথা-স্তব নীতি কথা সাধারণজ্ঞান যুদ্ধবিদ্যা রাজনীতি ধর্মচিন্তা আধ্যাত্মভাবনা-সবকিছুই এখানে উপস্থিত। বিচিত্র রকমের সাহিত্যরস মহাভারতের মধ্যে যেমন আছে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোন

একটি আধারে তেমন নেই। এই বৃহৎ ভারতের নানা কাহিনি উপকাহিনি কোন একটি নিদৃষ্ট কালের রচনা নয়। বহু কালের বহু মানুষের সংকলিত কাহিনির সংযোজন এই বৃহৎ মহাভারত। মহাভারত সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যা বলেছেন তা হল—

> "মহাভারত কোন ব্যক্তির রচনা নয়। বহু ব্যক্তির বহু কালের বহু রচনা বহু গায়কের কণ্ঠে বহু লেখনীর সংশোধন পাইয়া তবে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। রচনার ও সংশোধনের কাজে যাঁহাদের হাত ছিল তাঁহারা যে সবাই বড় কবি অথবা ভালো কবি ছিলেন তা নয়। মহাভারতের আখ্যায়িকা রচনার কালে ছোট কবিও নিজের অজানিতে বড় কবির উদ্যম প্রকাশ করিয়া ছিলেন। এ রচনায় ভদ্র সাহিত্যের বাছ বিচার ছিল না, অলংকার শাস্ত্রের শাসন মানিবার কোন দায়িত্ব ছিল না, পাণিনীয়-ব্যাকরণের বেড়ি ছিল না। তাঁহারা কল্পনাকে নিজের মনোমত পথে ছাড়িয়া দিতেন। এই স্বাধীনতার জন্য মহাভারতের মধ্যে সজীব সাহিত্যের রঙ ও রস মাঝে মাঝে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া যায়।"[১০]

আমাদের ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক জাতীয় কাব্য গ্রন্থটি যে সংকলন গ্রন্থ সে বিষয়ে ড. সুকুমার সেন নিশ্চিতভাবেই বলেছেন—"মহাভারতের কাহিনী জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞে বৈশম্পায়ণ কর্তৃক গীত হইয়াছিল। কিন্তু আখ্যান-আখ্যায়িকাগুলি বিভিন্ন মুনি-ঋষির উক্তি বলিয়া লেখা আছে। মহাভারত যে সংকলনগ্রন্থ তাহা ইহা হইতেও উপলব্ধি হয়।"[১১] রামায়ণ, মহাভারত যে বাঙালির নিজের ঘরের কাহিনিতে পরিণত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর ভারতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মচিন্তার ঘণীভূত নির্যাস যাতে প্রকাশিত হয়েছে তা হল 'গীতা'। উচ্চ গ্রামের আধ্যাত্মবাণী যে কবিত্বের বাঁশিতেই বাজে তার এক বড় নিদর্শন হল গীতার মূল বিষয়বস্তু। উপনিষদের ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের পরে ভারতীয় আধ্যাত্ম চিন্তায় ভক্তিযোগের সঞ্চার হয়েছিল। গীতায় ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধনের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং ব্যক্তি ঈশ্বরত্বের সমুন্নীত অবতার বাদের প্রতিফলন রয়েছে গীতায়।

সুকুমার সেন গীতা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তা যেমন মননশীল চিন্তার পরিচায়ক তেমনি তার তাৎপর্য। গীতা সম্পর্কিত আলোচনা যথার্থভাবেই তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ''গীতার পটভূমিকা বেশ নাটকীয় গোছের। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়া প্রতি পক্ষদের দেখিয়া অর্জুনের মন আর্দ্র হইল। ভাবিল, 'এই সবই আমার প্রিয় আত্মীয়-বান্ধব, যাহাদের যত্নেও স্নেহে মানুষ হইয়াছি, যাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছি। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। তখন কৃষ্ণ তাহাকে যে প্রত্যুত্তর দিলেন তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরই উপযুক্ত।
>
> সদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎসে ইতি মন্যসে।
> মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।
>
> 'আমিত্বের উপর ভর করিয়া তুমি যে বলিতেছ 'যুদ্ধ করিব না'। তোমার এ স কল্প বৃথাই। তোমার স্বভাব তোমাকে যুদ্ধ করাইবে।'
>
> সবদেশের সকল অবস্থার সব মানুষের জন্য গীতায় যে অভয় বাণী আছে তাহার তুল্য আর কোথাও আছে কিনা জানি না।''[১২]

এই অভয়বাণী সত্ত্বেও মানুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হয়। সাহিত্যগুলির সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষার ফলে জ্ঞানের বিকাশ যথার্থভাবে হয় না সর্ব জায়গার মানুষের জ্ঞানের আলোক পাওয়া সম্ভব হয় না ফলে সকলে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় না। প্রয়োজন হয় মহামানবের।

প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে যেগুলির নাম উঠে আসে তা হল 'পুরাণ'। পুরাণের কারবার প্রধানত দেবতাও অসুরের। ড. সুকুমার সেন পুরাণ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল—

> ''পুরাণের কারবার প্রধানত দেবতাও অসুর, কখনও কখনও দেবকল্প ও অসুরকল্প মানুষ লইয়া। পুরাণের মানুষকে ইতিহাসে ধরা যায় না, বাস্তবে তো নয়ই। সে সম্পূর্ণ ভাবে মিথলজির। ইতিহাসের তুলনায় পুরাণে দেবতার অবতারের ক্ষেত্র অনেক

প্রশস্ত। 'পুরাণ' নাম দেওয়া গ্রন্থগুলি বিভিন্ন কালে রচিত ও সংকলিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম পুরাণের সংকলন কাল ৪০০ খ্রিস্টাব্দের আগে যাইবে না। অর্বাচিনতম পুরাণ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা। পুরাণগুলিতে বিবিধ দেবতার মাহাত্ম্য স্থাপিত হইলেও বিষ্ণুই সমস্ত পুরাণের অধিদেবতা।''[১৩]

ইতিহাসও পুরাণ সাহিত্যে আঠারো এই সংখ্যাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কেননা ইতিহাস পুরাণ রচয়িতাগণ এই সংখ্যার ব্যবহার করেছেন অনেক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। যেমন মহাভারতের পর্ব সংখ্যা ১৮, গীতার অধ্যায় সংখ্যাও আঠারো, পুরাণের সংখ্যাও আঠারো। আরও একটি সত্য প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক যে ব্যাসদেবের নামে চলে এই পৌরাণিক জ্ঞানভাণ্ডার সম্বলিত গ্রন্থগুলি। পুরাণের রচনার মূল উপাদান আবার গীতার— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের প্রভাব রয়েছে এবং এই ত্রিগুণের দেবতাগণ হলেন—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব। এই তিন শক্তির প্রতীক এই তিন দেবতার আঠারোটি পুরাণ রচিত হয়েছে মূলত। কিন্তু পুরাণ কাহিনির যে, অন্ত নেই সেই রূপ আরো অনেক উপ-পুরাণ রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময় ধরে। এই কাল্পনিক পৌরাণিক কাহিনির প্রভাবে সমাজের ভক্তিবাদের বিস্তৃত আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে এও আমরা দেখব যে ধর্ম সংস্কার করা কত কঠিন। যুক্তি মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য কীভাবে প্রথমে মানুষের মনকে বাস্তব জগতের কর্মবাদের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

হরিচাঁদ ঠাকুরের জাতি পরিচয় ও নমঃজাতির অতীত ইতিহাস সন্ধান :

হরিচাঁদ ঠাকুর জাতিগত পরিচয়ে নমঃশূদ্র পরিবারের সন্তান। হরিচাঁদ ঠাকুর যে জাতির সন্তান এবং যে ভাবধারার দ্বারা বড় হয়েছিলেন তা হল বৈষ্ণবীয় ভাবধারা। কিন্তু জাতিগত পরিচয়টি একটি সমাজ জীবনের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করলেও তাঁর পরিচয় হয় স্বকর্মের দ্বারা। আমার আলোচ্য হরিচাঁদ ঠাকুর কর্মের দ্বারা অতি অল্প বয়সেই ভগবান হিসাবে পূজিত হয়েছেন। কর্মের দ্বারা ভগবানের মর্যাদা পেলেও আজ একথা সর্ব প্রথমেই আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে; এই নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস সন্ধানের। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন—

''নমঃশূদ্র কুলে এল ব্রহ্মসনাতন।''[১৪]

নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস সন্ধান :

কোন জাতির অতীত ইতিহাস সন্ধান করতে হলে যে কথাটি সর্ব প্রথমেই প্রয়োজন হয় তা হল জাতির ইতিহাসের। জাতির ইতিহাস লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকল জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং কোন জাতির উত্থান পতনের সঠিক ইতিহাসই পারে জাতিকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আমার আলোচ্য হরিচাঁদ ঠাকুর যে নমঃ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেই নমঃ জাতির সঠিক ইতিহাস সন্ধান করার। এই নমঃ জাতির কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলে একটি বৃহৎ মানব গোষ্ঠির জাতীয় জীবন সম্পর্কে অজানা থেকে যাবে। হরিচাঁদ ঠাকুর যে নমঃ পরিবারে জন্মে ছিলেন। তাঁদের গোত্র ধরে তথ্য অনুসন্ধানে ব্রতী হলাম।

জাতিগত পরিচয়ে কাশ্যপ মুনির বংশধর নমঃ জাতি। কাশ্যপ মুনির বংশধর নমঃ জাতির ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া দরকার তা হলো ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বংশ বা গোত্র সৃষ্টির ইতিহাস। এই গোত্র সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতিগত পরিচয়ের অনালোকিত ইতিহাস। নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস রচনা করেছেন মনিমোহন বৈরাগী। তাঁর নমঃ জাতির ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'অনালোকিত ইতিহাসের উত্থান-পতনে কাশ্যপ মুনির বংশধর 'নমঃ জাতি'।' তিনি নমঃ জাতির ইতিহাস সন্ধান করেছেন গোত্র ধরে। মনিমোহন বৈরাগী নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল—

> ''কোন এক সময় প্রাচীন ভারতীয়রা ছিল উপজাতীয় ভিত্তিতে বিভক্ত। যদিও উপজাতি এখন জাতিতে পরিণত হয়েছে। তথাপি উপজাতীয় অবস্থান এখনও বিদ্যমান। যেমন— নমঃ উপজাতিটি এখন নমঃ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হলেও তা আসলে নমঃদের সেই উপজাতীয় অবস্থানই বটে। প্রতিটি উপজাতির মানুষেরা ছিল ছোট ছোট অসংখ্য পরিবারে বিভক্ত। সমস্ত পরিবারের উপাস্য বিষয় একই রকম ছিল না। সজীব বা নির্জীব উপাস্যের

ভিত্তিতে একই উপজাতির মানুষেরা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। তাই একই ধরণের উপাস্যেরা মিলিত ভাবে অসবর্ণ বিবাহে সম্মতি সূচক এক একটি দল গঠন করে। যাকে বলা হয় গোত্র বা কূল। ফলশ্রুতিতে একই উপজাতির মানুষেরা একাধিক গোত্রে বিভক্ত হয়। এই সমস্ত গোত্রের আবার নামকরণ হয় উপাস্যরা যে ব্যক্তির ভাবনা অনুযায়ী দলবদ্ধ হয় ঐ ব্যক্তির নামানুসারে। যা মূলত কোন জাতি নয়, একটি পরিবার। যেমন, কাশ্যপ মুনির ভাবনা অনুযায়ী দলবদ্ধরা পরিচিত হয় 'কাশ্যপগোত্র' নামে। এভাবেই নিষিদ্ধ হয় একই গোত্রের মানুষের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন। কারণ তারা মনে করতেন, তারা একই পূর্ব পুরুষের বংশধর। তাদের ধর্মনীততে একই রক্ত প্রবাহিত।"[১৫]

বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে নমঃজাতির লোকেরা মূলত কাশ্যপ গোত্রের লোক বলেই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নমঃরা একাধিক গোত্রে বিভক্ত ছিল। রিজলির মতে—নমঃ জাতির মানুষ চারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। যেমন—১. কাশ্যপ, ২. ভরদ্বাজ, ৩. লোমশ এবং ৪. শাণ্ডিল্য। রিজলি সাহেবের এই গবেষণা মূলক বিবৃতিটি নমঃজাতির ইতিহাস জানার জন্য এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যেহেতু এই গোত্রগুলি এখন ব্রাহ্মণ সহ অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায়। নমঃজাতির ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন। ড. অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে বাংলার জাতি বিভাজনের ইতিহাস প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা নমঃজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ড. সুরের মন্তব্যটি হল—

"...কিন্তু গুপ্তযুগের পরে পাল রাজাগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বাঙলাদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যুগে জাতিভেদের যে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। পাল রাজগণের পরে সেন রাজগণ বাঙলায় আবার ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নূতন করে আবার একটা জাতি বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু পাল রাজগণের

চারশত বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বহু সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' (যা সেন রাজগণের রাজত্ব কালের অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছিল) থেকে জানতে পারি যে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার আর সব জাতিই সংকর জাতি।''[১৬]

'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' একটি উপ-পুরাণ, এই উপ-পুরাণটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক। তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাঢ়দেশে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল এরূপ অনুমান করেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদ দিয়ে সমসাময়িক বাংলাদেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত এ বিভক্ত ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচয়িতা 'ব্রাহ্মণেতর শূদ্রবর্ণের লোকগুলিকে বর্ণ বিভাগ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। আর এই সময় থেকেই নমঃজাতিটি বর্ণবিজাজনের মধ্যে পড়ে বর্ণ ধর্মের স্তরের অধিকারী হয়।

অধ্যাপক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থের 'বাঙলার বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব' আলোচনার সময় নমঃজাতির পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদ দিয়ে অন্য সকলকে জাতিগত বর্ণ বিভাজন করেছেন এ সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়—

''ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে সাংকর্যের কথা যে বলা হয় নাই তাহার কারণ হয়তো এই যে, এই সব পুরাণ ও স্মৃতি প্রায়শ তাঁহাদেরই রচনা; অথচ নরতত্ত্বের দিক হইতে দেখা যাইবে এই জাতি সাংকর্য অম্বষ্ঠ ও করণদের সম্বন্ধে যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও। নরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই কথাটা ভাল করিয়া ধরা পড়িবে এবং দেখা যাইবে; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পরিবাণে সংকর, বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তম এবং মধ্যম সংকর বিভাগের অধিকাংশ বর্ণই সেই পরিমাণে এবং প্রায় একই বৈশিষ্ট্য সংকর।''[১৭]

আমার আলোচনার সুবিধার্থে শুধুমাত্র নমঃশূদ্রদের নরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ

করলাম। কেননা সময় ও প্রবন্ধ বিস্তার জনিত কারণে অন্য জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করলাম না। যথা সময়ে অর্থাৎ গুরুচাঁদ ঠাকুর ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ ভাবনায় সমগ্র জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করব বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে। নমঃশূদ্রদের যে অসংখ্য জনসাধারণ বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ জাতি তাদের দেহ গঠনের পরিমিতি যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে হাটন ও রিজলির নাম করতেই হয়। এরা সকলে নমঃশূদ্রদের বিশ্লেষণ করে যা পেয়েছেন সেই তথ্যই পরিবেশন করেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় সেই সম্পর্কে বলেছেন তা হল নিম্নরূপ—

> ‘‘ইহাদের সকলের সম্মিলিত বিশ্লেষণ হইতে দেহগঠন, চোখ ও চামড়ার রং, কেশ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সহজেই ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চবর্ণের লোকদের মতো ইহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক এবং নাসা তীক্ষ্ণ ও উন্নত; ইহাদের চোখ ও চামড়ার রঙও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই মতো, অথচ স্মৃতি শাসিত হিন্দু সমাজে ইহাদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিতি গণনার মধ্যে তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যুক্তি হয়ত পাওয়া যাইবে জাত সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।’’[১৮]

এই বৈশিষ্ট্য এগুলি ছাড়াও কয়েকটি জাতির লোকদের সম্বন্ধে এবং উক্ত বৃহদ্ধর্ম পুরাণের সকল জাতিগুলির সম্বন্ধেও অতিরিক্ত কিছু কিছু পরিমিতি গণনা বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদেরা করেছেন, সেখানেও উচ্চবর্ণ লোকদের সম পর্যায় ভক্ত নমঃশূদ্ররা। ড. নীহাররঞ্জন রায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

> ‘‘...উচ্চ বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বর্ণের বাঙালীর দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে মধ্যমাকৃতি; নমঃশূদ্ররাও তাহাই।

.....।

মুণ্ডাকৃতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং নমঃশূদ্ররা যেমন গোলাকৃতি, উত্তম সংকর পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণ তেমনই।

.....।

নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নমঃশূদ্র বর্ণের লোকেরা সকলেই সাধারণত তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসা।''[১৯]

'ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালীর স্থান' বিষয়ক আলোচনার মধ্যেও দেখা যায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তার পরিচয়। নমঃশূদ্রকেও চণ্ডাল জাতিকে অনেক ঐতিহাসিক সমপর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করলেও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি ঠিক তার পরিচয় দেয় না। এমনকি নমঃজাতির মধ্যে যে সমাজ সংস্কার মূলক ক্রিয়া কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাতেও তারা ব্রাহ্মণ সমগোত্রীয় পর্যায়ে পড়ে। যেমন—পূজায় অন্নভোগ অধিকার, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেও দশ দিন পালন করা হয়, বিবাহ ও সেই একই পর্যায় ভুক্ত এ থেকেও বোঝা যায় তারা ক্রিয়াকর্মেও উচ্চবর্ণের সমগোত্রীয়। সেকথাই বার বার ব্যক্ত করেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়; যে উচ্চবর্ণের নরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবিভাজিত সমাজের তাঁদের স্থানের যথার্থ পরিচয় অনুসন্ধানের বিষয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় যে প্রশ্নের উত্তর পান নি সেই অনালোকিত অতীত ইতিহাস রয়েছে নমঃজাতির। সেই অতীত ইতিহাসের সন্ধান করার আগে রায় মহাশয়ের উক্তিটিকে গ্রহণ করলাম আলোচনার সুবিধার্থে—

''নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্যকর। ....., দেহ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর ভারতের বর্ণ ব্রহ্মণদের সমগোত্রীয়; বস্তুত উত্তর ভারতের বর্ণ বাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণ- বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালী নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ এই নমঃশূদ্রেরা আজ সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। আমরা বৃহদ্ধর্ম পুরাণ রচনার কালেই ইহারা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত। এই সামাজিক তথ্যের

সঙ্গে নরতত্ত্ব প্রমাণগত তথ্যের যুক্তিরও ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যার

কোন সম্বন্ধ এখনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"[২০]

বাংলায় পাল রাজাগণের পরাজয়ের পর সেন রাজত্ব কালে নবভাবে ধর্মসংস্কার হয়। আর সেই পূর্বের পরাজিত পাল রাজাগণের বংশধরগণকে যখন ধর্ম পরিবর্তনের আদেশ দেন সেন বংশীয় রাজাবল্লাল সেন তখন পাল রাজগণের বংশধরগণ ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ফলে রাজরোষের স্বীকার হন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজগণ। এই ধর্ম পরিবর্তন ও রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে নমঃজাতির লোক পাল রাজগণ মেনে নিতে পারছিল না। এই সত্যকে আমরা জানতে পারি 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' থেকে। আচার্য মহানন্দ হালদার এভাবে বর্ণনা করছেন—

"পাল বংশ মহাতেজা বঙ্গদেশে সবে রাজা

বৌদ্ধধর্ম আসিল এদেশে।

বৌদ্ধরাজ ধর্ম্ম মানি বঙ্গবাসী যত প্রাণী

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিল শেষে।

উদার বুদ্ধের নীতি নাহি জানে ভেদ নীতি

জাতি জাতি ভাগ নাহি করে।

প্রেমের নিগড়ে বান্ধি সবে করে কাঁদা কাদি

ভ্রাতৃভাব আনিল সংসারে।"[২১]

ধর্ম নীতির যে সুফল ও কুফল এই বর্ণ ধর্মাবলম্বী ভারতীয় ধর্ম বা ধর্ম সাহিত্যগুলিকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। কোন মানুষ ধর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। তার নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে দেয় ধর্ম। এক রাজ বংশ এক একটি ধর্ম ভাবনায় বিশ্বাসী। রাজ্য শাসন কালে রাজার আদেশই বিধির নির্দেশ স্বরূপ। পরাজিত রাজপরিবার রাজ্যের সমস্ত মানুষেরও নব রাজার আদেশ মানতে বাধ্য হয় অনেকে আবার এই নব নির্দেশ অমান্যকারী ধর্ম রক্ষাকারী ভক্ত মানুষ ও থাকে সমাজে। পাল রাজাগণ সহ তার অনেক সমধর্মী মানুষ সেন রাজগণের আদেশ অমান্য করে পূর্বের বৌদ্ধ ধর্ম নীতির আশ্রয়ে থাকেন। কিন্তু সেন রাজাগণ নবভাবে ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার করেন। প্রবর্তন করেন নতুন ধর্ম সাহিত্য নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রবর্তন করেন কৌলিণ্য প্রথা। নব কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন

করেন তার থেকে অনেক মানুষই বাদ পড়ে যায় নৈতিকতার বিরোধের জন্য। রাজ্যের অনেক মানুষ যারা রাজ আদেশ পালন করেন তাদের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যারা নিজের ধর্ম-কর্মের পরিবর্তন না করে নব রাজার নির্দেশ অমান্য করেন সেই সকল মানুষের যে চির দুঃখ অনিবার্য হবে এটাই স্বাভাবিক। একথাই আচার্য মহানন্দ হালদার তাঁর গুরুচাঁদ চরিত নিম্নলিখিত ভাবে জানাচ্ছেন—

"বল্লাল সেনের কালে কৌলিন্য প্রথার ছলে
পঞ্চ শূদ্রকুলীন হইল।
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রাজা শ্রীবল্লাল মহাতেজা
রাজ্য মধ্যে করিল ঘোষণা।
বঙ্গভূমি পূণ্য স্থান বৌদ্ধ হল অন্তর্দ্ধান
বৌদ্ধ ধর্ম্মে কেহ থাকিবে না।"[২২]

রাজার আদেশ অমান্য করে ধর্ম রক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে চলে যায় অনেক বৌদ্ধ পরিবারের লোকজন। বৌদ্ধ ধর্মকে দেশ ছাড়া করতে পারলেও যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাদের জীবনপণ রক্ষার মধ্যেই বেঁচে রইল পরাজিত বৌদ্ধ রাজ ধর্ম।

"কিংবা দেশ ছেড়ে যাব বনে কি জঙ্গলে রব
নাথাকিব রাজধানী পাশে।
যদি মোরা রাখি ধর্ম মোদেরে রাখিবে ধর্ম্ম
দেখা যাক কিবা হয় শেষে।"[২৩]

এই প্রসঙ্গে মণিমোহন বৈরাগী তাঁর 'অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূলনিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা' গ্রন্থে নমঃজাতির অতীত ইতিহাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক বিখ্যাত মানুষগুলির কথা বলেছেন। তাঁরা এই নমঃজাতির যথার্থ পরিচয় বহন করেন। মনিমোহন বৈরাগীর মন্তব্যটি হল—

"জনগণতান্ত্রিক পাল রাজাদের পতনের পর সেন রাজত্বকাল থেকেই বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্মের আগমন ঘটলেও পূর্ববুদ্ধ কাশ্যপ মুনির বংশধর রাজা সুদাস, রাজা প্রসেনজিৎ এবং সম্রাট অশোকের যেহেতু পাল রাজত্বকালের পূর্বেই বঙ্গের

বাইরে..... বঙ্গদেশের নমঃ বা চণ্ডালেরা পাল রাজত্বকাল পর্যন্ত কোনদিনই বৈদিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। .....। সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে সরাসরিই তাদের কোন ধর্মীয় অধিকার নেই। তাই তারা পতিত।''[২৪]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আজও নমঃজাতির মানুষ বল্লালসেনের কৃতকর্মকে ভালোভাবে মেনে নেয় নি। একথা কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে নমঃশূদ্র ভৈরব মণ্ডলের ঘৃণার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। ভৈরব বল্লালসেনের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করে বলে—''বল্লাল হামরাদের জাত মারি রাখি গিইছে। হামরা তো জাত মরা ছিলাম না। বল্লাল হামরাদের সাথ আটবা পারছিলম না, তাই জাতে মারে।''[২৫] এছাড়াও আরও অনেক ঐতিহাসিক নমঃজাতির কিছু কথা লিখলেও সঠিক সন্ধান করার এখনও অবকাশ রয়ে যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বাংলার ইতিহাস' ও রমাপ্রসাদচন্দ্রের 'গৌড়মালা' থেকে জানা যানা যায় যে, এখনকার নমঃশূদ্রদের ১৮৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে চণ্ডাল নামকরণের পূর্বে তারা শুধুমাত্র নমঃজাতি নামে পরিচিত ছিলেন, যদিও চণ্ডাল নামে তখনও তাদের ঘৃর্ণিত করা হোত। আলোচ্য নমঃজাতির অতীত ইতিহাস থেকে একথা বলা যায় অতীতে তো বটেই বর্তমানে নমঃজাতি একটি সুবৃহৎ গোষ্ঠীর অধিকারী।

মতুয়া ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :

হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। এই ঊনবিংশ শতককে নবজাগরণ কাল বলা হয়। কেননা, বাংলা সাহিত্যে নব ভাবনার দ্বারা যুক্তির দ্বারা নব আলোক প্রাপ্ত হতে লাগল এই সময় থেকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত করেছিল। বাংলার অচলায়তন ধর্মীয় গোড়ামীর থেকে যুক্তির আলোক ফেলে প্রাচীন ধর্মকে নব ভাবে ভাবনা শুরু হয় এই ঊনবিংশ শতক থেকে। যা ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ঊনবিংশ শতকের সমাজের ধর্মীয় রূপকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে। স্বপন বসু ঊনবিংশ শতকের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার যে বর্ণনা করেছেন তার কয়েক ছত্র তুলে ধরছি ঊনবিংশ শতকের বাংলার

ধর্মীয় অবস্থা বোঝার জন্য—

> ‘‘ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে সনাতন হিন্দু ধর্মের ঘোরতর দুর্দিন। পুঞ্জীভূত অনাচার, গ্লানি, হাজারো বিধি নিষেধে এই সময় প্রচলিত হিন্দু ধর্মের অসহনীয় আকার। ধর্ম মানে তখন লোকাচার, কুসংস্কার, যার সুযোগে অধিকার ভোগীদের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা। অতঃপর যখন নানা দিক থেকে হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ হতে লাগল, তখন সনাতনীরা যুগধর্মের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাচীন সংস্কারকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন।’’[২৬]

শহরাঞ্চল কলকাতার জীবন স্রোতে শিক্ষার আলোক কিছুটা বিচ্ছুরিত হলেও গ্রামাঞ্চলগুলি তখনও ধর্মীয় ভাবনার দ্বারাই চালিত হত। হরিচাঁদ ঠাকুর এই পল্লী বাংলার সন্তান। হরিচাঁদ ঠাকুর তৎকালীন গ্রামীণ সামাজিক জীবনও তৎকালের ধর্মাচরণ সম্পর্কে সর্বভাবে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন প্রত্যক্ষ গোচর হওয়ার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের নমঃ পরিবারে জন্ম হলেও তারা ‘ঠাকুর’ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ধর্মাচরণের জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুর এক বর্ধিষ্ণু নমঃপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুর ও মাতা অন্নপূর্ণা দেবী ছিলেন আদর্শ গৃহী মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় তারা ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে বর্ণিত সে সকল ভক্ত মানুষের বা সমাজ মানুষের পরিচয় পাই তারা সকললেই কোন ভক্তি ভাবনার দ্বারা ভাবিত ছিলেন। কারণ ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বেই চৈতন্যদেব প্রেমধর্মের প্রবর্তন করেন। সেই ভাবধারা যে কত গভীর ছিল তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন সুন্দর ভাবে। কবি বলেছেন—‘‘বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া’’[২৭] এরপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ব করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিকাশ বাঙালি মানসকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তা বাংলা সাহিত্য সম্ভাবের দিকে চোখ ফেরালেই বুঝতে পারি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে প্রেমধর্ম যে ভাবে বিকশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থভাবে বিচার করে বলেছেন—

> ‘‘বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়া ছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দের কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।’’[২৮]

চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে এই সমালোচনা যথার্থই সত্য। এও সত্য যে চৈতন্যদেবই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নব বিস্ময়। কেননা, চৈতন্যদেবের ভাব জীবন ভক্ত সমাজকে যেমন হৃদয় তৃষ্ণা নিবারক প্রেমধর্ম যুগিয়েছিল তেমনি বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছিল অনন্য সাধারণ সাহিত্য সম্ভার। আর বাঙালি সমাজকে দিয়েছিলেন প্রেম। হরিচাঁদ ঠাকুরের পারিবার জীবনও বৈষ্ণব ভাবানুসারী ছিল। সেই পরিবার জীবনের মধ্যেই প্রথম দেখা যাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রের বিকাশ ও কর্মধারার পরিচয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম-কর্মকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল। যথা;

প্রাক্ হরিচাঁদ ঠাকুরের পর্বের সমাজ ধর্মের পরিচয়।
হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক সমাজ ধর্মের পরিচয়।
হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার কার্যাবলীর পরিচয়।

প্রাক্ হরিচাঁদ ঠাকুরের পর্বের সমাজ ধর্মের পরিচয় :

প্রাক্ হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ ধর্মের আলোচনা করবো ‘শ্রীশ্রীহরিলালামৃত’ গ্রন্থের সমাজ ও ধর্মভাবনার যে পরিচয় পাই তারই পরিপ্রেক্ষিতে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের অনেক আগে থেকেই সমাজে ভক্তিভাবের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবার জীবনের মধ্যেও সেই ধর্মভাবনার পরিচয় পাই। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ও অন্নপূর্ণা দেবীর সংসার জীবন ও চালিত হয়েছে ধর্মীয় ভাবাদর্শে। ‘যশোবন্ত ঠাকুরের বৈষ্ণব সেবাও বৈষ্ণবদাসের পুনর্জ্জীবন’ অংশে দেখা যায় বৈষ্ণবসেবা করছেন যশোবন্ত বৈরাগী কিন্তু

পারনা করা হয় নি অতিথি বৈষ্ণবদের। এমন সময় পুকুরের জলে পড়ে যশোবন্ত পুত্র বৈষ্ণবদাস মারা যায়; কিন্তু বালকের এ হেন পরিস্থিতিতেও বৈষ্ণবসেবার ত্রুটি হবে ভেবে পরিস্থিতির চাপা দিয়েছেন যশোবন্ত বৈরাগী। বৈষ্ণবের সুখের ত্রুটির কথা ভেবেই বালকের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও চুপ করে থাকেন। এহেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন যশোবন্ত ঠাকুর। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে অবলম্বন তার পরিচয় গ্রহণ করব—

''যশোবন্ত সদা দেন বৈষ্ণব ভোজন।।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

একাদশী দিনে সব বৈষ্ণব আসিল।

কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি বাসর করিল।।

নামসংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।

সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত বলে হরিবোল।।

বয়স বৈষ্ণব দাস চতুর্থ বৎসর।

একাদশী দিনে গায় আছে কিছুজ্বর।।

পারণা দিবসে হরিবাসর প্রভাতে।

পুকুরের জলে পড়ি মরিল বালক।

এদিকে বৈষ্ণবগণ প্রেমেতে পুলক।।

দেবী অন্নপুণা দেখি কাঁদিয়া উঠিল।

যশোবন্ত এসে মুখ চাপিয়া ধরিল।।

কান্না শুনি বৈষ্ণবের সুখ ভঙ্গ হবে।

না হবে বৈষ্ণব সেবা সব বৃথা যাবে।।

মরেছে বালক যদি এখানে থাকুক।

অগ্রেসব বৈষ্ণবের পারণা হউক।।

মরা পুত্র যশোবন্ত গৃহে রাখে সেরে।

বৈষ্ণবের সঙ্গে গিয়া হরিনাম করে।।

নামসংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।

সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত বলে হরিবল।।

নামসংকীর্ত্তন হইল পারণা হইল।।''[২৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈষ্ণবীয় যে সহিষ্ণুতা তা হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতার মধ্যে প্রগাঢ় রূপেই বর্তমান ছিল। আর তার নৈতিক চরিত্রটিও সর্বত্রই বৈষ্ণানুগত দেখা যায়। আর যশোবন্ত ও অন্নপূর্ণা দেবীর এই মৃত বালককে ঘিরে সকলের মধ্যেই ভক্তিভাব ব্যক্ত হয়েছে। একথাটিও পরিস্ফুট হয় যে মৃত্যুর সময়কালে মানুষ যে কর্ম বা চিন্তা করে দেহত্যাগ করে জন্মান্তর কালে বা পরবর্তী জন্মে মানুষ সেই শেষকালের ক্রিয়া থেকেই নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়। তাই মৃত্যুন্মুখ বা মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষকে 'হরিনাম' শোনানো হয়। আর এখানে ঘটনাচ্ছলে বালক মারা গেছে কীর্ত্তনের সময় তাই বর্ণনা করে যশোবন্ত বলেছে—

''ধন্য রত্নগর্ভা তুমি তোমার উদরে।
এহেন বালক জন্মে আমাদের ঘরে।।
-------- -------- ---
বৈষ্ণব সেবার কালে বালক মরিল।।
হেনভাগ্য কার হয় জনম লইয়া।
বৈষ্ণব সেবায় মরে কীর্ত্তন শুনিয়া।।
বৈষ্ণব হইয়া বরং বাচে পঞ্চদিন।
বৃথা সহস্রেক কল্প হরিভক্তি হীন।।
সকল বৈষ্ণব সেবা হইল স্বচ্ছন্দ।
----------'' [৩০]

যশোবন্ত বৈরাগী পুত্রকে সকল বৈষ্ণবের সেবার পর বাইরে নিয়ে আসেন ও মাথায় রেখে নৃত্য করে হরিনাম করতে থাকলে বৈষ্ণবগণ বুঝতে পারেন বৈরাগীর নন্দন মারা গেছে। এবং মৃত ছেলেকে মাথায় রাখার কারণ জানতে চাইলে যশোবন্ত বলেছিলেন—

বৈষ্ণবের কথা শুনি যশোবন্ত বলে।
মরেছে বালক মম সাধু সেবা কালে।।
সাধুসেবা হরিনাম শুনে শিশু মরে।
পুত্র নয় সাধু বলে রাখিয়াছি শিরে।।

মরেছে বালক তাতে নাহিক বিষাদ।

মম ভয় বৈষ্ণবের সেবা হয় বাদ।।[৩১]

এই যে নৈতিক আদর্শ তা থেকে বোঝা যায় কতটা স্থির ধীর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যশোবন্ত বৈরাগী। বালকের মুখে জল উদ্‌গীরণ হওয়ার ফলে মৃত বালকের জীবন সঞ্চার হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা মাতাই শুধুমাত্র বৈষ্ণব ছিলেন না অনেক আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব তাদের উপস্য হিসেবে পূজিত হয়েছিল। পরিবারের কৃষ্ণভজনের জন্যই 'ঠাকুর' উপাধি হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস থেকে একথা জানা যায়। তা কবির বর্ণনায় নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

"যশোবন্ত সনাতন প্রাণকৃষ্ণ রামমোহন,

রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।

সর্ব্ব জেষ্ঠ্য যশোবন্ত, তার হল পঞ্চ পুত্র,

এ পঞ্চের ঠাকুর আখ্যান।।

এ বংশে জন্মিল যত, শুদ্ধ শান্ত কৃষ্ণভক্ত,

সবে মত্ত হরি গুণগানে।

--------- --- ----------

এ কয় পুরুষ মাঝে মত্ত সাধু সেবা কাজে,

কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।

কেহ বা হল সন্যাসী, কেহ বা বৃন্দাবনবাসী,

তাতে বংশে ঠাকুর উপাধি।।

ঠাকুরের এ বংশেতে, হরিচাঁদ অবনীতে,

করিলেন জন্মগ্রহণ।।"[৩২]

বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় ঊনবিংশ শতকের আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের আগে সমাজের মানুষের পরিচিতি হত। ভক্ত পরিবার বা বৈষ্ণব পরিবার বা ঠাকুর পরিবার নামে। বাড়ির উপাস্যের নামানুসারেই তাদের পরিচয় হত। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবারের ঐতিহ্য যেমন ছিল ধনাঢ্য পরিবার হিসাবে খ্যাত তেমনি ভক্তিগুণেও ছিল উপাধিতে ঠাকুর। এহেন

পারিবারিক পরিচয়ের উত্তাধিকারী হন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের পারিবারিক বংশ পরিচিতির পরিচয় গ্রহণ করে তৎকালীন সমাজ জীবনের আর একটু বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করবো। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বপুরুষদের পারিবারিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের প্রাক্‌কালের সমাজ ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করবো। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব যুগের সমাজ ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই বলতে হয় রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান বা রামকান্ত গোস্বামীর জীবন কথাকে। তাঁর ধর্মাচরণের মধ্যেই গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনও ধর্মজীবনের পরিচয় রয়েছে। রামকান্ত বৈরাগী একজন সাধক সন্যাসী মানুষ। তিনি বিবাহ করেন নি। তার আরাধ্য দেবতা হল কৃষ্ণ বা বাসুদেব। তিনি এই বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন গ্রামে গ্রামে। তিনি বাসুদেবকে নিয়ে ভক্তালয়ে ভ্রমণ করতেন নৌকায়। আর সেই পরমারাধ্য বাসুকে কেন্দ্র করেই রামকান্ত বৈরাগীর জীবন যাপন। এই রামকান্ত বৈরাগী অন্যান্য ভক্তগণের বাড়ির মত যশোবন্তের বাড়িতে আসতেন। একথা রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান থেকেই জানা যায়—

> ‘‘রামকান্ত নামে সাধু মুখ ডোবা গায়।
> বৈরাগী উপাধি তার সাধু অতিশয়।।
> রামকান্ত যশোবন্ত আলয় আসিত।
> স্ত্রী পুরুষ একত্তরে সাধুকে সেবিত।।
> সদা ছিল সে সাধুর উত্তার নয়ন।
> শিব নেত্র প্রায় যেন আরোপ লক্ষণ।।
> কখন কখন সাধু বেড়াইতে যেত।
> কোন কোন ঠাই গিয়া উপস্থিত হত।’’[৩৩]

বাসুদেব ভক্ত রামকান্ত বৈরাগী যশোবন্ত গৃহে যাতায়াত করত সব সময়। একদিন অন্নপূর্ণা দেবীকে রামকান্ত বৈরাগী পুত্র বর দেন। আসলে রামকান্ত বৈরাগীর নিশ্চিত আশ্রয়স্থল ছিল যশোবন্ত অন্নপূর্ণাদেবীর সংসার। কেননা রামরান্ত বৈরাগী একমাত্র তার প্রাণপ্রিয় বাসুকে এই বাড়িতে রেখে অনত্র চলে যেতেন ভ্রমণ করতে। অন্নপূর্ণাদেবী রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেবকে পরম যত্নসহকারে পূজা করতেন। সেই সময় অন্নপূর্ণাদেবীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণদাসকে নিয়ে তাদের সংসার পরবর্তীতে আরও চার সন্তানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় পুত্র

হরিচাঁদ তৃতীয় বৈষ্ণব দাস, চতুর্থ স্বরূপ দাস, পঞ্চম গৌরীদাস এই পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম হয় অন্নপূর্ণার গর্ভে। রামকান্ত বৈরাগী এই পরমা বৈষ্ণবী অন্নপূর্ণার কাছে ভার দিতেন বাসুদেব পূজার। একথা কবির বর্ণনায়—

"রামকান্ত কহে যশোবন্ত বৈরাগীরে।
কিছুদিন বাসুদেবে রাখতব ঘরে।।
ওঢ়াকান্দি মাচ কাঁদি ঘৃত কাঁদি আদি।
বহু গ্রামে ভ্রমিতেন কান্ত গুণনিধি।।
দুই চারিদিন পরে অথবা সপ্তাহে।
মাঝে মাঝে আসিতেন অন্নপূর্ণা গৃহে।।
অন্নপূর্ণা পূজিতেন বাসুদেব জীরে।।"[৩৪]

এহেন ভক্তি মতি মাতাকে রামকান্ত বৈরাগী বরদান করেন এই বলে—

"রামকান্ত বলে মাগো বলি যে তোমারে।
বাসুদেব জন্মিবেন তোমার উদরে।।"[৩৫]

এই যে পুত্রবর দেওয়া অন্নপূর্ণাকে তার সত্যাসত্য বিচার যোগ্যতার পরিপূর্ণ পরিচয় পাই হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শের মধ্যে। এক মহাসাধকের জীবন জনমানসের কল্যাণে ব্রতী হয় এই মহাসত্য থেকে রামকান্ত বৈরাগী ও ব্যতিক্রমী নন। আর তার এই পুত্র বরদানের যে অনন্ত আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল মাতার উপর তার সত্যই যথার্থতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই। হরিচাঁদ ঠাকুর রামকান্ত বৈরাগীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। রামকান্ত বৈরাগী বাসুকে ঘিরে জীবন যাপন করতেন ও যে সময় যা পেতেন তার ভক্তদের কাছে তাই রান্না করে বাসুদেবকে ভোগ দিতেন। আর রামকান্ত বৈরাগী ভক্ত হৃদয়াধারে দেখতেন বাসুদেব খেতেন। এভাবে বাসুদেব সেবা পূজা করতেন রামকান্ত বৈরাগী। কিন্তু এই ভোগ দর্শন করেন গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ রামকান্ত বৈরাগীর যে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার আছে তা বিগ্রগণ জানতেন না। তাদের ধারণায় রামকান্ত বৈরাগীর অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার নেই।

'মতুয়া ধর্ম' সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করতে হলে প্রথমেই হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পরিবার জীবনকে আলোচনা করতে হয়। কেননা তৎকালীন সমাজ জীবন ভাবনা, ধর্মজীবন,

ভাবনা ও শিক্ষা ভাবনা ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক যে জীবন ভাবনা তার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনীমূলক আকর গ্রন্থে। ধর্মভাবনামূলক, সমাজ মানুষের যে পরিচয় পাই তা মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহজীবন পালনের মধ্যেই রয়েছে। তিনি ও তাঁর পরিবার সকলেই গৃহী মানুষ ছিলেন, তার অনুগামী মানুষেরাও গৃহধর্ম পালন করেছেন। তিনি সর্ব প্রথমেই অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সমাজজীবনের মূল মেরুদণ্ড আদর্শ গৃহজীবন যাপন করা। তাই প্রথম থেকেই দেখা যায় চরিত্রাদর্শে হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহধর্মাবলম্বী। যে আদর্শ মানুষকে আত্মচৈতন্য দান করে, মানুষের আত্মজাগরণ ঘটায় এবং মানব জীবনের সর্বসৌন্দর্যের সন্ধান দিয়ে মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটায়, সেই জীবনাচরণই ধর্ম নামে কথিত হয়।

'শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের জন্ম বিবরণ' অংশ থেকে স্পষ্টভাবে দুটি ধারার বিবরণ পাওয়া যায়। সময়ের বিবর্তন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের জীবনের ধর্মীয় ভাবধারার ও পরিবর্তন হয়েছে। আর একথাও অনিবার্য ভাবে সত্য যে শিক্ষা বলতে মূলত ছিল ধর্ম শিক্ষা। মানুষ বাল্যকালে গুরু গৃহকেই শিক্ষা লাভ করত বা গুরুদেব যোগ্য শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন যা মানুষের জীবনের উপযোগী এভাবেই মানুষ ধর্মচারণ শিক্ষা লাভ করে গৃহধর্ম তথা তার জীবন অতিবাহিত করত। আর শিক্ষা গ্রন্থ হিসাবে ধর্ম সাহিত্যগুলিই হল গ্রন্থ। আর এই প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা হলেও গ্রামাঞ্চলগুলি ছিল সেই চিরপ্রাচীন প্রথার দ্বারাই প্রভাবিত। ঠাকুরের জন্ম হয় যে মানুষের সমাজে তারা হল নমঃজাতির মানুষ। নমঃ জাতির ঐতিহ্য থেকে বোঝা যায় এরা মূলত ধর্মপ্রাণ মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় বা তার পূর্বে সমাজে ছিল কৃষ্ণ ভক্তির প্রাবল্য অপর দিকে ছিল বৌদ্ধ ভাবনা। আর ঐতিহাসিক সত্য থেকেও জানা যায় বৌদ্ধ ধর্মের রাজাদের পরাজয় ঘটলে সেনরাজাগণ হিন্দুধর্ম সংস্কার করেন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন। সমাজ জীবনের মানুষের জীবনে একটি ধর্মাদর্শ ছিল না। ছিল মিশ্র ভাবনা। সেই মিশ্র ভাবনার যে ফলশ্রুতি বা পরিণতি তা আমার আলোচ্য 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের উপর যে ভক্তির শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদিত হয়েছে সে শ্রদ্ধা ভক্তিও ভক্তিতে যে ভগবান এক হন ভিন্নতার পরিবর্তে তারই পরিচয় পাই। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন একজন ভক্তি ভাবাপন্ন সাধক মানুষ। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালীন সমাজের

মানুষ যেভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভক্তি করতেন সেই সকল ভাবনার বিষয়গুলি তার রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সমাজে ভক্তি ভাবনার একটি সামগ্রিক পরিচয়ও পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন তিনি আদি অন্তহীন চিরকল্যাণময় ভগবান রূপে বন্দিত হয়েছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। তিনি এই মানুষ্য জীবন ধারণ করেছেন সকল দুঃখের সকল অসাম্যের সকল অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে মানুষের জীবনকে পূর্ণ সত্তায় জাগরণ ঘটানোর জন্যই। তাই প্রথমেই হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষ রূপে বর্তমান থাকলেও তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি ভগবানের মূর্ত প্রতিক রূপে পূজিত হয়েছেন। তার চরিত্রাদর্শ ভগবানের মানুষ রূপের প্রকাশকেই কবি উপলব্ধি করে গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। কবির সেই ভগবান মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের বর্ণনাটি হল—

''হরিচাঁদ চরিত্র সুধা প্রেমের ভাণ্ডার।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার।।
.....
.....
যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।
.....
সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি।
রামহরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ তাঁর সমিভ্যরে।
.....
নিত্যনন্দ হরি কৃষ্ণ হরি গৌর হরি।
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।।''[৩৬]

কবিরসরাজ তারচন্দ্র সরকার যে হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রকে আমাদের উপহার দিয়েছেন সেই মানুষ রূপী হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভগবানরূপী হরিচাঁদ ঠাকুরের কোন পার্থক্য নেই। কেননা হরিচাঁদ ঠাকুর সত্যিই মানব প্রেমের মূর্ত প্রতীক। মানুষকে আত্মচৈতন্য দান করেছেন যেমন

তেমনি মানুষের যে ব্যক্তিগত দুঃখ দারিদ্র তা থেকে ও উত্তরণের পথ নির্দেশ করেছেন। মানুষের উত্তরণ ঘটেছে তা আজ সর্বভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। আর একটি উদ্ধৃতিতে মানবতাবোধের পরিচয় পাই নিম্নলিখিত বাক্য দুটিতে যা মানুষের জীবনের হিংসা নিন্দা কলহ থেকে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সহায়ক। কবির বর্ণনায়—

যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।

ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।[৩৭]

প্রেমভক্তি অর্থাৎ অহিংসার মাধ্যমে মানুষের জীবনের অগ্রগতিই হল কাম্য। আর ভক্তি মানুষের অন্তরে জন্মাবধি প্রথম থেকেই বিদ্যমান থাকে তারই পূর্ণ বিকাশ। সেখানে কোন জোর বা আরোপ চলে না। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গও মানুষের কাছে হরি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার সকলকে আবার হরি অভিধায় অভিহিত করে অর্থাৎ পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই শেষে বলেছেন—

''হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।''[৩৮]

এই হরিচাঁদ ঠাকুরকে কবিরসরাজ তারক চন্দ্র কথিত 'হরিচাঁদ হরি পূর্ণানন্দহরি'র সমাজ জীবন ও গৃহজীবনাদর্শকে আলোচনা করে দেখব তার ধর্ম ভাবনার মূলাদর্শকে। হরিচাঁদ ঠাকুর যে ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন মানব জাতীর কল্যাণে কবি কথিত সেই ধর্ম হল সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম। কবির বর্ণনায়—

'মানব কুলে আসিয়ে যশোবন্ত সুত হয়ে,

জন্ম নিল সফলা নগরী।

প্রচারিল গূঢ়গম্য, সূক্ষ্ম সনাতন-ধর্ম্ম।

জানাইল এজগত ভরি।''[৩৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্মপ্রচার করেন তা সূক্ষ্ম সনাতনধর্ম। প্রচার করলেন সনাতন ধর্মের গূঢ়ার্থকে। অর্থাৎ মানুষের ধর্মের শাশ্বত কালের যে নিত্য প্রবাহমান ধর্ম সেই সনাতনী প্রথাকেই প্রচার করলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের জীবনের সার্বিক উন্নতিকল্পে নবভাবে গঠন করে নিলেন মানুষের জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ জীবন গঠনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই করেছিলেন তিনি। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার প্রথম যে জন্মগ্রহণের কারণ হিসাবে

উপস্থাপন করেছেন তা সত্যই আশ্চার্যজনক ঘটনা। জীবনের সার্বিক সাফল্যের স্তরে পৌঁছানোর জন্য তিনি যেভাবে ধর্ম সংস্কার করলেন মানুষের প্রয়োজনে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার মূল মন্ত্ররূপে বর্ণনা করেছেন তা হল—

"এ লীলায় হৈল প্রভু যশোবন্ত পুত্র।।
কিসের রসিক ধর্ম্ম কিসের বাউল।
ধর্ম্ম যজে নৈষ্টিকেতে অটল আউল।।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙিঘ এবে করিলেন স্থূল।
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।
মুখে বল হরি হরি হাতে কর কাজ।
হরি বল দিন গেল বলে রসরাজ।।"[৪০]

হরিচাঁদ ঠাকুর নামধর্ম গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'হরিনাম' মানুষের জীবনের মূল আরাধ্য বিষয়কেই গ্রহণ করে সমস্ত প্রচলিত শাস্ত্রীয় নীতিকে লঙঘন করেছেন মানব জীবনের পূর্ণ আদর্শে পৌঁছানোর জন্য। কেননা সেই সমাজে কোন একটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল না। বিভিন্ন ভাবাদর্শ সমাজে প্রচলিত ছিল। আর সেই অনিবার্য গতির যাত্রাপথকে একমুখী করার ও মানুষের জীবনের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যে কার্যটি সম্পন্ন করলেন তা হল এক সাফল্যের জয় যাত্রা। যা আজ পর্যন্ত সমাজে বিরল ঘটনা। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই কর্মধারা তৎকালীন সময়ে অনেক কঠিন হলেও তা সাফল্যের সঙ্গেই করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ের ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অপরিনাম দর্শি ভাবনা বা সমাজের মধ্যে কলুসতার প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। বিনয় ঘোষের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' ও স্বপন বসুর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' থেকে পরিপূর্ণভাবেই অবহিত হওয়া যায়।

এছাড়াও স্বপন বসু তৎকালীন প্রকৃত হিন্দু দলপতিদের চরিত্রকে তুলে ধরেছেন যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় মানুষের জীবন কেমন কলুসতা পূর্ণ ছিল ধর্মাচারণ করা সত্ত্বেও।

স্বপন বসুর অভিমতটিকে আলোচনার সুবিধার্থে গ্রহণ করলাম—

> ‘‘হুতোম কলকাতার অনেক ‘প্রকৃত হিন্দু দলপতির’ আসল রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন; ‘সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু, বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁঢ় আছে। ... , এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে প্রাতঃ স্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীত গোবিন্দও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন-হঠাৎ লোকে মনে করতে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতে প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদায় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন।’’[৪১]

এই যে ধর্ম জীবন যাপন করা মানুষ। এই চরিত্রের মানুষের ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকা নাম দেন ‘বিড়াল ব্রহ্মচারী’। এহেন সামাজিক পরিস্থিতি হল শহর কলকাতায়। তার যে একটুও প্রভাব ছিল না গ্রামাঞ্চলে তা বলাই বাহুল্য। আর এই সামাজিক পরিস্থিতিতেই হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব। এ যেন সমাজের সকল কু-প্রভাবের সময়; সমস্ত প্রকার কলুসতাকে সমূলে উৎপাটন করতেই হয়েছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব। এই হরিচাঁদ ঠাকুর কলকাতার মানুষ নন ঠিকই কিন্তু তিনি শুধু গ্রামের মানুষের জন্য ধর্ম ভাবনার প্রবর্তন করেননি সামগ্রিক মানুষের কল্যাণের যা কিছু প্রয়োজন সেই কর্মাদর্শ সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জাগরণ করেন। আর প্রচলিত সমাজের তিনি কোন একটি দিকের সংস্কার করেন নি। তিনি মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আমূল পরিবর্তন করে নবভাবে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জাগরণ ঘটালেন।

‘শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জন্ম বিবরণ’ অংশ থেকে জানা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজের পতিত মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হন। কবির বর্ণনায় সমাজের মানুষের উদ্ধার করার জন্যই হরিচাঁদ ঠাকুরের আগমন—

> ‘‘বুদ্ধদেব অবতার যে সময় হয়।।
> বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।
> যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।।
> .....

এদেশে থাকে না যেন জাতির বিচার।”[৪২]

হরিচাঁদ ঠাকুর যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সমাজে কৃষ্ণ ভক্তি থাকলেও তা ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে সমাজের উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের আচরণীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল। ধর্ম আচরণ ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে মনুষ্যত্ব বোধের আলোক দান করে সমাজের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হবে এটাই আকাঙ্খিত। কিন্তু রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেব পূজাকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের সৃষ্টি তা মূলত ধর্মাচারণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। রামকান্ত বৈরাগী বাসুদেবকে অন্নভোগ নিবেদন করতেন। তিনি ছিলেন নমঃ জাতির মানুষ। আর আশ্চার্য জনক ভাবে এই নমঃ জাতির সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্থ বর্ণের শেষ বর্ণটির ‘শূদ্র’ শব্দটি নমঃজাতির সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এই বিশাল বৃহৎ আকার জন গোষ্ঠিটিও চতুবর্ণের শেষ বর্ণে পরিণত হয় বর্ণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে। তার নিখুঁত চিত্র রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেব পূজার অন্নভোগ দেওয়ার চিত্রটি থেকে বোঝা যায়। সমাজের উচ্চবর্ণ বলতে যে ব্রাহ্মণকেই বোঝায় তা বোঝা যায়। এক অর্থে যেমন রামকান্ত বৈরাগীর পূজাপোকরণ থেকে সমাজ জীবনে রামকান্ত বৈরাগীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় যেমন পাই আর উচ্চবর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ যেমন বর্ণশ্রেষ্ঠ তেমনি অর্থেও ছিল স্বচ্ছল তার পরিচয় আমরা এই রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান থেকে পাই। ব্রাহ্মণগণ জোর করে বাসুদেবকে নিয়ে গিয়ে আড়ম্বর সহকারে পূজার আয়োজন করেন সেখান থেকেই দুই মানুষ জাতির সামাজিক, আর্থিক পরিচয়টি পাওয়া যায়। ধর্মের নামে কত অসামাজিক তথা অমানবিক ক্রিয়া হত তার পরিচয় দিয়েছেন—কবি রসরাজ তাঁর ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থে। ‘রামকান্ত বৈরাগীর পূর্ব্বাপর প্রস্তাব কথন’ অংশের বর্ণনা থেকে মানুষের মনের সংকীর্ণতার তথা নীচ মানসিকতার চিত্রটিকে যেমন দেখব তেমনি রামকান্ত বৈরাগীর ভক্তির পরিচয় গ্রহণ করব। প্রথমে রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেব ভক্তির পরিচয় নেব। বাসুদেব ভক্তি কথাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন কবিরসরাজ তারক সরকার—

“বাসুদেবে সমর্পিয়া আত্ম স্বার্থ আত্মা।
ব্রজের মাধুর্য্যভাবে করিত মমতা।।
সাধুর সঙ্গেতে ছিল বাসুদেব মূর্ত্তি।
কভু সখ্য ভাব কভু ব্রজভাবে আর্ত্তি।।

ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি আতপ তণ্ডুলে।

পূজিতেন রম্ভা দুর্ব্বা তুলসীর দলে।।

নিবেদিয়া করিতেন ভোজন আরতি।

বাসুদেব খাইতেন দেখিত সমতি।।

মূলা থোড় মোচা কাচা রম্ভার ব্যঞ্জন।

আতপের অন্ন দিত নাদিত লবণ।।

ছোলা ডাল মুগ বুট গোধুম চাপড়ী।

তৈল হরিদ্রা বিনে ঘৃত পক্ক বড়ি।।

ভোগ লাগাইয়া সাধু আরতি করিত।

বাসুদেব খেত তাহা চাক্ষুস দেখিত।।[৪৩]

এভাবে রামকান্ত বৈরাগী প্রতিনিয়ত বাসুদেবের ভোগ দিত ও নিজেই পূজার সমস্ত কাজ করত। এর পরবতীতে দেখা যায় বৈরাগী বাসুদেবকে ভোগ নিবেদন করলে গ্রামবাসী একজন বিপ্র এসে বাসুদেবের পূজা পদ্ধতি দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছে বৈরাগীকে যে বাসুদেবকে অন্ন দিলি শূদ্র হয়ে এটা শাস্ত্রীয় মতে অবিধি। একমাত্র ব্রাহ্মণের অন্নভোগ অধিকার আছে। এই যে অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অন্ন রান্না করে ভোগ রাগ দিলে অকল্যাণ হয়। কিন্তু এই যে অন্ন ভোগ অধিকার, গোত্র হিসাবে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য এইভাবে চারটি গ্রোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মৃত ব্যক্তির শ্রদ্ধা দশ দিনে জ্ঞাপন করা এগুলি সবই কিন্তু সমাজের উচ্চবর্ণ বলে পরিচিত ব্রাহ্মণের আচরণের সঙ্গে মিল হওয়া সত্ত্বেও নমঃজাতির মানুষ ব্রাহ্মণ নয়। এদের অতীত ইতিহাস রয়েছে। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ধর্ম, বিবাহ তথা সকল বিষয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের মিল পরিলক্ষিত হলেও এরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মানুষ নয়। নমঃজাতির মানুষের নিজের ঐতিহ্য সহ এই সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং একথা বলা যায় এই নমঃজাতির মানুষ এখনও অন্নদানের অধিকারী। আর তা রামকান্ত বৈরাগীর মতই এখনও তা ভগবান হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীকে ভক্তিভাবে নিবেদন করে থাকেন। এছাড়াও বলা যায় যে নমঃজাতির অনেক মানুষ কৃষ্ণ ভক্ত আছে তারাও যথাসাধ্যই অন্ন ভোগ দেন শ্রীকৃষ্ণকে। ধর্ম শিক্ষার জ্ঞানালোক মানব জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ না হয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হলে সমাজ জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়। পরবর্তীতে নতুন

ধর্মসংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। যা মতুয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

বিপ্রমহাশয়ের বাসুদেব ভোগদর্শনের পর যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায় তা নিম্নরূপ—

একদিন গ্রামবাসী বিপ্র একজন।
বাসুদেব ভোগরাগ করিল দর্শন।।
ক্রোধ করি বলে বিপ্র এ কোন বিচার।
শূদ্রের কি আছে অন্নভোগ অধিকার।।
শূদ্র হয়ে বাসুদেবে অন্ন দিলি রাধি।
কোথায় শুনিলি বেটা এমত অবিধি।।
হারে রে বৈরাগী তোর এত অকল্যাণ।
শূদ্র হয়ে হবি নাকি ব্রাহ্মণ সমান।।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া ব্রাহ্মণ সকলে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব ক্রোধে উঠে জ্বলে।।
দশজন বিপ্র গেল ব্রাহ্মণের বাড়ি।
ক্রোধ ভরে বাসুদেবে লয়ে এল কাড়ি।।[৪৪]

জোর করে বাসুদেবকে নিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ গৌরবের আত্ম অহংকারে কিন্তু প্রকৃত পূজারী ঐ রামকান্ত বৈরাগী তা তার আত্মাভিমানী অভিমানেই প্রকাশিত হয়। বাসুদেবকে ছেড়ে দিলেন আর বাসুদেবকে বলেন—

''কাঙ্গালের কাছে তুমি ছিলে অনাদরে।
আদরে খাইও এবে যোড়শো পচারে।।
ভাল হল ব্রাহ্মণেরা লইল তোমারে।
সুখেতে থাকিবা এবে খট্টার উপরে।।
দুঃখিত দরিদ্র আমি কপর্দ্দক নাই।
বহুকষ্টে থোড় মোচা তোমারে খাওয়াই।।''[৪৫]

এই বাসুদেবকে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পূজার দ্বারা ভক্ত হয়েছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বাসুদেব পূজার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সামাজিক অর্থনৈতিক যে স্বচ্ছলতা রয়েছে ব্রাহ্মণদের সেটা বোঝা যায়—

ব্রাহ্মণেরা বাসুদেবে লয়ে হরষেতে।

বাসুদেবে অভিষেক করে তন্ত্রমতে।।

কেহ বলে রাখ দেবে প্রতিষ্ঠা করিয়ে।

জাতিনেশে নমঃশূদ্রের পক্ক অন্ন খেয়ে।।

.....

.....

সবদ্বিজ বাসুদেবের ভক্ত হইল।

পূজারি ব্রাহ্মণ এক নিযুক্ত করিল।।

সন্ধ্যাকালে ঘৃত দ্বীপ পঞ্চবাতি জ্বালি।

আরতি করেন সব ব্রাহ্মণ সব বাক্ষণ মণ্ডলী।

.....

এইরূপে বাসুদেব ব্রাহ্মণের পূজ্য।''[৪৬]

এর পরবর্তীতে রামকান্ত বৈরাগী বাসুদেব দর্শনে গিয়ে মণ্ডপের পিছনে থেকে অন্তরে বাসুদেব দর্শন করেছেন। কিন্তু সামনে গিয়ে দেখতে ভয় হয়। কারণ অন্তরে ভীত হয়েও ভক্তের অন্তরের প্রেরণাকে উপেক্ষা করতে পারে নি। এভাবে কিছুদিন পর বাসুদেবজীকে স্নান করানোর জন্য পুকুরে নিয়ে গেলে জলের ভিতর হারিয়ে যায় বাসুদেব। কোন বিপ্রগণ বাসুদেবকে সন্ধান করে পায় না কিন্তু রামকান্ত বৈরাগী স্পল্প সন্ধানেই বাসুকে পানও বিপ্রগণের অনুরোধেই পুনরায় বাসুদেবকে নিয়ে যান আপন আলয়ে। এভাবে অনেক দিন রামকান্ত বৈরাগীর কাছে বাসুদেব থাকার পর রামকান্ত বৈরাগী বৃদ্ধ হন এবং শেষ ইচ্ছা হয় বাসুদেবকে রথে চড়াবেন। রথ নির্মাণ করেন বাঁশ দিয়ে রামকান্ত বৈরাগী শেষ ইচ্ছা পূরণের আগেই বাসুদেবকে আবার নিয়ে যায় বিপ্রগণ। বিপ্রগণের মনে ভয় ছিল রামকান্ত বৈরাগী রথযাত্রা উৎসব করলে বৈরাগীর রথযাত্রা। উৎসবে সকল লোকের সমাগম হবে ও অপরদিকে ব্রাহ্মণদের রথযাত্রা উৎসবে লোক হবে না। এমতাবস্থায় বিপ্রগণের সিদ্ধান্ত হল বাসুদেবকে পুনঃরায় কেড়ে নিয়ে আসার। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন এই বিরোধের চিত্রকে। কবির বর্ণনায়—

''অধিবাস দিনে সব লোক আসে যায়।

লোকের সংঘট হল লোকারণ্য ময়।।

ব্রাহ্মণেরা সবে মিলে করে পরামিশে।

রথযাত্রা না হইতে এত লোক আসে।।

আমাদের রথে কল্য মানুষ হবে না।

বৈরাগীর রথে কল্য লোক ধরিবে না।

ভাল বলি বাসুদেবে দিলাম ফিরায়ে।

.....

আর বার বাসুদেব লয়ে এস কাড়ী।।"[৪৭]

রামকান্ত বৈরাগী পুনরায় অন্তর্বেদনা পান কিন্তু রামকান্ত বৈরাগী রথযাত্রার শেষে রথের তলায় আত্ম বিসর্জন দেন। এই যে হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বে সমাজে ধর্ম আচরণের জন্য মানুষের মধ্যে মতো বিরোধ ছিল। এ থেকে বোঝা যায় ধর্মজীবন সর্ব সাধারণের পালন করা কত দুঃসাধ্য ছিল।

হরিচাঁদ সমসাময়িক সমাজ ধর্মের পরিচয় :

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয় বাংলা ১২১৮ সালে আর ইংরেজি ১৮১২ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। এই সমসাময়িক সময়ে বাংলার যে সমাজ ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলত সমাজ সংস্কারের চিন্তা ভাবনা। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসার ঘটান সমাজে। আর এই সময় ইংরেজ শাসকগণ ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তাদের শিক্ষার বিস্তার ঘটান মূলত তাদের কর্ম উপযোগী করার জন্য। খ্রীষ্টান ধর্মও প্রচার করেন অনেক খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক। এক দিকে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও অন্যদিকে ভারতীয় গোড়া হিন্দুগণ তাদের রক্ষণশীল মনোভাবকে বজায় রাখতে ইংরেজগণের সঙ্গে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হতেন। সমাজের মুখ্য কর্ম স্থান ধর্ম প্রচার, শিক্ষা ব্যবস্থার, অগ্রগতি মূলকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা হয়ে ওঠে জনমুখর। যা কিছু নব ভাব ধারা পাশ্চাত্য থেকে আগমণ ঘটত তা কলকাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। তখন সমাজ জীবনে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল ও সমাজে ধনী শ্রেণির একটি প্রভাব ছিল। জমিদারগণ কখনোই প্রজা কল্যাণ মূলক কাজের থেকে প্রজা পিড়ক হয়ে সমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন। আর এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে

জমিদারদের থেকে তাদের কর্মচারীগণ অধিক অত্যাচার করতেন সমাজের কৃষক প্রজাদের উপর।

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম সময় কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—

> ''শুভ গ্রহ নক্ষত্র শুভ লগ্ন হইল।
> মাহেন্দ্র সুযোগে পুত্র প্রসব করিল।।
> বারশ আঠার সাল শ্রীমহাবারুণী।
> কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি যে ফাল্গুনী।।
> হরিশাল বলিশাল ভক্তগণে গণে।
> নাহিক বৈদিক ক্রিয়া শ্রীবারুণী বিনে।।
> ধন্য অন্নপূর্ণা হেন পুত্র পেল কোলে।।''[৪৮]

হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ সময়টি ত্রয়োদশী তিথি কৃষ্ণপক্ষ শ্রীমহাবারুণী। হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই আশ্চর্য্য ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের এক বর্ধিষ্ণু নমঃ কৃষ্ণভক্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় তিনি জন্মগত পরিচয়ে ঠাকুর পরিবারের সন্তান। বাল্যকালের খেলাচ্ছলে তিনি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। যেমন বালক বন্ধুদের সাথে মিশে সাপ ধরে পদ্মপুরাণ, মনসাভাষাণ গান করতেন। আবার বাল্য খেলার ছলেই মৃতপ্রায় বিশ্বনাথের জীবন রক্ষা করে সকলেরকাছে 'ব্রহ্ম পরৎপর' রূপে চিহ্নিত হন। বালক হরিচাঁদ সকলের কাছে তার কাজ কর্মের দ্বারা 'হরি' রূপে প্রকাশ হলেন। এরপর হরিচাঁদ ঠাকুরকে তাঁর পিতা যশোবন্ত বৈরাগী বিবাহ দেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় কৈশোর কালে পূর্ণ যৌবন কালের আগেই বিবাহ দেন। বোঝা যায় তখন বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

> ''বিবাহ করিল প্রভু কৈশোর সময়।''[৪৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর রামকান্ত বৈরাগীকে শ্রদ্ধা করতেন খুব। রামকান্ত বৈরাগী যখন যশোবন্ত বৈরাগীর বাড়িতে আসতেন ও অন্যান্য অনেক অতিথি ব্রাহ্মণ বর্গের আগমণ ঘটলেও রামকান্ত বৈরাগীকেই হরিচাঁদ ঠাকুর তার মনোনীত কথা বলার জন্য নির্জনে দুজনে গিয়ে বাক্যালাপ করতেন। এছাড়া হরিচাঁদ ঠাকুর চরিত্রের প্রকৃতি ছিল নিরপেক্ষ। মানুষের নিন্দা ভৎর্সনার দ্বারা কোন প্রকার যন্ত্রণার কারণ তিনি হতেন না একথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার স্পষ্ট

ভাষায় ব্যক্ত করছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের অনেক পরে রামকান্ত বৈরাগীর দেহাবসান হয় অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুর রামকান্ত বৈরাগীকে দেখেছিলেন এবং তার ধর্মাদর্শকেও সঠিক ভাবে জানার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটিকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটি যথার্থই 'মানুষ শ্রীহরি' রূপে প্রকাশিত হয়েছে—

"ঠাকুরের জন্ম অগ্রে পরে যে সময়।
রামকান্ত আসিতেন মোহান্ত আলয়।।
বৈরাগী ব্রাহ্মণ আদি অতিথি আসিত।
কারুণা কহিত প্রভু নিজ মনোনীত।।
নিন্দা কি বন্দনা কারু কিছু না করিত।
রামকান্ত এলে গিয়া পদে লোটাইত।।
কিছু অন্তরেতে রামকান্তে লয়ে যেত।
দুই প্রভু একাসনে নির্জ্জনে বসিত।।
রামকান্তে বলিতেন তুমি মম গুরু।
যুগে যুগে তুমি মোর বাঞ্চা কল্পতরু।।
.....
কথোপকথনে কাটাতেন দিবা রাতি।।"[৫০]

হরিচাঁদ ঠাকুর ভগবান আদি শ্রীহরি রূপেই বন্দিত হয়েছেন। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের সহধর্মীণি শান্তি ও সেই ভগবান সহচরী রূপেই সকলের মাতা রূপে বন্দিত হয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই হরিচাঁদ পূর্ব ধর্ম ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। রামকান্ত বৈরাগীর নিজস্ব ধর্মাচারণ সম্পর্কে বাধার সম্মুখিন করে তাঁকে অপমানিত করেছেন নয় মানুষ জাতির প্রতিনিধির প্রতি যেন তাদের অবমাননা বর্ষিত হয়েছে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করলেই তাঁর মানুষের কল্যাণের উন্নতির জন্য যে ভাবনা পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রচার করেছেন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে। হরিচাঁদ ঠাকুর বিবাহ করেন শান্তিদেবীকে। শান্তিদেবীর পরিচয় সম্পর্কে 'শ্রীশ্রীহরিচলীলামৃত' গ্রন্থের থেকে জানা যায়—

"জিকাবাড়ী নিবাসী লোচন প্রামাণিক।

একমাত্র কন্যা ভালোবাসে প্রাণাধিক।।

.....

.....

বাল্যকালে যখনেতে করিতেন খেলা।

বালিকাগণের সঙ্গে করিতেন খেলা।।

আয়গো ভগিনী মোরা খেলিব সকলে।

সর্ব্ব মঙ্গলার পূজা করি সবে মিলে।।"[৫১]

শান্তিদেবীর সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের বিবাহ দিলে তাঁদের জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে পারবে একথা লোচন প্রামাণিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুনেছিলেন যে হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্য খেলার সময় বিশাকে বাঁচান। তাই এই ছেলে যে সামান্য হবে না এটাই তার ধারণা। তাই লোচন প্রামাণিকের কথায় স্পষ্ট বোঝা যায়—

"হরির সঙ্গেতে দিলে শান্তির বিবাহ।

ইহকাল পরকাল হইবে নির্ব্বাহ।।

লোচন সাফলা ডাঙ্গা আসিয়া আসিয়া।

যশোবন্তে কথা কয় হাসিয়া হাসিয়া।।

তোমার মধ্যম পুত্র আমি তাঁরে চাই।।

কন্যা দিয়া আমি তাঁরে করিব জামাই।।

শুনি যশোবন্ত বড় হল আনন্দিত।

বলে এই কর্ম কর যে হয় উচিত।।

আসা যাওয়া দেখা শুনা হল রীতি মতে।

কন্যা দান করিলেন শুভ সুলগ্নেতে।।"[৫২]

এভাবে যশোবন্ত বৈরাগী পাঁচ ছেলের বিবাহ দেন ও নিজে সংসার থেকে সম্পূর্ণ তরে বিশ্রাম নেন। হরিচাঁদ ঠাকুর বড় ভাই কৃষ্ণদাস ঠাকুর উপর সংসার ভার অর্পণ করে নিজে তার সহচরদের সঙ্গে বেড়াতেন। এমন সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের জমিদার সূর্যমণি মজুমদারের জমিদারী রক্ষা করেন কৃষ্ণদাস ঠাকুর সাতশত টাকার বিনিময়ে। জমিদার মহাশয়ের উপকার

করেন কিন্তু শেষে কর্জ শোধ দিতে অস্বীকার করেন জমিদারের গোমস্তা এবং বিরোধের সূচনা হয় জমিদার ও প্রজার মধ্যে। জমিদার কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বিষয় সম্পত্তি অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন করে নেন। কৃষ্ণদাস ঠাকুরের পরিবার তাদের মাতুল বংশের আশ্রয়ে থাকেন ওড়াকান্দি। এর আগে প্রথমে কিছুদিন রামদিয়া সেনদেন বাড়িতে থাকেন। পরবর্তীতে ওড়াকান্দিতেই হরিচাঁদ ঠাকুর তার কর্মাদর্শের পূর্ণ প্রকাশ করেন। কবির বর্ণনায়—

''কতদিন পরে সেই রাম দিয়া ছাড়ি।
থাকিলেন ভজরাম চৌধুরীর বাড়ি।।
চৌধুরীর বাসা বাড়ী ওড়াকাঁদি গ্রাম।।''[৫৩]

এরপর যখন ওড়াকাঁন্দি কৃষ্ণদাস ঠাকুর সহ সকল ভ্রাতা একসঙ্গে বাস করছিলেন সেই সময় জমিদার তার পূর্বের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাদের পূর্ববাস স্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও তারা আর ফিরে গেলেন না পূর্ব ভিটায়। কবির ভাষায়—

''স্থান ত্যাগী ওড়াকাঁন্দি আছে পঞ্চভাই।
জমিদারে লুঠে নিল বিত্ত কিছু নাই।।
পাব্বর্তীচরণ বাবু ওড়াকাঁন্দি গিয়া।
প্রভুদের বলিলেন বিনয় করিয়া।।
বহুস্তুতি মিনতি করিল বারেবার।
সফলা নগরে যেতে করি পরিহার।।
কৃষ্ণদাস বলে শুন শুন মহাশয়।
আর না হইব প্রজা তোমার ভিটায়।।''[৫৪]

এই সময় তারা পঞ্চভাই ওড়াকাঁন্দি স্থায়ী ভাবে আবার বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁদের পরিবার তখনও ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ওড়াকাঁন্দি বাসকালে পঞ্চভাই পৃথক অন্ন হলেন। তাদের পৃথক হওয়ার সময় বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যবসা করে ছিলেন এবং সেই অর্থকে সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেন। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের মামাত পিস্তাত দশ ভ্রাতার মিলন হয় এবং এরা সকলেই এক আত্মা এক প্রাণ ছিল।

''এক আত্মা এক প্রাণ তুল্য দশ ভাই।
পিস্তাত মামাত ভ্রাতা ভিন্ন ভেদ নাই।।

বৈষ্ণবের শিরোমণি ছিল ভজরাম।

প্রভুদের সঙ্গে সদা করে হরিনাম।।

হরি কথা কৃষ্ণকথা হয়ে একত্তর।

কোন কোন দিন নিশি অইভাবে ভোর।।

.....

তথা আসি পারিষদগণের মিলন।

রাত্রি দিবা করিতেন হরিসংকীর্ত্তন।''[৫৫]

বাল্যকালের অসাধারণ জ্ঞানালোকের অধিকারী বালক পূর্ণ যৌবনে এসে তার প্রকৃত সহদরদের সাহচর্য ও ভ্রাতৃবোধের বন্ধনে মানবত্বের পূর্ণ জ্ঞানে বিকশিত হতে সক্ষম হয়েছেন। সকলকে ধর্ম জাগরণের দ্বারা জাগরিত করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার কার্যাবলীর পরিচয় :

হরিচাঁদ ঠাকুরকে পতিপাবন বলা হয়। আর ঠাকুরের বন্দনা অংশেও বার বার এই হরিচাঁদ পতিত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে।

''পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।''[৫৬]

'পতিত' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল—'দুদর্শাপ্রাপ্ত', জাতি। 'পাবন' শব্দটির অর্থ—'পাপীদের ত্রাণ কর্তা 'পতিত পাবন হরি'।

ড. নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ব্রাত্য বা পতিত শব্দটিকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে 'পতিত' মানুষ সম্পর্কে সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। 'পতিত' শব্দটিকে মানব জাতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন মানুষ। কেন 'পতিত' শব্দটি তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

''...এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন তবে এই ধরণের ধর্মোৎসব যে প্রাক্ বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই যে সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই। আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা 'পতিত' তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত

হইয়াছেন এবং সেই জন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন? বোধ হয় তাহাই।"[৫৭]

আমার আলোচনা বা গবেষণা কাজের বিষয়টি মূলত মানুষের সমাজের আত্ম জাগৃতি, আত্ম উন্নতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষার সার্বিক উন্নতির চর্চার জায়গা। কিন্তু উন্নতির কার্যকর্তা হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেন সেই মানুষ জাতিগত পরিচয় নমঃ জাতির মানুষ। একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ থেকে মানুষ জাতিকে বিভাজন করেন বৃহদ্ধর্ম পুরাণ রচনাকার। এ সম্পর্কে ড. নিহাররঞ্জন রায় জানাচ্ছেন—

"বৃহদ্ধর্ম পুরাণ একটি উপপুরাণ; ইহার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক; তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাঢ়দেশে ইহা রচিত হইয়াছিল এমন অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদ দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত এ বিভক্ত ছিল, তাহার একটু পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।"[৫৮]

নমঃশূদ্র জনজাতির নরতাত্ত্বিক পরিচয় গ্রহণ করেছেন হাটন ও রিজলি। নমঃশূদ্র জনজাতি যে অসংখ্য জনসাধারণ আদি মধ্য ও বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ জাতি। বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে নরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে প্রথমেই নমঃশূদ্রদের কথা বলেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁদের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন জাত সংঘর্ষের কারণে তাদের জাতিগত পরিচয় এতটা নিম্নবর্ণের অধিকারী হয়েছে।

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে নমঃজাতির ইতিহাস রয়েছে। তাদের অতীত ইতিহাস এখনো অনালোকিত রয়েছে। তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। নমঃজাতির অতীত ইতিহাস প্রথমেই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছি আমার গবেষণা কাজের সুবিধার প্রয়োজনে। নমঃজাতির যে নানা সময়ে উত্থান পতন ঘটেছে সেই নমঃজাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হরিচাঁদ ঠাকুর মানব জাতির কল্যাণে উন্নত যে যে কার্যাবলীর পরিচয় দিয়েছেন ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে জন্মগ্রহণ করে সেই কর্ম প্রণালীকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব।

হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন একাধারে মানুষ ও ভগবানের মূর্তপ্রতীক। তাই তিনি বন্দিত

হয়েছেন ভগবান রূপেও মানুষ রূপে। তার মানুষের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই যে মানুষের জীবনকে উৎকৃষ্ট ধর্মদর্শ ও কর্মাদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা আলোচনার মধ্যেই বোঝা যায়। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিচরণ পাগল যে বর্ণনা করেছেন যেখান থেকেও বোঝা যায় তিনি অনাদীর আদি ভগবান শ্রীহরিই মানবাকারে ভক্তের সমস্ত দুঃখ মোচনের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। বিচরণ পাগলের বর্ণনাটি হল—

''জয় জয় হরিচাঁদ ক্ষীরোদ বিহারী।
অনাদীর আদি প্রভু পূর্ণত্তম হরি।।
হৃদয় আকাশে প্রভু তুমি পূর্ণচাঁদ।
আইলেন খুচাইতে ভক্তের বিষাদ।।
তোমার মহিমা গুণ বলিতে কে পারে।
এমন শক্তি কার আছে ধরা পরে।।
.....
তোমার তুলনা তুমি ওহে দয়াময়।
মহিমা প্রকাশ হেতু হইলে উদয়।।''[৫৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর তৎকালীন মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ধর্মকে আশ্রয় করে সমাজের কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। ঊনবিংশ শতক একটি বহু আলোচিত সময় কাল। এই সময়ের মানুষকে আত্ম জাগরিত, আত্মচেতনা দান করারও আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্মকে অবলম্বন করেন তিনি। মানুষের সকল দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ভগবানই একমাত্র আশ্রয়। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই উনিশ শতকে একক মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রথমেই প্রচলিত সব ধর্মাদর্শের কুসংস্কারকে বাদ দিয়েছেন। একমাত্র 'হরিনাম'কে গ্রহণ করলেন। প্রচলিত সকল ধর্মমতের সারকথাকে সর্বদর্শীর মত গ্রহণ করলেন। একথা তারকচন্দ্র সরকার সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর প্রচলিত সকল ধর্মাচারণের নীতিকে বাদ দিয়েছেন। তৎকালীন মানব সমাজ হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ কর্মাদর্শকে গ্রহণ করার একমাত্র কারণ হল তিনি মানুষের প্রতি সর্বদাই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। মানুষের সার্বিক কল্যাণে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।

জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।

এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।

জনম লাভলা যশোবন্তের গৃহেতে।।"[৬০]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজ জ্ঞানালোকের গভীর প্রজ্ঞার দ্বারা এই সর্ব ধর্মাচারকে লঙঘনের স্পর্ধা দেখালেন ও সর্বভাবেই সাফল্য লাভ করলেন। আর তিনি গ্রামীণ মানুষ হওয়ার জন্যই হত দরিদ্র দুঃখী মানুষগুলির গভীর ধর্মানুভূতিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ফলে মানুষকে শোষণ মুক্ত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সার্বিক ভাবে কাজ করলেন। যেমন— প্রথমেই তিনি মানুষের চরিত্রাদর্শের উপর জোর দিলেন। মানুষকে ধর্মাচারণের জন্য গৃহ ধর্ম ত্যাগ করতে হবে না। গৃহধর্মকে রক্ষা করেই ধর্ম পালন করার নির্দেশ দেন। তিনি ভক্তির দ্বারা মানুষকে সার্বিক মুক্তির পথ দিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যগুলির মধ্যে। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মানুষের মুক্তির চরমাদর্শ ভাবনার প্রতীক হল হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি তীর্থভ্রমণকে বাদ দিতে বললেন মানুষকে। কেননা তীর্থ করলেই মানুষের মনের শান্তির পূর্ণতা পাওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অনেক দিন গৃহে থেকে দূরে অবস্থান করার জন্য পারিবারিক মানুষের শান্তি বিনষ্ট হয়। সাধন ভজনের এতদিনের যে মূল উদ্দেশ্য তা হল মানুষের জীবনে সুখের সন্ধান পাওয়া। মানুষ বাস্তব জীবনে জীবন ধারণের সময় কালের মধ্যে ভগবানের সানিধ্য লাভ করতে না পারলেও পরপার অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবানের সানিধ্য লাভের আশায় ধর্ম কর্ম করেছে মানুষ শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই ধর্মীয় শাস্ত্রীয় বিধানকে অস্বীকার করলেন মানুষের কল্যাণে। একমাত্র 'হরিনাম' 'হরিবল' মহানামকে গ্রহণ করলেন মানবদেহ ধারী মানবাত্মার কল্যাণে। হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরিনাম'কেই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করে মানুষের চরিত্রকে এই নীতির দ্বারা চালিত করলেন—

"বিরাগ বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আচরণ।

রাগ ভক্তি দিয়া মাতাইল সর্ব্বজন।।

গৃহে থাকি প্রেম ভক্তি সেই হয় শ্রেষ্ঠ।

অনুরাগ বিরাগেতে প্রেম ইষ্ট নিষ্ঠ।।

.....

গৃহ ধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।

বাণপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।

.....

যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।

সত্য বাক্য সম কক্ষ হইতে না পারে।।"[৬১]

মানুষের ধর্ম জীবনের যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তা হল ইন্দ্রিয় বশ। মানুষ সদা সর্বদা 'কামক্রোধ' ইত্যাদি ষড় ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হয়। যার পরিণতি মোটেই সুখ কর হয় না সেই ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারলে মানুষ মহামানব সত্তায় পরিণত হয় সেই মহামানব হতে গেলে কোন তীর্থ দরশন বা কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না সেই কথাই ব্যক্ত করেন হরিচাঁদ ঠাকুর—

"দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।

তীর্থে গেলে ফল প্রাপ্তি না হইবে তার।।

দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।

তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।।

গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।

সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।"[৬২]

গৃহধর্মকে সঠিকভাবে রক্ষা করেই মহাসাধু হওয়া যায়। তার জন্য গৃহধর্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির মূল হল মাতা পিতা সেই পিতা মাতার পরিচর্যা ও সন্তানের প্রথম পালনীয় কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। ধর্মাচরণ করতে গেলে কোন শিক্ষকের সন্ধান করে সেই শিক্ষকের দর্শিত পথে মানুষ তার জীবনাদর্শকে পরিচালিত করলে ভগবানের অনুভূতি লাভ করতে পারে। অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনেও লাফল্য লাভ মানুষের একান্ত আবশ্যক হওয়ায় হরিচাঁদ ঠাকুর রূপী মহাশিক্ষক উনিশ শতকের মানুষকে শুধু আত্ম উপলব্ধির পথের সন্ধান দেননি তিনি মানুষের জীবন, মানুষের শরীর, সমাজ জীবনের সার্বিক মঙ্গলময়কর্ম করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর রূপী মহাশিক্ষক কৃষিকাজ করছেন। অর্থাৎ তিনি যে কৃষক পরিবারের

উত্তরসূরী তাঁর যেমন পরিচয় বহন করলেন তেমনি তিনি ছিলেন আত্মিক উন্নতির একনিষ্ঠ কারিগর। তাই তিনি খাদ্য শষ্য ধান চাষচ্ছলে যে কথাগুলি বলছেন সেই কথায় রয়েছে ধর্মাদর্শের গূঢ় অর্থ। মানুষের সত্যিকারের কর্ম চেষ্টার দ্বারা কখনোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে না। তার দ্বারা জগতের মহামূল্যবান কর্ম সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। মানুষগুলির যে সর্ব সৌন্দর্যময় মানুষের মন সেই মানব মন মানুষের হীনমন্যতা বোধের দ্বারা পতিত হয়ে আছে। যা থেকে আত্মশক্তি সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হয়েছে। তাই তিনি পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করছেন যেমন তেমনি মানুষের মনের পতিতবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবেই মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন—

"যশোবন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।
এবার করিব যত পতিত আবাদ।।
এদেশে আবাদী তোরা চিনিলি না কেহ।
মাটি যে অফলা থাকে এ বড় সন্দেহ।।
পতিত আবাদ জন্য আসা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে।।
খাটি মাটি হলে ফল না হয় বিফল।
ভক্তি ভরে ডাকে তারে দেই প্রেম ফল।।
যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
.....
সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।"[৬৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের মনকে পতিতাবস্থা থেকে মুক্ত করতে প্রথমে 'হরিনাম' বীজ বপণ করেন। পরে সেই চরিত্র মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠার রূপ চরিত্রাদর্শকে রোপণ করে মানুষের পতিতাবস্থার সার্বিক মুক্তি দিলেন। তাই তিনি 'পতিত পাবন হেতু হইল অবতার' বন্দিত প্রার্থনার যোগ্য মানুষ। একদিকে অর্থনৈতিক দিককে ফুলে ফলে সাফল্য মণ্ডিত করার বাসনায় কৃষিকাজ করলেন। অপরদিকে আত্মিক শক্তির বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'ঠাকুর' রত্ব প্রকাশ পায় সফলাডাঙা বসবাস কালের সময় থেকেই।

একথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ হল হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল জীবনী সাহিত্য। সেখানের বর্ণনাটি হল—

''সফলানগরী প্রভু যবে কৈল বাস
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরত্ব হইল প্রকাশ।''[৬৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে আগে 'নিষ্কাম বা আত্মসমর্পণ' করেছেন গৃহে থেকেই। তারপর তিনি সকলের মঙ্গল কর্মে র্সবতো ভাবেই আত্ম নিয়োগ করেন। আত্ম স্বার্থকে অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থে আর তিনি কোন কর্ম না করে সমাজ মানুষের কল্যাণ কর্মে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত হলেন। পবিত্র চরিত্র ও নামে রুচি রেখে সামগ্রীক সমাজকে কল্যাণ ভাবনার দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে মানুষকে নবমানবতা বোধের মহাজাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে লাগলেন। কবির বর্ণনায় তাই ব্যক্ত হয়েছে—

''এই মত ঠাকুরালী হইল প্রকাশ।
পরে এসে ওড়াকাঁদি করিলেন বাস।।
.....
ঠাকুরের পুত্র কন্যা কিছু না জন্মিতে।
অলৌকিক লীলা সব করেন ক্রমেতে।।
.....
আত্মস্বার্থ কর্ম্মত্যাগী নিষ্কাম নিয়ম।।
.....
পবিত্র চরিত্র নামে রুচি রাখিলাম।।''[৬৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই সকলের থেকে ব্যক্তিগত চরিত্র গৌরবে ছিল উন্নত ভাবনার অধিকারী। পরে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সেই বোধি বা বুদ্ধি মত্তার পরিচয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রাদর্শ ও কর্মাদর্শের এক মহাসম্মিলনের ফলে তার সমাজের কল্যাণ ভাবনা এক সর্ব্বচ্চো ভাবনায় পরিণত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজে ধর্ম ভাবনার দ্বারাই ভাবিত হন এবং সেই ভাবাদর্শের মানুষগুলির সঙ্গেই ছিল নিত্য নৈমিত্তিক হরি সংকীর্ত্তন, হরিবাসর। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের মানুষের ক্রমে ক্রমে বিস্তার ঘটে। হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রথম ভগবান রূপের প্রকাশ ঘটে রাউৎখামার গ্রামে। এই গ্রামেই প্রথম হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রভুত্বের প্রকাশ হয়। সেকথা জানা

যায় তারকচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বর্ণনা থেকে—

"আত্মা সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হলেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ।।
শ্রীবংশীবদন আর শ্রীরাম সুন্দর।
বাসীরাম কাশীরাম শ্রীরামকিশোর।।
বালাদের বাড়ী দিন দুদিন থাকিল।
বালারা সগণ সহ মাতিয়া উঠিল।।
ভক্তগণ সঙ্গে করি হরি প্রেম রসে।
নাম গান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে।।
দেশ ভরি শব্দ হল মধুর মধুর।
যশোবন্ত ছেলে হরি হয়েছে ঠাকুর।।"[৬৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মানুষকে জীবনে উন্নত করার জন্য ভাবনা কার্যাবলীর পরিচয় আজও পাওয়া যায়। তাঁর কাজে সত্যিই সেকালে তো বটেই একালেও আশ্চর্য হতে হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের মনের সর্বাঙ্গীন মোহ মুক্তির জন্য নামের উপর গুরুত্ব দেন। আর মানুষের জীবন যে মহামূল্যবান সেই মানুষের শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর সুস্বাস্থের জন্য তিনি নিজেই চিকিৎসকের কাজ শুরু করেন। সত্যিই তিনি মানুষের ভাবনার জন্য ভগবান ছাড়া আর কোন উপাধীতে ভূষিত হলে সত্যিই তার পূর্ণতা হত না। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে হরিভক্তের তথা সামগ্রিক ভাবে বলা যায় ঈশ্বর সন্ধানী ভক্ত মানুষের যেমন তিনি ভগবান তেমনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ এবং অর্থনৈতিক ভাবে যারা দুঃখের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন তাদের জন্যও তিনি ছিলেন সমান ভাবেই ভগবান। তিনি অসুস্থ মানুষগুলির একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাদের যে শুধু তিনি শারীরিক ব্যধিকে সারিয়ে তুলেই শান্ত হতেন তা নয় তিনি তাদের ভক্তি জ্ঞানের আলোক দান করে সমাজের পূজ্য মানুষের পরিণত হওয়ার সমস্ত কর্মগুলিই করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর এই মানুষগুলির প্রেমভক্তিতেই ছিলেন পূর্ণ। তাদের জীবনের সেরা ভক্তিই অর্পণ করতেন হরিতে বা হরিচাঁদ ঠাকুরকে। কীভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজ মানুষের চিকিৎসা করতেন তার পরিচয় পাই আমরা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের মধ্যে। এছাড়া একথা বলা বোধ হয় অনাবশ্যক হবে না যে হরিচাঁদ ঠাকুর পরবর্তীও তৎকালীন

সময়ে অনেক সাধুগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের নামের দ্বারা এবং কোন পথ্য দানের দ্বারা মানুষের অনেক শারীরিক ব্যধির থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। আজকের বিজ্ঞানের দ্বারা ঔষধ চিকিৎসার উন্নতির অনেক আগেই হরিচাঁদ ঠাকুর ও পার্ষদগণও গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অনেক ভক্ত সাধুগণ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে মানুষকে ব্যধিমুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দান করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের যে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিচয় পাই তা হল—

''রোগযুক্ত লোক যত প্রভু স্থানে যায়।
কীর্ত্তনের ধূলা অঙ্গে মাখিবারে কয়।।
অমনি সারিয়া ব্যধি করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বা লোটায় ধরে প্রভুর চরণ।।
কেহ কেহ মনে মনে করেন মানসা।
ব্যধি মুক্তি হোক মোর পূর্ণ হোক আশা।।
হরি লুঠ দিব এনে শ্রীহরির স্থানে।
কেহ কেহ মুদ্রাদিব মনে মনে মানে।।
কীর্ত্তনে আসিয়া কেহ গায় মাখে ধূলি।
রোগ মুক্ত হয়ে নাচে দুই বাহু তুলি।।
.....
কখন কখন প্রভু নিশ্চিন্ত থাকয়।
কোন ব্যধিযুক্ত লোক এমন সময়।।
রোগীরা মানসা সব করিত হরিষে।
আরোগ্য হইলে ব্যধি দাস হব এসে।।
কেহ বা কহিত দাস হইনু এখনে।
মনঃপ্রাণ দেহ সপিলাম শ্রীচরণে।।
দেহের এ রোগ মম হউক আরোগ্য।
অর্থ কিছু তাম্র মুদ্রা দিয়া যাব শিঘ্র
.....
কেহ বা যাইত মনে মানসা করিয়া।

আরোগ্য হইলে ব্যধি দিতেন আনিয়া।।

প্রভুর মুখের বাক্যে রোগ মুক্ত হয়।

এই মত রোগী কত আসে আর যায়।।

পাঁচ সাত গ্রামে ক্রমে শব্দ হল ভারি।

কত লোক আসিত দেখিব বলে হরি।।"[৬৭]

এভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষ সংসার জীবনের মধ্যেই সুখের সন্ধান করেন। সেই সংসার জীবনের মধ্যেই সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা করান হরিচাঁদ ঠাকুর। রোগের আরোগ্য করেন নিজে হরিচাঁদ ঠাকুর কখনো রোগের ব্যবস্থা দানের মাধ্যমে আবার কখনো নিজেই ব্যবস্থা করে সুস্থ করেন। আবার ঠাকুর অনেক সাধকগণকে রোগারোগ্যের চিকিৎসা করার জন্য বলে দিতেন। কারণ অনেক দূর থেকে মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে পৌঁছাতে সময়ের দরকার আবার কষ্টের ও কারণ তাই অনেক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয় সাধুগণকে বলতেন আমাকে চিন্তার মধ্যেই তুই রোগের আরোগ্যের ব্যবস্থা করে সুস্থ করিস। এভাবেও অনেক মানুষ চিকিৎসায় সুস্থ হলে পরে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্ম সমর্পণ করত। রোগের ব্যবস্থা দিতেন হরিচাঁদ ঠাকুর যেভাবে তাকে তারকচন্দ্র সরকার নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

"লোক আসে প্রভু স্থানে হয়ে রোগ যুক্ত।

সংকীর্ত্তনে গড়ি দিলে রোগ হয় মুক্ত।।

রোগ জানাইয়া সব বলিত কাতরে।

রোগ মুক্ত হত প্রভু দিলে আজ্ঞা করে।।

প্রভু বলিতেন যদি রোগ মুক্তি চাও।

যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া যাও।।

তিন সন্ধ্যা ধুলি মাখ কীর্ত্তনের খোলা।

জ্বর হলে পথ্য দেন তেতুলের গোলা।।

বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে।

তেতুল গুলিয়া খায় পিতলের পাত্রে।।

মহারোগে অঙ্গে মাখো গোময় গোমূত্র।।

কেহ বা আরোগ্য পায় প্রভু আজ্ঞা মাত্র।।

রোগ জানাইয়া যায় মানসা করিয়ে।

মানসিক টাকা দেয় রোগ মুক্ত হয়ে।।

মানসা করিত লোকে যার যেই শক্তি।

একান্ত মনেতে যার যেই রূপ ভাক্তি।।''[৬৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে ড. সুকুমার হালদার 'হরিচাঁদ ঠাকুরের বিজ্ঞান চেতনা' নামক প্রবন্ধে ঠাকুরের চিকিৎসার পথ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

''রোগ মুক্তির জন্য ঠাকুর বলেছেন—

''... যদি রোগ মুক্তি চাও।

যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া যাও।''

ঠাকুরের এই মহান বাণী রোগ আরোগ্য জন্য, যা খুঁজে পাওয়া যায় একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে। যে চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ জগতে হোমিওপ্যাথি নামে সুপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই হোমিও প্যাথির স্রষ্টা মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বলেছেন কোনও রোগীর অস্বাভাবিক লক্ষণ সমূহ ও অনুভূতি সমূহের সদৃশ্য লক্ষণ সমূহ উৎপাদন করতে সক্ষম এমন কোন ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ্য চিকিৎসা বিধান বলা হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতি 'similia similibus curentur' এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রোগ সৃষ্টিকারী শক্তিই ঔষধের রোগ আরোগ্যকারী শক্তি। একটি ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করলে যে সমস্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ ও অনুভূতি সমূহ প্রকাশ করতে পারে, কোন রোগীর মধ্যে যে সমস্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ ও অনুভূতি সমূহের সদৃশ প্রকাশ থাকলে সেই ঔষধটিই আরোগ্য করতে সক্ষম হয়। এক কথায় বলা যায় যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেই রোগ আরোগ্য করতে পারে। যেমন বলা হয়

বিষে বিষ ক্ষয়।স্রষ্টা যেমনি সৃষ্টি করতে পারে তেমনি যে ধ্বংস করতেও পারে।

জ্বরে তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন তেঁতুল গুলে খেতে। তেঁতুলের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে টক, তার ক্রিয়া অ্যাসিডিক। সে যখন পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে প্রতি নিয়ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরিত হচ্ছে। তার সঙ্গে তেঁতুল গোলার এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে ফলে শরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত তাপমাত্রা কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। তখন জ্বর আরোগ্য হচ্ছে এবং রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবেই ঠাকুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে জ্বর আরোগ্যের জন্য তেঁতুল গোলার কথা বলেছিলেন। .....

বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে।

তেঁতুল গুলিয়া খায় পিতলের পাত্রে।।

এখানেও ঠাকুরের বিধানে দেখা যায় যে অজীর্ণ জনিত পেটে ব্যথা, বমি, অম্লশূল এবং পিত্ত শূলে তিনি পিতলের পাত্রে তেঁতুল গুলে রোগীকে খাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও দেখা যায় পিতল পাত্রের সংস্পর্শে তেঁতুলের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই বিক্রিয়া ঘটার পর উক্ত দ্রবণ যখন পাকস্থলিতে পৌঁছে যায় তখন সেখানে পাকস্থলি নিঃসৃত অ্যাসিডের সঙ্গে পুনরায় বিক্রিয়া ঘটে যা পাকাশয়ের পেশী এবং অন্ত্রের পেশীতে উৎপন্ন স্পাজম বা আক্ষেপ বা খিচুনী নিবারণ করতে সক্ষম হয়। আক্ষেপের ফলে খাদ্যবস্তু ঊর্ধ্বগামী হওয়াকে বন্ধ করে পেশীর আক্ষেপ বন্ধ হয়; পিত্তক্ষরণ স্বাভাবিক হয় ফলে পিত্তশূল বন্ধ হয়। বিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে রোগী আরোগ্য হয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়।

ঠাকুর বলেছেন—

> ‘‘মহারোগে অঙ্গে মাখো গোময় গোমূত্র।’ এই মহারোগ বলতে বোঝায় উদরী, অশ্মরী, জগদোষ, উন্মাদ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধূমেহ এবং ভগন্দর এই আট রকম রোগকে বলা হয় মহারোগ। তাছাড়া কুষ্ঠ ব্যধিকেও মহারোগ বলা হয়। মহানরোগ অর্থাৎ কঠিন রোগ যা সহজে আরোগ্য লাভ করে না। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে বর্তমান সময়ের মত চিকিৎসা ব্যবস্থা এত উন্নত মানের ছিল না। সঠিক চিকিৎসা হত না যার ফলে মানুষ অকালে প্রাণ বিসর্জন দিত। সেই দুঃসময়ে দুরারোগ্য ব্যধির জন্য তিনি গরুর বর্জ পদার্থ অর্থাৎ মল এবং মূত্র যাকে বলা হয় গোময় বা গোবর এবং মূত্র বা চোনা ব্যাধি মুক্ত হতে অঙ্গে মাখতে বলতেন। এই গোময় এবং গোমূত্রের মধ্যে মহান আরোগ্যকারী শক্তি লুকিয়ে আছে যা মহাব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে পারে। সেই আরোগ্যকারী শক্তি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাঁর ছিল তাই তিনি মহারোগ যুক্ত মানুষকে গোময় এবং গোমূত্র শরীরে লাগাতে নির্দেশ দিতেন।’’[৬৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই ছিলেন আত্মানুভূতিও আত্মদর্শনকারী এক সর্বদর্শী মানুষ। তিনি মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণের জন্য হরিনাম মহানামকেই গ্রহণ করলেন। সেই আত্মানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কখনো মানুষকে আত্মশক্তিতে জাগ্রত করা সম্ভব হত না। তিনি জন্মসূত্রেই ধর্মভাবনার অধিকারী ছিলেন এবং যে সমাজ পরিবেশের মধ্যে তার সামাজিক জীবন অতিবাহিত হয়েছিল সেই সমাজ ছিল একদিকে গ্রামীণ সমাজ তারপর সেই সমাজে ছিল ধর্মপ্রাণ মানুষের বাস। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের একান্ত আপন হয়েই নিত্য সঙ্গী হয় এই সমাজের মানুষ এবং তাদের ধর্ম ভাবনা। আর তিনিও ছিলেন প্রথম থেকেই সত্যনিষ্ঠ মানুষ। তাই সহজেই তিনি সকলের কাছে প্রিয় মানুষে পরিণত হতে পেরেছিলেন। আর তিনিও ছিলেন গভীর আত্মানুভূতিশীল মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা কাহিনি বা তার জীবনী গ্রন্থ থেকেও সেই পরিচয় পাওয়া যায়। হরিচাঁদ ঠাকুর যখন সমাজ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে

মিশে গেছেন তখন তিনি একদিন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে এই সমাজ মানুষের কল্যাণ করবেন সে কথা ভেবেছেন। তিনি একদিন জয়নগর গ্রামে যাত্রা করার অভিপ্রায়ে চলেন কিন্তু তিনি মাঠের মধ্যে একটি বকুল গাছের নীচে বসেন চিন্তার মাঝে ডুবে ও আত্মানুভূতি লাভ করেন সেই আত্মানুভূতিগুলি মানুষের কল্যাণের চির কল্যাণময় বার্তা বহন করেছে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''একদিন চলেন প্রভু জয়নগরে।।
আড়োকান্দী মাঠ মধ্যে তুলি উচ্চে শির।
বকুলের গাছ এক দাঁড়াইয়া স্থির।।
সন্ধ্যার অগ্রেতে প্রভু কি জানি কি ভাবি।
বসিলেন বৃক্ষমূলে চিন্তামাঝে ডুবি।।
অনন্ত আপন মাঝে প্রভু ডুবে রয়।
আপন স্বরূপ প্রভু দেখিবারে পায়।।
মহান পুরুষ রূপে আপনার আত্মা।
প্রভুর সম্মুখে আসি কহিলেন বার্তা।।
''নামধারী দেহ রূপে তুমি হরিচাঁদ।
জীব-শিক্ষা-লাগি নরজগতের নাথ।।
তুমি-স্থুল আমি-সূক্ষ্ম উভয়ে অভিন্ন।
দেহ আত্মা মোরা দোঁহে মূলে নহি ভিন্ন।।
গৃহধর্মে সু-আদর্শ সব দেয়া হল।
দেহ গৃহ শুচি কার্য্য জীবে কি বুঝিল?
দেহমন নহে শুচি গৃহধর্ম্ম করে।
ছিদ্রযুক্ত তরী সম ডুবে যে সাগরে।।
দেহমন সর্বক্ষণ রাখিতে পবিত্র।
শিখাইতে হবে জীবে সেই মূল সূত্র।।
তুলিয়া নামের ঢেউ প্রেম প্লাবনেতে।

ধুয়ে মুছে নিব সব নাম প্রবাহেতে।।

.....

হরি প্রেম প্লাবনেতে জীব মুক্তি পাবে।।

দেহমন শুদ্ধ হলে স্থির হবে আত্মা।

তখন শিখাতে হবে গৃহধর্ম কথা।।

.....

প্রেম প্লাবনেতে মাটি সরস হইবে।

সোনার ফসল তাহে অবাদে ফলিবে।।''

এই ভাবে নিশি ভোর ভাবে অচৈতন্য।

আত্মস্থ হৈল প্রভু জীব মুক্তি জন্য।।''[৭০]

আত্মদর্শনে তিনি যেন একটি চলার ছন্দ পেলেন মানুষের উন্নত জীবন গড়ার ভিত্তি স্বরূপ। এখানে আর একটি কথাও ব্যক্ত হয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মদর্শনের মধ্যে। দেহ ও আত্মা একই মানুষের দেহের চেতনবস্তু। দুজনের কোন ভেদ নেই। দেহকেই সর্বক্ষণ শুদ্ধ পবিত্র রাখার মধ্যেই সেই চেতনবস্তু সত্তার বিকাশ ঘটে। আর দেহ ধারী মানুষই শরীরে ভগবানের সাধনা দ্বারা নিজের আত্মদর্শন করেই ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন। আর সেই আত্মদর্শনকারী মানুষই ভগবান সম্পর্কে সাধনার দ্বারা নিজের ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর করেন এ ও সত্য। হরিচাঁদ ঠাকুর কোন একটি মানুষের জীবনের আত্মদর্শন করে ব্যক্তি জীবনের সৌন্দর্য বিকাশের সহায়ক হননি। তিনি সমগ্র মানুষের আত্মানুভূতি বা আত্মদর্শন কামনায় তিনি সমবেতভাবে হরিনাম করার নির্দেশ দিতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের এক জীবনেই পূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য মানুষকে যেমন ধর্মপথ দেখান তেমনি গুরুত্ব দেন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনেও এবং সর্বপরি বলা যায় সমাজ গঠনে। তিনি সার্বিক ভূমিকা পালন করেছেন।

'মতুয়া' কথাটি হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে প্রচলিত। হরিচাঁদ ঠাকুর হলেন 'মতুয়া' ধর্মের প্রবর্তক। এভাবেই সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে 'মতুয়া' ধর্মের। 'মতুয়া' ধর্মের মূল আকর গ্রন্থগুলির কোথাও একথা ব্যক্ত হয় হয়নি যে 'মতুয়া' নামকরণ হরিচাঁদ ঠাকুর করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তার সমাজের মানুষদের হরিনামের উপর জোর দিতে বলতেন। এবং

নামসংকীর্ত্তন করতেন ভক্তগণ সঙ্গে করে একথা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রেই বর্ণিত হয়েছে। হরিনামের গানে যে ভক্তগণ বিভোর থাকতেন সে পরিচয় আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভগবান স্বরূপের বিকাশের সময় থেকেই পাই। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসরণকারী ভক্ত মানুষদের একটি উপাধি বা খ্যাতি হল 'মতো' বা মতুয়া। হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভক্ত মানুষদের নিয়ে মত্ত হয়ে হরিনাম করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদেরই উপাধি হল 'মতো' বা 'মতুয়া'। এই 'মতো' বা 'মতুয়া' উপাধির একটি সমাজ ইতিহাস আছে। সেই সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্রটি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের অধিক হরিভক্তির পরিণতিও বলা যায়। একথা সত্য যে ভক্তির জগতে ভক্তির প্রাবল্য একটু গভীর হয় এটাই স্বাভাবিক। যে ভাবালুতার প্রকাশ ঘটে ধর্ম সভায় তা বাস্তব সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রযোজ্য হয় না। একথা ভক্তিভাবের আবেশের সময় জ্ঞান থাকে না তখন ভক্তিই একমাত্র স্মরণ্য। আর ভক্তি এমন একটি মানসিক প্রবণতা যা মানুষের শ্রেষ্ঠ বস্তু হলেও সময়ভেদে তার তারতম্য ঘটে যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'মতুয়া' উপাধিটিও সেই ভক্তদের ভক্তি ভাবনায় প্রাবল্য থাকার সময়ের কার্যাবলীর পরিচয় বহন করছে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে 'ভক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণ' অংশ থেকে আমরা সেই কথা জানতে পারি। আলোচনার পরিস্ফুটনের জন্য 'ভক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণে'র সমগ্র অংশটিকেই তুলে ধরলাম—

''ওড়াকাঁদি রাউৎখামার মল্লকাঁদি।
ভ্রমণ করেন হরিচাঁদ গুণবিধি।।
সঙ্গে সংকীর্ত্তন গান হতেছে স্বচ্ছন্দে।।
নিজ গ্রাম শ্রীধামের পশ্চিম অংশেতে।
উপনীত হইলেন দাসের বাটীতে।।
একে একে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল।
সভা করি ভক্তগণ সকলে বসিল।।
হরিকথা কৃষ্ণকথা নাম পদ গায়।
মধ্যবর্ত্তী মহাপ্রভু বসিয়া সভায়।।
একে একে গ্রামের অনেক লোক আসি।
সভা করি বসিলেন যত গ্রামবাসী।।

পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভু পশ্চিমাভি মুখে।

গ্রামী লোক দক্ষিণে প্রভুর বাম দিকে।।

পশ্চিম দিকেতে বসি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।

ভক্তগণ প্রেমাবেশে করে ঢলাঢলি।।

কিছু দূর উত্তরে বসিয়া রামাগণ।

হুলুধ্বনি দিতেছে শুনিয়া সংকীর্ত্তন।।

হেন কালে তিনজন ব্রাহ্মণ আসিল।

সভা মধ্যে আসিয়া তাহারা দাণ্ডাইল।।

সবে বলে বসুন বিছানা আছে অই।

তারা বলে হরিচাঁদ প্রভু তিনি কই।।

জগতের ঠাকুর বসিয়া তিনি অই।।

একদৃষ্টে তাহারা প্রভুর পানে চায়।

তপস্বী বৈরাগী উঠে হেন কালে কয়।।

দেখিলি ঠাকুর ওরে ঠাকুর তনয়।

ঠাকুর দেখিলে পরে প্রণামিতে হয়।।

তিন বিপ্র একজন মধ্যম বয়স।

আর দুটি বয়সেতে পৌগণ্ডের শেষ।।

এই দুই ব্রাহ্মণ তাহার একজন।

ঠাকুরে প্রণাম করে শুনি সে বচন।।

একটি প্রণামে দাড়াইয়া আরজন।

কৈশোর প্রথমাবস্থা সেই সে ব্রাহ্মণ।।

চাহিয়া ঠাকুর পানে নেত্র তার স্থির।

সেই ব্রাহ্মণের ছিল অসুস্থ শরীর।।

তপস্বী বৈরাগী তবে উঠে সভা হতে।

ব্যধিযুক্ত ব্রাহ্মণেরে লাগিল কহিতে।।

ঠাকুর দেখিতে এলে প্রণমিতে হয়।

দেখিলেত ঐবিপ্র প্রণমিল পায়।।

এখন পর্য্যন্ত কেন দাঁড়াইয়া রও।

ঠাকুর দেখিয়া কেন প্রণামনা হও।।

এতেক বলিয়া ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরি।

মত্ত মাতালের প্রায় বলে হরি হরি।।

গ্রীবাধরি চাপমারী ভূমিতে ফেলায়।

বলে বাবা দেরে সেবা ঠাকুরের পায়।।

চাপ পেয়ে সেই দ্বিজ প্রণাম করিল।

মঙ্গল দাড়ায়ে বলে হরি হরি বল।।

হরিচাঁদ পদ হতে পদরজঃ এনে।

ব্রাহ্মণের মস্তকেতে দেয় টেনে টেনে।।

এইমত তিনবার ধূলি দিল গায়।

অঙ্গেতে যে ব্যাধি ছিল তাহা সেরে যায়।।

ব্যাধিমুক্ত হয়ে দ্বিজ সভাজনে কয়।

অবতীর্ণ সামান্য মানুষ ইনি নয়।।

ক্ষণেক থাকিয়া তবে দ্বিজেরা চলিল।

সভাসদ বিপ্র যত রাগান্বিত হল।।

গ্রামবাসী বহিরঙ্গ লোক যত ছিল।

তাহাদের অতিশয় রাগ উপজিল।।

ব্রাহ্মণে লইয়া করে বিরোধাচরণ।

ইহাদিগে কৃষ্ণ ভক্ত বলে কোন জন।।

কি পেয়েছে কি হয়েছে ঠাকুরালী করে।

ঠাকুর বলয় যশোবন্তের কুমারে।।

অবৈধ সকল কাজ বিধি নাহি মানে।

সমাজের বাধ্য নয় এই কয় জনে।।

শুন সবে প্রতিজ্ঞা করিনু আজ হতে।

ইহাদের সঙ্গে না করিব সামাজিতে।।

নাহি মানে দেব দ্বিজ আলাহিদা পথ।

ইহারা হয়েছে এক হরি বলা মত।।

আহারাদি না করিব ইহাদের সঙ্গ।

অদ্য হতে গ্রাম ভাব করিলাম ভঙ্গ।।

সে হইতে গ্রামবাসী হল ভিন্নদল।

সে অবধি হরিবোলা পৃথক সকল।।

বিবাদীরা বলে ওরা হয়েছে পাগল।

কাণ্ডকাণ্ড জ্ঞান নাহি বলে হরি বলো।।

হরি বোলা দেখে উপহাস করে কত।

সবে বলে ও বেটারা হরি বোলা মতো।।

কেহ বলে জাতি নাশা সকল মতুয়া।

দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া।

অন্য কেহ যদি হয় হরিনামে রত।

সবে করে উপহাস অই বেটা মতো।।

অন্য অন্য গ্রাম আড়োকাঁদি ওড়া কাঁদি।

সে হইতে হয়ে গেল মতুয়া উপাধি।।

হরিধ্যান হরিজ্ঞান হরিনাম সার।

প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার।।

তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।

ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।

মতুয়া উপাধি খ্যাতি জগতের মাঝ।

রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।”[৭১]

এই ভক্তিভাব প্রকাশের ধরণকে কবির ভাষায় বহিরঙ্গ ভক্তগণ উপহাস রূপ ব্যঙ্গ করে ‘মতুয়া’ বলে অভিহিত করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর শুধুমাত্র সেই ‘মতুয়া বা মতো’ পরিহাস কথাটিকে সমর্থন করেছেন নির্বিকার চিত্তে। সেই থেকেই ‘মতুয়া’ একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের

জন্ম ঘটল। আসলে হরিচাঁদ ঠাকুর সনাতন ধর্ম যা শ্বাশতকালের মানুষের ধর্ম সেই মানুষের ধর্মকেই জাগরণ ঘটালেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের আত্মশিক্ষার জন্য হরিনাম সংকীর্ত্তন করার নির্দেশ দেন। মত্ত হয়ে হরিনাম কারীদের উপহাস স্বরূপ 'মতো' বা 'মতুয়া' হিসাবে পরিচয় হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমাবস্থায় যে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন 'মতুয়া' উপাধীতেই খ্যাত হবে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ জগত সভায় আজ সেই বাণী সার্থক রূপ লাভ করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া' উপাধিটি শুনে বলেছেন—

''তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।

ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।''[৭৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সময়ের অনেক ভক্ত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলা মেশায় হরিচাঁদ ঠাকুরের একটি আদর্শগত মিল ছিল অনেক মানুষের সঙ্গে। ফলে গ্রামবাসীগণের থেকে ভিন্ন দল হয়ে চলার মতো ভক্ত সমাজকে তিনি গঠন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে যারা কীর্ত্তন করত এবং হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে যারা আত্ম সমর্পণ করে হরি অবতার বলে বিশ্বাস করতেনও হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে মত্ত হয়ে হরিনাম করত তাদের দলের নামকরণ হয় 'মতো' বা 'মতুয়া'। হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সময় বলেন ঠিক আছে 'ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান'। এভাবে হরি ভক্তের অপমানে স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুর নব ভাবে ধর্মজাগরণের জন্য মানুষের আত্মসংস্কার, আত্মচৈতন্য, আত্মদর্শন করার সকল কাজই করলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের নব মানবতাবোধের জন্য ধর্ম বিধি সমাজ বিধি ও শিক্ষার নবরূপ সৃষ্টির জন্যই যেন জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয়েছে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য কবিরস রাজ তারকচন্দ্র সরকার বার বার সেকথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' গ্রন্থে কবি বলছেন—

''মানব কুলে আসিয়ে যশোবন্ত সূত হয়ে

জন্ম নিল সফলা নগরী।

প্রচারিল গঢ়াগম্য, সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম,

জানাইল এজগত ভরি।।''[৭৩]

তিনি যে ধর্মাদর্শ প্রচার করেন তাকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বলা হয়। সনাতন ধর্ম ছিল পঞ্চ ভৌতিক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সনাতন ধর্মকে আবার ভূতের ধর্মও বলা

হয়। কারণ এই ধর্ম মূলত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। পঞ্চভূতের এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর বিশেষ জ্ঞানার্জনের দ্বারা সনাতনী আদিপুরাণকে সংস্কারের মাধ্যমে যাঁরা আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক করে সনাতন ধর্মদর্শকে সমৃদ্ধ আকারে তুলে ধরতেন তাঁদের বলা হত বুদ্ধ বা জ্ঞানী। কিন্তু ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্ধে বৈদিক আর্য আগমণের পর বৈদিক বর্ণধর্মের প্রবর্তনের সাথে সাথেই ধীরে ধীরে পতন ঘটতে থাকে সনাতনী এই ভূতের ধর্ম দর্শনের।

হারিয়ে যায় না চির পুরাতন কখনই হরিচাঁদ ঠাকুরে কর্মে এই মহাসত্য প্রকাশিত হয় সনাতনী ভূতের ধর্মদর্শনের তিনি পুনর্জাগরণ ঘটান। সনাতন ধর্মের একবার পুনর্জাগরণ ঘটান বুদ্ধ গৌতম। কারণ সনাতন ধর্ম সংস্কারকদের বলা হত বুদ্ধ। তাই বৌদ্ধ ধর্ম আসলে সনাতন ভূতের ধর্মেরই একটি সংস্কৃত রূপ। আবার এই পঞ্চভৌতিক ভূতের ধর্মের বা সনাতন ধর্মের পুনরায় আত্মজাগরণ ঘটান হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের ধর্ম সংস্কারকগণের সমসাময়িক হয়েই তিনিও সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটান সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। আর তিনি যে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মই প্রচার করেন তার প্রকাশ রয়েছে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। আর একথাও জোর দিয়ে বলা যায় তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে নবভাবে সংস্কার করেননি তিনি সনাতনী সেই ভূতের ধর্মেরই নবজাগরণ ঘটান একথা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকেই বোঝা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শের মূল কথাতেই সেই সনাতন আদর্শটি যেমন ধরা পড়ে তেমনি তার নব ভাবনাটিও স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকে—

> ''সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙ্ঘি এবে করিলেন স্থূল।
> শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
> জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
> ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।
> এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
> জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।''[৭৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর যে সনাতন ধর্মকেই নব ভাবে জাগ্রত করলেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে তা উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্ম ভাবনায় একথা ব্যক্ত হয়

যে মানুষের কল্যাণে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নবভাবে মানুষের ধর্ম ও কর্ম ভাবনাকে বাস্তব জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হলেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুর সারা জীবনের কর্ম সাধনায় যতটা পারলেন মানুষের আত্ম উন্নতিতে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকে বিভিন্ন দেশে দেশে প্রচার করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের একান্ত আপন মানুষেরা যারা হরি অবতার বলে ভক্তিতে বাধ্য ছিলেন তারাই। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক একদল আত্মনিষ্ঠ ভক্তের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর কাছে। তারাই হরিভক্তির নব আদর্শকে বহন করেছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে। হরিচাঁদ ঠাকুরের পর তার সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে বিভিন্ন গঠন মূলক কাজের মাধ্যমে উন্নতির পথে অগ্রসর করেন। আর এই সময়ও ভক্ত মানুষের বৃদ্ধি ঘটছিল আরও গভীর ভাবে। ফলে সমাজের প্রায় সর্ব স্তরেই মতুয়া ধর্মের প্রভাব পড়ছিল। আমার পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বিবরণ সহ আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভারত সংস্কৃতি, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরর দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, আষাঢ় ১৪০০, পৃ. ১০।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৬. সুর, ড. অতুল—ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা-৭০০০০৬, কার্ত্তিক, ১৪১৫, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৬।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৯. সেন, সুকুমার—ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং,

বঙ্কিম চ্যাটাজি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, বৈশাখ, ১৪১১, এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ৭৪-৭৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

১৪. সরকার কবিরসরাজ তারকচন্দ্র শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০।

১৫. বৈরাগী, মনিমোহনঃ অনালোকিত ইতিহাসের উত্তান-পতনে কাশ্যপ মুণির বংশধর 'নমঃজাতি', প্রথম প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ৮ই অক্টোবর বুধবার ২০১৪, পৃ. ৯-১০।

১৬. সুর, ড. অতুল—ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য লোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা-৭০০০০৬, কার্ত্তিক ১৪১৫, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ১৯৪।

১৭. রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ২৭।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

২১. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ২৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

২৪. বৈরাগী, মনিমোহন—অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্মভাবনা, তৃতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩ মার্চ, ২০১৪, পৃ. ১১১-১১২ ।

২৫. সেন, অভিজিৎ—রুহ চণ্ডালের হাড় উপন্যাস।

২৬. বসু, স্বপন—বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ,

পুস্তকবিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০০, পৃ. ৯৯।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নতুন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২-২০১৩, পৃ. ১২৫।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৪১. বসু, স্বপন—বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তকবিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৯৯।

৪২. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৯।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৫৭. রায়, ড. নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৫৯. পাগল, বিচরণ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ১।

৬০. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

৬৯. বৃন্দাবণে পূর্ণব্রহ্ম—শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৬৯-৭০।

৭০. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩-৭৪।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

তৃতীয় অধ্যায়

মতুয়া ধর্মের পূজা-পার্বণ ও পালনীয় রীতি-নীতির বিস্তারিত আলোচনা

হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন মানুষের সমাজকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের দ্বারা আত্মজাগরণ ঘটালেন। মানুষের মধ্যে তিনি যে ধর্মাচরণের নিয়ম প্রচলন করেন সেই ধর্মাচারণকারী মানুষদের মতুয়া নামে আখ্যায়িত করেন তৎকালীন মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত বিশাল, ভক্ত সমাজকে তিনি প্রথমে ধর্মাদর্শের প্রবর্তন করেন 'মত্ত হয়ে হরিনাম গান' করার রীতি। হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞামত ভক্তরা মত্ত হয়ে 'হরিবল' নামে বিভোর হতেন সেই থেকে মানুষেরা 'হরিনাম'কারী ভক্ত মানুষদের হরিবোলা 'মতো' বা 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে থেকে 'উক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণ' অংশে পাই—

'সবে বলে ও বেটারা হরিবোলা 'মতো'
দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া।।''[১]

সকলে 'মতুয়া' বা 'মতো' আখ্যায় ভূষিত করলেও শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করেন। সেই ধর্ম পালনের রীতি প্রচলন করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্ম জগতবাসীকে জানিয়েছিলেন তা তারকচন্দ্র সরকার স্পষ্টভাবে জানালেন—

''জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
জন্ম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।''[২]

এই 'মতুয়া' ধর্ম দর্শন সূক্ষ্ম 'সনাতন ধর্ম দর্শন' একে অপরের পরিপূরক। এই সনাতন ধর্মকে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বলেছেন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর প্রবর্তিত ধর্ম দর্শনই ভারতের আদি ধর্মদর্শন। যা সনাতন (পুরানো) ধর্ম-দর্শন নামে খ্যাত। যার আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল ৬৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেরও পূর্বে। এই সনাতন ধর্মকে আবার

ভূতের ধর্মও বলা হয়। কারণ এই ধর্ম মূলত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। এই সনাতন ধর্মদর্শনকে আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুগপোযোগী করে যারা সংস্কার করতেন তাদের বলা হত জ্ঞানী। হরিচাঁদ ঠাকুর এই সনাতনী ভূতের ধর্ম দর্শনের প্রবর্তন করেন নবভাবে যা যথার্থভাবেই যুগপোযোগী করে জনসাধারণ্যে প্রচার করেন। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্মদান করেন তা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম তৎকালীন সামাজিক। লোকের আখ্যা 'মতুয়া ধর্ম' ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম একই। 'হরিনাম' মত্ত হয়ে করত বলে 'মতুয়া' খ্যাতি মূলত এটি 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম'।

হরিচাঁদ ঠাকুর সনাতন ধর্ম সংস্কার করে 'সূক্ষ্ম সনাতন' ধর্ম দর্শন' মানুষের সমাজে জাগরণ করলেন সেই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম পালনকারী ভক্ত সমাজ বা মতুয়া ধর্ম পালনকারী ভক্ত মানুষেরা কীভাবে পূজা-পার্বণ ও রীতিনীতি পালন করেন তারই বিস্তারিত আলোচনা এই তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।

আলোচনার সুবিধার জন্য মতুয়াধর্মের পূজাপার্বণ ও রীতিনীতিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া হল—

পূজার সামগ্রিক আলোচনা।

মতুয়া ভক্তগণের সামাজিক পালনীয় রীতিনীতির সবিস্তার আলোচনা।

পূজার সামগ্রিক আলোচনা:

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' পালনের জন্য প্রথমেই যে কথাটি মনে পড়ে তা হল ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে মূর্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সেই বিশেষ মূর্তির নানাভাবে স্তব স্তুতির দ্বারা ভগবানের নাম গান করে থাকেন। তার কীর্ত্তি কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'সূক্ষ্মসনাতন ধর্ম' পালনের জন্য যে কর্ম করা হয় সেই ধর্ম কর্মের সবিস্তার আলোচনা করছি। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক বহুভক্ত হরিচাঁদ ঠাকুর আত্মসমর্পণ করে তাঁর ভক্ত হন হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর আদর্শিত পথের সন্ধান দেন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যেমন তেমনি ভাবে বিভিন্ন জেলায় জেলায়। অবিভক্ত বাংলায় হরিচাঁদ ঠাকুরের সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বা মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগ জনিত কারণে বহু মানুষ

অধুনা পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে চলে আসেন। আর তাদের নিত্য আত্মারূপ ভগবান হরিচাঁদ ঠাকুরকেও ভক্তগণ ও তাঁর ধর্মাদর্শকে তাদের সঙ্গে এদেশে নিয়ে আসেন। আর সেই আত্মসমর্পিত ভক্তরা যে ভাবে নিজেদের হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে সমর্পণ করে মানব জীবন অতিবাহিত করছেন। আবার কোন মানুষ যদি হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে চান তাহলে কোন আত্মসমর্পিত ভক্ত মানুষই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে তাকে নিয়ে যান বা তার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেন। এইভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেন তারাও আবার কোন মানুষকে তাঁর মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেন আবার অনেকেই নিজেরা হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শের সন্ধান করে নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন। এই ভাবে ভক্তি ধারার বিস্তার ঘটে চলে। হরিচাঁদ ঠাকুর বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে যোগ্য উত্তরসূরী পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর, হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল কর্মাদর্শকে বাস্তবে পরিণত করেন। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মসমর্পিত ভক্ত মানুষেরা ঠাকুরের প্রয়াণের পর গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সকলেই ধর্মাদর্শ যেমন পালন করেছেন তেমনি কর্মাদর্শকেও পালন করেছেন। মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের বিস্তার ঘটেছে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরচাঁদ ঠাকুর ও তৎকালীন ভক্ত মানুষের একযোগে ধর্ম ও কর্মকে সম্মিলন করে কর্মের মাধ্যমে। আজও মতুয়া ভক্তগণ যেমন ধর্ম কর্ম করেন তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর উত্তরসূরীরাও যথাসম্ভব ভক্তদের সঙ্গে একযোগে কর্ম সম্পাদন করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শনাশায় মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস গিয়েছেন। কিন্তু প্রাণের যে চিরায়ত বিশ্বাস ঠাকুরের নাম বা ঠাকুর দর্শন করে জীবন ত্যাগ করলে মৃত্যুর পর ভগবান পাওয়া যায়। মানুষ এই জীবন সংসারে সুখী হতে চায় এটাই চির আকাঙ্খানীয় বিষয়। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের ইচ্ছে—

"মরিলে ঠাকুর দেখে পর কাল পাব।"[৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের মনোভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নিজেই অন্তর্যামী হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়ে নিয়েছেন—

"প্রভু বলে যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।
মরিলিত ভাল করে মর মোর কাছে।"[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ভগবান সন্ধান করে ভক্তগণ যেমন ব্যর্থ হয়নি তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুর

জীবন সম্বন্ধে দুঃখ জর্জর মানুষকে সম্পূর্ণভাবেই সুস্থ করে তুলে তাদের দিয়েছেন মানুষের মুক্তি কর্মে নিয়োজিত করে। এখানে তারা যেমন জীবনে ধর্ম-কর্মের দ্বারা নিজের জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে পেরেছিলেন তেমনি অন্য মানুষকেও সুখের সন্ধানের পথ নির্দেশ করতে বলতেন হরিচাঁদ ঠাকুর। এভাবেই তিনি মানুষের আপনার জন হয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভক্ত সমাজকে সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে জীবনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সেই আদর্শই মতুয়াভক্তদের আদর্শ জীবন যাপনের মূল ধন স্বরূপ।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন তা যথার্থভাবেই বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে মানুষের ধর্ম কর্মময় জীবন গঠনের পরিপূরক। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই ধর্মাদর্শকেই মতুয়া ভক্তরা পালন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতে মতুয়াদের গুরু বা ভগবানকে সেকথা ব্যক্ত করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতটি হল—

''অজ্ঞান আঁধার যিনি করিবে উজ্জ্বল।
তিনি গুরু তাঁর কাছে আছে মোক্ষফল।।
.....
.....
মতুয়ার একগুরু ভিন্ন গুরু নাই।
ওড়াকান্দি প্রভু যিনি ক্ষীরোদের সাঁই।।''[৫]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ দান করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করান যিনি তাকে 'ধরা' বলে অবিহিত করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। যিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ পথে মানুষকে ধরে আনেন হরিচাঁদ ঠাকুরের মাহাত্ম জ্ঞাপন করেন, তিনি অর্থাৎ সেই ভক্ত মানুষকে 'ধরা' বলা হয়। যিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তিনি 'মরা' নামে পরিচিত হন। অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তকে বলা হয় 'মরা'। বলা যায় পূর্বের ধর্ম সংস্কার ত্যাগ করে নবভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে নবজীবন লাভ করা। গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা হল—

''যিনি ধরে আনে দলে তারে 'ধরা' কয়।
ঠাকুরের কাছে গেলে তারে 'মরা' কয়।''[৬]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ দান করেন এমন একজন 'ধরা' ভক্ত মানুষের পরিচয় গ্রহণ করব।

যিনি হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ মানুষের মাঝে দান করেন তাদেরকে 'ধরা' নামে অভিহিত করেন মতুয়া ভক্তগণ। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শে প্রথমে নিজেই আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের অসীম করুণায় ধর্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েছেন। এবং পরে সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ কৃপা করে মানুষের কল্যাণে তিনি শিখিয়ে দেন; আত্মসমর্পণ করে কীভাবে ভক্ত হয়ে মানুষের জীবনকে ধর্ম-কর্ম করে সাফল্য মণ্ডিত করা যায়। এমন একজন মানুষ মনিচাঁদ গোসাঁই তিনি মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে সকলকে জানান।

মনিচাঁদ গোঁসাই 'ধরা' মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করান এভাবে—প্রথমে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে এবং পিতা-মাতাকে পূজার পর হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত ধরাকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে ধর্মাদর্শ গ্রহণ করার জন্য আসন গ্রহণ করতে হয়। একজন বা সমবেত অনেক মানুষও একসঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে।

হরিচাঁদ ঠাকুর শান্তি দেবীর মঙ্গলঘট স্থাপন করে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে তারপর প্রতিজ্ঞা করান 'সদা সত্য কথা বলিব, সত্যের গান গাহিব' এভাবে তিনবার বলার পর 'হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে প্রতিজ্ঞা করান যে 'জানবো তোমায় মানবো তোমায়।' তিনবার। এরপর বন্দনা করান—

''জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরী দাস।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চসহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ করি মোরে কর আত্মসাৎ।''[৭]

নতুন ভক্তকে তার ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ধরা বা মতুয়াচার্য বলেন—শ্রীশ্রীধাম ওড়াকান্দি শ্রীশ্রীহরিগুরু ধর্মাদর্শে আদর্শিত। তিনবার। সবশেষে বাহু তুলে 'হরিবল' নাম উচ্চারণ করতে

হয়। আর যে ব্যক্তি এই ধর্মাদর্শ ভক্তগণকে দান করেন তিনি 'নামদেন' বা 'নামনেবে' বলেন। নাম বলতে 'হরিনাম' 'হরিবল' নামকে বোঝায়। অর্থাৎ 'হরিবল' নামদান করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে। যখন প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায় 'হরিবল' মহামন্ত্রই একমাত্র দান করতে বলেন। আর তিনিই চরিত্রকে গঠনের জন্য যে আদর্শ দিয়েছিলেন আজও সেই একই আদর্শ বহন করে চলেন। পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে চরিত্র গঠনের সামগ্রিক দিক আলোচিত হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ দিতেন সকল ভক্তকে একত্রকে সকলের উপযোগী করে। যাতে ভক্তদের মধ্যে সর্বভাবে ঐক্য রক্ষিত হয়। আর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একই ঐক্য স্থাপিত হয়ে আছে। মতুয়া ভক্তগণ সকলেই এক আদর্শ বহন করেন তা হল হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম কর্মাদর্শ।

পূজাবিধি ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম সম্পর্কে নির্দেশ দান :

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মতই মতুয়া ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত ধর্মমত ও কর্মগুলিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেন। কেননা নবধর্মমত গঠন হলে তার সার্বিক ক্রিয়া কর্মও থাকা দরকার। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর ক্রিয়ার বিধি দিয়েছেন আর কাজে রূপান্তর করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করে ভক্তি করা প্রচলন হলেও গুরুচাঁদ ঠাকুরই সকল মতুয়া ভক্তকে শ্রীহরি মন্দির নির্মাণও নিত্য পূজার প্রচলন করে 'হরিনাম' করার রীতি প্রচলন করেন। আর কবিরসরাজ তারকচন্দ্র 'শ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে যে বন্দনা করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সেটিই মূল বন্দনা শান্তি হরি পূজার। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই মহোৎসব পালনের নিয়ম ভক্তকে শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া হরিচাঁদ ঠাকুর কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পূজার কঠিন নিয়ম না থাকলেও পূজার যে সাধারণ রীতির উল্লেখ করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই আদর্শ ধরে ভক্ত প্রধানরা শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজার প্রচলন করেন। ড. নন্দদুলাল মহন্ত তাঁর 'মতুয়া তত্ত্ব দর্শন ও সাধন পদ্ধতি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছা ও আদেশক্রমে মতুয়া ভক্ত সমাজে শ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীহরি পূজার প্রচলন হয়। প্রথম পর্যায়ে পূজা সম্বন্ধে সর্ব সম্মত কোন বিধান বিধি রচিত বা প্রচারিত হয় নাই। যে দেশে বা যে অঞ্চলে যে ভক্ত প্রধানকে অনুসরণ করিয়া যে ভক্ত সমাজ

চলিত সেই প্রধানের উপদেশ মতেই পূজা বিধি পালিত হত। মতুয়াতত্ত্ব দর্শন ও সাধন পদ্ধতি গুরুচাঁদ ঠাকুরের 'হরিবল' নাম করে নামে ভীর দিতে বলেছেন শ্রীহরিমন্দিরে। আর এই শ্রীহরিমন্দিরে কার পূজা করবেন ভক্তগণ সে সম্বন্ধেও বলেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মতই শ্রীহরিমন্দির, পূজার বিধি, সকলই নির্ধারিত হয়েছে। ধর্ম ও কর্ম যাই করা হোক না কেন মূলত ভক্তি জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহযোগে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর শ্রীহরি মন্দির গঠন ও শ্রীহরিমন্দিরে কার পূজা করবেন ভক্তগণ সেই অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন—

.....

"তাই বলি ঘরে ঘরে গড় হে মন্দির।
সকাল সন্ধ্যায় সেথা নামে দাও ভীর।।
শ্রীহরিমন্দিরে পূজা করিবে কাহার?
শুন সবে বলি আমি সেই সমাচার।।
বিশ্ব ভরে এই নীতি দেখি পরম্পর।
যে যারে উদ্ধার করে সে তার ঈশ্বর।।
মম পিতা হরিচাঁদ ক্ষীরোদ ঈশ্বর।
দয়া করে এজগতে হল অবতার।।
দলিত পীড়িত যত পতিত মানব।
তাঁর কৃপাগুণে রক্ষা পাইয়াছে সব।।
তাঁর পূজা কর সবে তাঁর ভক্ত হও।
শ্রীহরি মন্দিরে তাঁর মূরতি সাজাও।"[৮]

তাই শ্রীহরিমন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবী প্রতিকৃতিতেই পূজা করা হয়। কারণ গৃহধর্ম রক্ষা করেছেন পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাই তিনি জগৎপিতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও জগৎমাতা শান্তিদেবী। মতুয়াধর্মের প্রধান পূজা হল হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজা। মতুয়া ভক্তগণ শুদ্ধ ভক্তিতে পূজা করে থাকেন। সেই পূজার নিয়মাবলী হল— হরিচাঁদ ঠাকুরও শান্তি মাতার পূজার নিয়ম সর্ব অবস্থায় সব জায়গায় একই ভাবে পালন করা হয়। একথা বলার অর্থ হল কোন ভক্তালয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজা ও সর্বজনীন হরিমন্দিরের পূজা একই নিয়মে হয়।

প্রথমেই পূজার রীতিনীতির আলোচনা। মতুয়া সম্প্রদায়ের যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সর্ব প্রথম রীতি বা বিধান হলো কবিরসরাজ শ্রীমৎ তারকচন্দ্র সরকার বিরচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের মূল বন্দনা পাঠ।

পূজার উপকরণ সামগ্রী—পাঁচ রকমের ফল ও পাঁচ রকমের মিষ্টি। যথাসম্ভব ফুল সংগ্রহ করতে হবে। সাদা ফুল আবশ্যক। চন্দন, ঘৃত, মধু, কাঁচা দুধ, ডাব, জলপূর্ণ ঘট, সুপারি, আম্রপল্লব। ঠাকুরের জন্য ও মায়ের যথাসম্ভব নববস্ত্র ও প্রসাধন সামগ্রি। বরণ কুলা, প্রদীপ, বরণ সরা, ধান দূর্বা, নতুন সুতা ও মন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মায়ের পূজা হলে অবশ্যই 'নিশান' উত্তলোন করতে হয়। যা তারকের নিশান নামে পরিচিত। 'নিশানকে কাঁচা হলুদ, গিলে, মেথি, নিমপাতা একত্র করে বেটে নিয়ে সরিষার তেল দিয়ে নিশানের গায়ে মাখিয়ে নিকটস্থ পুকুর বা নদী থেকে স্নান করিয়ে আনা হয় হরিধ্বনিও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। এছাড়াও এই একই সময়ে অনেক ভক্ত নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে মন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মায়ের ঘট স্থাপনের জন্য জল বরণ করে আনা হয়। জলবরণ করেন ত্রয়োস্ত্রীগণ যারা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শে আদর্শিত তারাই। জলপূর্ণ করতে হয় গঙ্গবরণ করে। এই সময় বড় পিতলের কলসিতে জলপূর্ণ করতে হয় সেটিতে আম্রসর দিয়ে ও নববস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে নিয়ে যেতে হয় ও এক ডুব দিয়ে কলসিপূর্ণ করে 'হরিবল' বলে মাথায় করে নিয়ে আসতে হয় বাড়িতে মন্দির প্রাঙ্গণে। বিশেষত বুধবার এই ঘট স্থাপন করা হয়।

পূজার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায় :

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের পূজার জন্য শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী সচ্চরিত্র সত্যবাদী ব্যক্তি পূজারী হন। 'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ পূজা বিধি' গ্রন্থে পূজা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

> ''যথাসম্ভব নিজে ফুল তুলিবে, ধূপ-দীপ জ্বালাইবে, চন্দন ঘষিবে, ফুল-দূর্বা প্রভৃতিতে চন্দন মাখাইবে এবং নৈবেদ্য সাজাইবে। ফুল না পাইলে দূর্বা দিবে। ... ঠাকুরের মাথায়ও পায়ে চন্দন এবং মায়ের কপালে সিন্দুর ও গায়ে চন্দন দিবে। (ফুলে চন্দন মাখাইয়া তারপর দিবে।) নৈবেদ্যের উপরে ফুল চন্দন দিবে না;

...। চন্দন ঘষিবার সময় গায়ের বল ছাড়িয়া ঘষিবে। কারণ চন্দন জোরে ঘষিলে কাঠের কুঁচি কাটে, তাহা ঠাকুরের গায়ে ফোটে। সেই জন্য গায়ের বল ছাড়িয়া ঘষিলে গুঁড়া থাকিবে না। ইহা-ই অ-গুরু চন্দন। ফুলের বোঁটা বা পাঁপড়িতে আল বা কাঁটা যুক্ত থাকে, সেই জন্য ইহাও ফেলিয়া দিবে। পূজার সময় ও শেষে হুলুধ্বনি হরিধ্বনি সহকারে কাঁশ ডঙ্কা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইয়া হরিনাম কীর্ত্তনাদি করিবে।''[৯]

ঘট স্থাপন প্রসঙ্গে যে নিয়ম পালন করা হয় তা হল—ঘট স্থাপন মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের পূজার প্রধান বিষয়। পূর্ণ ব্রহ্ম হরিচাঁদ ঠাকুর জগন্মাতা শ্রীশ্রীশান্তিদেবীর উদ্দেশ্যে সকল মতুয়া গৃহেই এই ঘট স্থাপন করা হয়। ভক্তের সাধ্যমত মন্দিরে বা গৃহ মধ্য এই ঘট স্থাপন করা হয়। বৎসরের যে কোন মাসের 'বুধবার' ঘট স্থাপন করা যায়। পূর্ব দিন সন্ধ্যায় 'অধিবাস' করে সারারাত 'হরিবল' এই মহাকীর্ত্তন করা হয়। ঘট স্থাপনের এক বৎসর পর পুনরায় ঐদিনে ঐ তারিখেই ঘট পরিবর্তন করে নবভাবে সমবেত হরিধ্বনি সহযোগে ঘট বসানো হয়। ঘট বসানোর পর বন্দনা পাঠ করা হয়। ঘট বসানোর পর ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। শুদ্ধ পবিত্র পাত্রে ভাত নিরামিশ ও নানারকম মিষ্টান্ন সহযোগে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। এবং শেষে কীর্ত্তন করে হরিধ্বনি করে সকল ভক্ত সমেত সেই ভোগ প্রসাদ সকলে মিলে এক সাথে পংক্তি ভোজের দ্বারা মহোৎসব শেষ হয়। মহোৎসবে সকল ভক্তগণ একে অপরকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণাম করেন। মতুয়াগণ প্রার্থনা করেন সমবেতভাবে এই বন্দনাটি—

''জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরীদাস।
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়।।

জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।

নিজ করি মোরে কর আত্মসাৎ।।”[১০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মহোৎসবে বা মহাবারুণীর পূণ্য প্রভাতে প্রভাত সংগীতটি গাওয়া হয়। প্রভাতী গীতি হিসাবে। অশ্বিনী কুমার সরকার হল ‘শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত’ রচয়িতা এক কবি ও মহাসাধক। তিনি মহারত্ন অশ্বিনী গোঁসাই নামে পরিচিত। অশ্বিনী গোঁসাই ছিলেন প্রেমিক শিরোমণি। অশ্বিনী কুমারের ‘শ্রীশ্রীহরিসংগীত’ ও কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের ‘শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন’ গানের বিখ্যাত বই। এই গ্রন্থ থেকে ভক্তগণ গান করেন মতুয়া ধর্মের হরিসভা ও মহোৎসবগুলিতে ভক্তগণ কীর্ত্তন করেন। এগুলি ভক্তিগীতি নামে পরিচিত।

অশ্বিনী গোঁসাই এর এই গানটির বিষয়বস্তু সত্যিই মন প্রাণ হরণকারী। প্রভাত বেলায় কীর্ত্তনের সুন্দর মনোরম পরিবেশে এই হৃদয় হরণকারী গানটি গেয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীকে জাগান হয়—শ্রীহরি সঙ্গীতটি হল—

“প্রাণমতি শুকশারী, পোহাল শর্ব্বরী, শ্রীহরি মঙ্গল গাও হে।

শ্রীহরি মঙ্গল গাওহে, প্রেমানন্দে মাতিয়া রও হে।।

১. হৃদি নিধুবনে, শান্তি মায়ের সনে শ্রীহরিচাঁদকে জাগাও হে।

যুগল মিলন করি, যুগল নয়ন ভরি, হরিরূপ বসে ডুবে রও হে।।

২. নিশি হল ভোর, রসনা ভ্রমর, গুণগুণ স্বরে গুণ গাও হে।

হরিপদ পঙ্কজে, সতত থাক মজে, হরিপদ রজে গড়ি দাও হে।।

৩. হরিরূপ আলোকে, মনের পুলকে, নিরানন্দ উলুকে তাড়াও হে।

হইয়া চৈতন্য, এ দেহ কর ধন্য, সাধু সঙ্গ বাতাস লাগাও হে।।

৪. নিশি প্রভাত সময়ে, প্রেমানন্দ হৃদয়, পুলকে পুর্ণিত হও হে।

আলস্য ত্যাজিয়া, হরিপদে মজিয়া, হরিচাঁদ প্রভাতী গাও হে।।

৫. হরিপদ পল্লব, দেবেরও দুর্লভ কায়মনে স্মরণ ও লও হে।

শয়নে স্বপনে, জাগরণে বদনে, নাম মধু পানে মত্ত হও হে।।

৬. তারক মহানন্দ, গোঁসাই গোলকচন্দ্র, প্রেমধন যাচে জীবে লওহে।

হেন দয়াল ভবে আর কি খুঁজিয়া পাবে, চরণে স্মরণ লওহে।।

৭. শ্রীগুরু চাঁদ বলে, নিশি প্রভাত কালে, আলস্যে অবশ্য কেন হও হে।

(অলস) অশ্বিনী অধম, ত্যাজিয়া মায়াঘুম বসিয়া হরিগুণ গাও হে।''[১১]

নিত্য শুদ্ধাচারে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর পূজা করা হয়। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন—

''স্নান শুচি হয়ে ঠাকুর পূজা করিবে।
ত্রিতাপ পাপ হইতে রেহাই পাইবে।।
পূজায় অর্ঘ্য দিবে ভক্তি শ্রদ্ধা অঞ্জলী।
কামনা বাসনা যেন দূরে রাখ ঠেলী।।''[১২]

হরিভক্ত অশ্বিনী গোঁসাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ভক্ত প্রেমিক কবি। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়াধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের নিয়ম রীতিকে তিনি দেখেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তির আদর্শকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বদা রক্ষা করেছেন এবং তার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ঘরে ঘরে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে জানুক বুঝুক ও গ্রহণ করুক। তবেই তার মানুষের জন্য এত গভীর জীবন দর্শন স্বার্থক হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণের উদ্দেশ্যে তাই সরবে ঘোষণা করেন—

''পবিত্রতা, সত্য বাক্য মানুষে বিশ্বাস।
তিন রত্ন যার আছে হরি তার বশ।।''[১৩]

এই চরিত্র গঠনের দ্বারা যদি মানুষের মানস গঠন হয় তাহলে মানুষের জীবনের পূর্ণ শান্তি লাভ হবে। আর ধর্মাচরণ ধর্ম জীবন যাপন প্রসঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুর যে অভিমত পোষণ করেন তা হল—

''দীক্ষা তো স্বীকৃতি মাত্র হব আমি ভাল।
হব ভালো রব ভালো কব আমি ভাল।।
.....
ভালো হলে ভালো হবে মোর পিতা কয়।।
.....
শ্রীহরি মন্দিরে নিত্য পূজা করা চাই।।''[১৪]

আসলে একটি শিক্ষা জগতের জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্খায় সেই ধর্মমত গ্রহণ করা। এটি আত্ম জ্ঞান লাভের জায়গা। আর এখানে আত্মদর্শি মানুষেরাই শিক্ষা দেন। এই যে পূজা করা সেটিও প্রতিনিয়ত করতে করতে কর্মের অভিজ্ঞতা হয়। তেমনি 'হরিবল' নাম নিত্য করতে

থাকলে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের করুণা লাভে আত্মদর্শন করে মানুষের জীবন সার্থক করা যায়।

আজকের তথা বাস্তব জগতের এই জ্ঞান লাভ করতে হলে কোন একটি ভাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে সেই স্কুলের পাঠ্য বই ও শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা নিতে থাকলে এক সময় স্কুলের পাঠ শেষ হয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পর আরো উচ্চ শিক্ষা ও আরো উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তেমনি ভাবে ধর্মাচারণ করতে করতে ধর্ম জ্ঞান লাভ করা যায়।

আর যে মহাসত্য সর্ব সময় সর্বকালে জয় লাভ করে তা হল ধর্ম জীবন সৎ ভাবে পালন করে জীবন যাপন করলে জয় অনিবার্য। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জয় হবেই এবং এই ধর্ম ও কর্মী হলে জীবনে শান্তি আসবেই এই সত্যকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর বজ্র কণ্ঠে বলেন—

"শ্রীহরি এনেছে ইহা বিশ্বের দুয়ারে।
বিশ্বভরে এই ভাব হোক ঘরে ঘরে।।
সে ধর্ম যাজন যেবা করে মনে প্রাণে।
দেবে দুর্লভ শান্তি লভে একদিনে।।
সর্ব্বতত্ত্ব মূলে এক তত্ত্ব জান সার।
'যথাধর্ম্ম তথা জয়' কথা নাহি আর।"[১৫]

ভক্ত গৃহে মতুয়াদের মধ্যে যে বড় উৎসব পালিত হয় তা হল মহোৎসব। এই মহোৎসব ভক্ত গৃহে হয়। আবার সর্বজনীন হরিমন্দিরেও হয়। মহোৎসব উৎসবের প্রথম উৎস হিসাবে পাই কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। 'ভক্তা নায়েরীর মহোৎসব' আখ্যানের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্য বিধবা নায়েরী হরিভক্ত হয়। ভক্তা নায়েবীর, ইচ্ছে তাঁর সম্পত্তির ভক্তির কাজে যথাযোগ্য ব্যবহারের। ভক্তের অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে আজ্ঞা দেন মহোৎসব করার। স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী ভক্তানায়েরীর নিমন্ত্রণ দেন গোলক পাগল। আর এই নায়েরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক অনেক ভক্তগণ। নায়েরীর মনোসাধ ঠাকুরকে জানায় এভাবে—

"ওহে মহাপ্রভু মম আছে কিছু ধন।
আজ্ঞা হলে তব নামে করি বিতরণ।।"[১৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর নায়েরীকে এভাবে নির্দেশ দেন ও মহৎসবের দিন ধার্য্য করে দেন এবং মহোৎসবের নিয়মাবলীও তিনি নিধারণ করে দেন। যা আজও হরি ভক্তদের ও মন্দিরগুলিতে

একই ভাবে পালিত হয়ে চলছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের সেই নির্দেশাবলীকে তারকচন্দ্র কাব্য ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"প্রভু বলে নায়েরী মতুয়া সব ডাক।
জনমের মত এক কীর্ত্তি করি রাখ।।
চাউল লাগিবে তোর বিশকুড়ি মন।
এর উপযুক্ত দ্রব্য কর আয়োজন।।
.....
নিজে প্রভু দিল তার দিন অবধারী।।
প্রভু বলে তোর কিছু করিতে হবে না।
কর গিয়া আয়োজন যে তোর বাসনা।।"[১৭]

ভক্তকে সাহায্য হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং করতে শিখিয়েছেন সকল ভক্তগণকে। একে অপরকে কার্য্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা সৌভ্রাতৃত্বের পরিচায়ক। সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দৃঢ় সূত্রপাত করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তিনি মানুষে মানুষের যে সম্পর্ক তাকে বজায় রেখে চলার নির্দেশ দেন। মতুয়া ভক্তরা এখনও মানুষ সম্পর্কে ভ্রাতৃভাব পোষণ করে থাকেন। মানুষে মানুষের সম্পর্ক হল 'মানুষ মানুষ, ভাই ভাই।' এই পরিচয় পাই হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ দানের মধ্যেই।

হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক পাগলকে ডেকে বলেন—

"নায়েরী করিল সাধু সেবা আয়োজন।
এদিকে ঠাকুর দিতেছেন নিমন্ত্রণ।।
গোলক পাগলে ডেকে বলে হরিচাঁদ।
মহোৎসব করিবারে নায়েরীর সাধ।।
যাহ বাছা নিমন্ত্রণ করহ সবারে।
পরস্পর বলাবলি যে দেখ যাহারে।।
বৈশাখের সাতাশে আটাশে ঊনত্রিশে।
তিনদিন মহোৎসব করিবা হরিষে।।
পূর্ব্বদিন অধিবাস ভোজ মধ্য দিনে।

শেষদিন প্রহরেক নাম সংকীর্ত্তনে।।

মহোৎসবে বাজে কথা কহিতে দিবে না।

খাবে আর হরিনাম গাবে সর্ব্বজনা।।

হরি ভিন্ন আর নাহি কর গণ্ডগোল।

শুধু মাত্র বলাইবা সুধা হরি বোল।।"[১৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে গোলক পাগল নিমন্ত্রণ শুরু করেন।

"সেই দিন হতে স্বামী গোলক পুলকে।

মহোৎসব নিমন্ত্রণ আরম্ভিল লোকে।"[১৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং মহোৎসবে গিয়ে মহোৎসবের নিমন্ত্রণ দেন সকল ভক্তকে। হরিচাঁদ ঠাকুরের নিমন্ত্রণ বার্তা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার জানাচ্ছেন—

"ওড়াকাঁদি মহোৎসব চৌধুরী বাটীতে।।

স্বয়ং মহাপ্রভু যান চৌধুরী আলয়।

নায়েরীর নিমন্ত্রণ পাগল জানায়।।

ঠাকুর বলেন সবে যাও কলাতলা।

মহোৎসব করিবেক একটী অবলা।।

আমি করিয়াছি আজ্ঞা কেহনা থাকিও।

নায়েরীর মহোৎসবে সকলে যাইও।।

অধিবাস দিন তথা গেলেন পাগল।

ক্রমে হরি বলা চলে বলে হরি বোল।।"[২০]

নায়েরীর মহোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহোৎসবের সেই বর্ণনার মধ্যে পাই নামকীর্ত্তনের ধরণ ও মহোৎসবের প্রসাদ বিবরণ। আর লোক পরিমাণ সংখ্যাও পাওয়া যায় তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকে।

"দিবা নিশী ক্ষান্ত নাই শুধু হরিধ্বনি।।

বাড়ির উপরে করিয়াছে এক স্থান।

সেখানে সকলে করে হরিনাম গান।।

কেহ বসে কেহ উঠে নাচিয়ে নাচিয়ে।

কেহ কেহ ভূমে পড়ে অচৈতন্য হয়ে।।

কেহ প্রেমে ধরা ধরি করে পড়া পড়ি।

কেহ কেহ কেঁদে কেঁদে যায় গড়া গড়ি।।"[২১]

এভাবে 'হরিবল' নাম করেন ভক্তগণ। একে 'নামকীর্ত্তন' বলা হয়। আর মহোৎসবে নায়েরী ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য তালিকা পাওয়া যায়। ও মহোৎসব উৎসবে 'ভীর' দেয় কেউ কেউ। কেউ হরিচাঁদ ঠাকুর বলে ডাকেন। কবি রসরাজের বর্ণনাটি হল—

"তাহার উত্তর পার্শ্বে ভোজনের ঠাই।

যখন যার যা ইচ্ছা খেতেছে সবাই।।

লাবড়া, অম্বল, ডাল ভাজা দধি চিনি।

খেয়ে খেয়ে সকলে দিতেছে হরিধ্বনি।।

কেহ ভীর দেয় বলে সাধু সাবধান।

ক্ষণে পিছাইয়া ক্ষণে হয় আগুয়ান।।

পাতা রাখি ভুমে কেহ এটে হাতে মুখে।

দাঁড়াইয়া বাবা হরিচাঁদ বলে ডাকে।।"[২২]

নায়েরীর মহোৎসবে লোক অনুমান করেছেন এভাবে—

"এই মত তিন দিন মহোৎসব হল।

.....

লোক পরিমাণ অনুমান করি সবে।

দু'হাজার লোক সে মধ্যের দিন হবে।।

শেষ দিন লোক হবে চারি পাঁচ শত।

ভোজন করিল হরিভক্তগণ যত।।

নায়েরীর পূর্ণ হল মনের বাসনা।

প্রেমে পুলকিত দেবী কাঁদিয়া বাঁচে না।"[২৩]

এভাবে ভক্তানায়েরীর বাড়ির মহোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই থেকে আজকের মহোৎসবের নিয়ম একভাবেই পালিত হয়ে আসছে।

হরিসভা মতুয়া ভক্তদের বাড়িতে পালিত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম গানের মাধ্যমে

হরিসভা পালন করে থাকেন মতুয়া ভক্তগণ। হরিচাঁদ ঠাকুরের বন্দনা পাঠ ও 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত', কীর্ত্তন করা হয়ও 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' পাঠের মধ্য দিয়ে হরিসভা পালন করেন। মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ নিয়েই আলোচনা নাম গান করে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণ করে থাকেন ভক্তগণ। প্রসাদ দেন ভক্তদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

শান্তিসভা : মতুয়া ভক্তা নারীরা শান্তিদেবীর স্মরণে শান্তি সভা পালন করে থাকেন। শান্তি মায়ের স্তবস্তুতি বন্দনার সাহায্যে ভক্তি নিবেদন করে নারীরা শান্তি সভা পালন করে থাকেন। কীর্ত্তন হয়। প্রসাদ সামর্থ অনুযায়ী ফল মিষ্টি পায়সান্ন ও ভাত, ডাল, তরকারী প্রসাদ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। পূজার ফুল দীপ চন্দন বাদ্যযন্ত্র কাসর, ঘন্টা, জয়ডঙ্কা, হারমনিয়াম, জুড়ি, খোল, করতাল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

'বুধবার পালন' মতুয়া ভক্তগণ বুধবারকে পালন করেন। এইদিন ঘর দ্বার পরিস্কার করে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রতি ঘরে ঘরে পূজা করা হয়। আর হরিসভা পালন করা হয় বুধবারে। বুধবার সন্ধ্যায় হরিসভার হরিবাসর বসেও ১০-১২ টার মধ্যে রাত হরিবাসর সম্পূর্ণ করেন।

এছাড়াও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন 'দোলযাত্রা'র দিন ভক্তরা পালন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয় হরিমন্দিরগুলিতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম তিথি হল—

''ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি দোল যাত্রা দিনে।
জন্মিল শ্রীগুরুচাঁদ অতি শুভক্ষণে।।
.....
বারশ চুয়ান্ন সালে শুক্রবার দিনে।
পূর্ব্বাকাশে দীনমণি প্রকাশের কালে।
সেই কালে গুরুচাঁদ জনম লভিলে।।''[২৪]

এই সুযোগ্য পুত্রই মতুয়া ধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিব্যাপ্ত করেন।

মহাবারুণী পালন :

মতুয়া ভক্তগণ 'মহাবারুণী' পালন করেন। মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের সবচয়ে বড় উৎসব

'মহাবারুণীর স্নান' উৎসব। 'মহাবারুণী' পালন করার ইচ্ছায় হরিচাঁদ ঠাকুর একদিন শ্রীধামে ভাবিকালের বারুণীর গুপ্ত অভিসার করেন। এয়োদশী বারুণী তিথিতে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয়। জন্মতিথি অনুযায়ীই মহাবারুণীর স্নান 'হরিবল' নাম কীর্ত্তন করে সম্পন্ন করেন মতুয়া ভক্তগন।

মহাবারুণীর দিন নির্ধারণ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের দ্বারা মহাবারুণী পালন শুরু হয়। বারুণীর গুপ্ত অভিসার করেছিলেন একদিন হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মক্ষণ এক মহা শুভলগ্ন। সেই শুভ কালের শুভ কর্ম দ্বারা সেই জন্ম সময়টিকে চির অমর হয়ে থাকবে মতুয়া ভক্তগণের কাছে। তথা মানব সমাজের কাছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মোৎসব হল মহাবারুণী। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম সময় থেকে মানুষের জীবন ভাগ্যাকাশ ও নির্মল পবিত্র হয়। ভক্তগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বৎসরের এই দিনগুলির জন্য। বারুণী মানে একটি দিন নয় অনেক দিন আগে থেকেই ভক্তগৃহে বারুণীর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। বারুণীতে যোগদান করার জন্য সমবেত আয়োজন হয়। আবার কোন কোন ভক্ত গৃহে বারুণীর আগের দিন সকল ভক্তকে মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে ভোজন করান। আবার কোন কোন ভক্ত বাড়িতে বারুণীর পরদিন মহোৎসব করেন ভক্তগণকে নিয়ে গিয়ে। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়িতে মতুয়া ভক্ত দলকে নিয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'শ্রীধামে ভাবি বারুণীর গুপ্ত অভিসার' থেকে জানা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের বারুণী পালনের রীতি-নীতি। হরিচাঁদ ঠাকুরের যে মহাবারুণীর মেলা মিলিয়ে ছিলেন গুপ্তভাবে সেই মহাবারুণী ও মহামেলাই গুরুচাঁদ ঠাকুর পরবর্তী সময় করেছিলেন। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্মে' বিচরণ পাগল হরিচাঁদ ঠাকুরের মহাবারুণীর পুণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। বিচরণ পাগলের মহাবারুণী সম্পর্কে তথ্যগুলিকে সবিস্তারে তুলে ধরছি আলোচনার সুবিধার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্নেহধন্য ভক্ত হলেন বিচরণ পাগল। বিচরণ পাগলের বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের মানবলীলা সম্বরণের আগে তাঁর এই অভিপ্রায় ছিল মনে। তারই প্রকাশ ঘটান গোপনে। তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে—

''একদা শ্রীহরিচাঁদ বসিয়া নিজ্জনে।
কে যেন কি ভাবিলেন আপনার মনে।।
আর কত কাল আমি থাকিব ধরায়।

হল বুঝি মম লীলা সাঙ্গের সময়।।

অতএব এক কর্ম করিবারে হয়।

ভাবিকালে সেই মেলা দেখিবে সবায়।।

.....

.....

মধুকৃষ্ণ এয়োদশী বার বুধবার।

সেই বুধবারে হল জন্ম আমার।।

.....

বারুণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে।

মহাবারুণীর স্নান জগতে ঘুষিবে।।

গুপ্তভাবে করিব বারুণীর অভিসার।

গুরুচাঁদ হতে পরে হইবে প্রচার।।"[২৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মহামেলার কীর্ত্তনের রীতিটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন বিচরণ পাগল—

"যেন কত অগণিত মতুয়ার দল।

দলে দলে আসিতেছে বলে হরিবল।।

জয় ডঙ্কা ঝাঁজ কাঁস খোল করতাল।

বাজাইয়া মতোগণে বলে হরিবল।।

বাদ্যোদ্দমে প্রকম্পিত যেন ভূমিতল।

মেঘের মণ্ডলে যেন দেবের বাদল।।

হরিবল রব বিনে অন্য বোল নাই।

কেহ কেহ দেয় হরিচাঁদের দোহাই।।

কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ গড়ি দেয়।

ভূমেতে পড়িয়ে কেহ করে হায় হায়।।

মিলেছে চাঁদের মেলা না হয় তুলনা।

হুলু ধ্বনি দেয় যেন বহুত ললনা।।

.....

.....

বসিয়ে করেছে তারা কীর্ত্তন শ্রবণ।

কাহারো বা বারি ধারা হতেছে পতন।।

বাল বৃদ্ধ পৌঢ় যুবা পুরুষ রমণী।

এক সনে করে যেন হরিনাম ধ্বনি।।

অগণিত লোক এল যেন সংখ্যা নাই।

ভূমি তলে পড়ি কেহ ছাড়িতেছে হাই।।

কেহ বা কীর্ত্তন মাঝে দিতেছে হুঙ্কার।

তা শুনিয়ে দূরে যায় চিত্ত অন্ধকার।।

হতেছে মধুর লীলা অপার অপার।

প্রেমের পাথারে সবে দিতেছে সাতার।।''[২৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর মহাবারুণীর মেলার সূচনা ঘটান এবং পরে পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর তা বাস্তবে ভক্তগণের সঙ্গে কাজে পরিণত করেন। পিতার অন্তরের অভিপ্রায় তথা গুপ্ত কাজ গুরুচাঁদ ঠাকুর বুঝতে পারেন। আর বারুণীর গুপ্ত কাজ গুরুচাঁদ ঠাকুর বুঝতে পারেন। বারুণীর গুপ্ত অভিসার গুরুচাঁদ ঠাকুরও দেখেছিলেন শোভনার সঙ্গে এবং ভাই উমাচরণও ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল কাজকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর পালন করেন মনে প্রাণে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের 'মহাবারুণী' পালনের নিয়মকে আমরা পাই যা বারণীতে পালন করা হয়। যেমন মহাবারুণীর আগের দিন সকল ভক্তগণ দল সাজান করে অর্থাৎ নিশান ডঙ্কা, ঝাঁজ, কাঁস, খোল সকল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে শ্রীধামে অথবা শ্রীহরিমন্দিরে যেখানে মহাবারুণী পালন হয় সেখানে চলেন 'হরিনাম' করতে করতে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা যে পিতার অভিপ্রায়কে কবে বাস্তবায়িত করতে পারবেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন 'শ্রীধামে মহাবারুণী মহালীলার গুপ্ত অভিসার' নামক অধ্যায়ে। কবির বর্ণনায় ধরা পড়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মনের অভিপ্রায়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছার প্রকাশ এখানে উল্লেখ করা হল—

''এই মেলা সুপ্রকাশ হবে কতদিনে।।

দেব নরে একাসনে করিবে কীর্ত্তন।

প্রেমাবেশে মত্ত হবে যত ভক্তগণ।।

কবে বা উড়িবে হরিনামের নিশান।

নেহারিয়ে সেই মেলা জুড়াইব প্রাণ।।

ঘাটে মাঠে কবে হবে নামসংকীর্ত্তন।

কবে আমি হেন ভাব করিব দর্শন।।

প্রবাহিত হবে কবে প্রেমের পরিধি।

প্রেম হিল্লোলে ধুয়ে যাবে বেদ বিধি।।

দলে দলে মতুয়ারা করিবে কীর্ত্তন।

প্রেম ভরে উলু দিবে যত রামাগণ।।

বহিবে প্রেমের বন্যা সম্মুখে আমার।

ভক্ত সঙ্গে মন রঙ্গে খেলিব সাঁতার।''[২৭]

পরদিন সকালে অর্থাৎ সারারাত 'হরিবল' নাম কীর্ত্তনের পর মহাবারুণীর দিন সকালে সকলে মহাবারুণীর স্নান করে শ্রীহরিমন্দিরে হরিচাঁদ ঠাকুরের ও শান্তিদেবীর পূজা করে সকল ভক্তগণ। এভাবে শ্রীধামে ও হরিমন্দিরগুলিতে মহাবারুণীর পালন হয়। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিপ্রায় হল—

''শুনিয়ে আনন্দ রোল জুড়াবে পরাণ।

পরেতে করিবে মহাবারুণীর স্নান।''[২৮]

'মহাবারুণীর পূর্বদিনে অভিসার' পর্বে বারুণীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ভক্তগণের কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। হরিভক্ত মতুয়া ভক্তগণের পরিচয় নেব—

''বারুণীর পূর্বদিনে, কোন মতুয়ার প্রাণে,

দিতে চাহে মতুয়া ভোজন।

হয়ে পুলকিত কায়, যার যাহা সাধ্য হয়,

সেই ভাবে করে আয়োজন।।

দূর দেশ হয়ে যত, আসে হয়ে দলগত,

সবে করে নাম সংকীর্ত্তন।

অগণিত ভাবে সবে, আইসে পরমোৎসবে,

কেহ কেহ করয়ে নর্ত্তন।।

....

.....

বৎসরান্তে একদিনে, দূর হতে মতোগণে,

ধেয়ে আসে নিশান হস্তেতে।

উচ্চরবে হরিনাম, সবে করে অবিরাম

জয়ডঙ্কা শিক্ষা ধ্বনি তাতে।''[২৯]

মতুয়া ভক্তকে সকলে সেবাযত্ন করতে চায় ভক্তি করে। তার পরিচয় পাই এই কয় ছত্রে—

''তোমাদের কৃপাগুণে, আনন্দ পাইব প্রাণে,

অন্তরেতে হবে প্রেমসুখ।

পাইয়ে চরণ ধূলি, আমাদের বংশাবলী,

সবাকার ঘুচে যাবে দুঃখ।।

পথে ঘাটে যে যেখানে, পাইবে মতুয়াগণে,

যত্ন করি নিজ গৃহে নিয়ে।

মুড়ি চিড়া চিনি দধি, তাহার নাহিকো বধি,

সেবা হৃষ্ট চিত্ত হয়ে।।

....

.....

কোথা করে জল ছত্র, মিলিয়ে যতেক ছাত্র,

জ্ঞানীজন থাকে তার পিছে।

আশাপথ পানে চেয়ে, থাকে সবে হৃষ্ট হয়ে।

ঘবে মতো গণ আসে কাছে।।

হয়ে অতি প্রফুল্লিত, মতুয়ার পদধৌত,

করে অতি সযতন করি।

অতি আনন্দিত হয়ে, হস্তেতে বাতাসা দিয়ে,

এনে দেয় সুবাসিত বারি।।

....

.....

আসিতে যাইতে পথে, সেবা করে হেন মতে,

সে ভাবের নাহিক তুলনা।।"[৩০]

রামচাঁদ চৌধুরীর অন্তরের অভিপ্রায় ঠাকুরের জন্মতিথি ধরে 'হরিনাম' গানে সকল ভক্ত মিলে হরিচাঁদ ঠাকুরের স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চান। এই অভিপ্রায় অনেক ভক্তগণ মিলিত হয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে জানান হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি পালনের জন্য। ভক্তগণের অভিপ্রায় এক যোগে পালন করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সকল ভক্তগণ সম্মিলিত হয়ে একথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র জানার পর কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বারুণী যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য বাদ্যযন্ত্র নামের নিশান ও বড় বড় তালপাতার পাখা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার গঠন করে ও হরিভক্তগণসহ সদল বলে ওড়াকাঁন্দি যাত্রা করেন। কবিরসররাজ তারকচন্দ্র সরকারের দলের বর্ণনা করেন বিচরণ পাগল। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত। এমনকি কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারকে সকলেই ভাল বাসতেন। হরিমন্দিরে প্রত্যেক বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর ঘট স্থাপনের আগে ভক্তগণের বাড়িতে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের নামের নিশান পূজা করা হয়। প্রথমেই ভক্ত কবি তারকচন্দ্র সরকার নামের নিশান উত্তোলন করেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের মতুয়াদল গঠনের বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী গঠনের কথা বিচরণ পাগল এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"শ্রীহরির প্রেমের মেলা শ্রীধামেতে হবে।

মতোগণে পাবে শান্তি বারুণী উৎসবে।।

বাজিবে বিজয় ডঙ্কা নিশান উড়িবে।

এসব প্রস্তুত মোর করিতে হইবে।।

বড় বড় পাখা আমি করিয়া লইব।

দলবল সাজাইয়া বারুণীতে যাব।।

.....

জয়ডঙ্কা ঝাঁজ কাঁস খোল করতাল।

শিঙ্গা ধবনি করে সবে শুনিতে রসাল।।

এই সব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল।

অতঃপর শ্রীতারক নিশান উড়াল।।

প্রথমেই এই সব আবিস্কার হল।

নামের নিশান সেই তারক উড়াল।।

.....

শব্দ হল তারকচাঁদের দল এল।

সবাই আনন্দ রসে ভাসিয়ে চলিল।।

পাখা হাতে কেহ কেহ দিতেছে বাতাস।

কীর্ত্তনেতে সবাকার বাড়িল উল্লাস।।

চারিদিকে সবে বলে জয় জয় জয়।

শ্রীহরিচাঁদের জয় গুরুচাঁদ জয়।।

.....

রামচাঁদ চৌধুরীর আনন্দ ধরে না।

মালু বলে হেন দিন আর তো হবে না।।

.....

প্রথম প্রকাশ এই হইল বারুণী।

দেশে কি বিদেশে গেল সেই ধ্বনি।।"[৩১]

প্রথমে এভাবে বারুণী আরম্ভ হয়েছে আজ ধর্ম বর্ণ জাতি নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্রিত হয় মহাবারুণী উৎসবে। বারুণীতে যাওয়া উৎসব এক মহামিলন মেলা। এক কথায় মতুয়া ভক্তদের সবচেয়ে বড় উৎসব হল হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি পালন মহাবারুণীর স্নান উৎসব বা বারুণীর মেলা।

মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক কাজের নিয়ম :

সামাজিক জীবনে মানুষের অনেকগুলি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম থাকে। যেমন—বিবাহ,

মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, শিশুর নামকরণ, অন্নভোজন বা মুখেভাত, গৃহপ্রবেশ ও সামাজিক অন্যান্য কর্মগুলি মতুয়া ধর্ম মতে মতুয়া আচার্য বা মতুয়া গোঁসাইগণের দ্বারা করেন মতুয়া ভক্ত মানুষেরা।

বিবাহ পদ্ধতির নীতি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী :

বিবাহ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'দধিমঙ্গল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বিবাহের দিন খুব ভোরবেলা বর ও কন্যার স্বস্ব বাসভবনে দৈ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান করে, বিবাহের দিনের ক্রিয়া পদ্ধতির আরম্ভ হয়।

অদিবাসের স্নান করানো হয় বর ও কন্যার নিজের বাড়িতে। সেখানে জলবরণ করে জল তোলা হয় তারপর বাড়িতে বসে গায়ে হলুদ দিয়ে ত্রয়ো স্ত্রীগণ মঙ্গলাচারে স্নান করান বরও কন্যাকে। বিবাহ স্থির হলে বরের বাড়িতে বর কর্তা ও কনে কর্তা ঘট মঙ্গল করে বিবাহ পাকা করে।

বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি :

কন্যার জন্য শাঁখা, বর কন্যার নববস্ত্র, মঙ্গল ঘট, ফুলের মালা, ফুল, তিল তুলসী, বেলপাতা, কাঁচা হলুদ, গ্রন্থি বন্ধনের লালচেলি, লাল সূতা, ধান-দূর্বা, যব, হরিতকি, আমলকি, বহেরা, সুপারি ও জায়ফল। বরের টোপর, কনের মুকুট, আশীর্বাদী কুলা ১টা, প্রদীপ, ধূপদানী, ধূপকাঠি, চন্দন ইত্যাদি।

বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম :

নান্দীমুখ বা বৃদ্ধি শ্রদ্ধানুষ্ঠান। নান্দীমুখ অনুষ্ঠানে প্রয়াত গুরুজনদের স্মরণ-মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই হলো বৃদ্ধি শ্রদ্ধা বা নান্দীমুখ।

বিবাহ আসর সাজান হয় কনের বাড়িতে। বরযাত্রীসহ কন্যার বাড়িতে যায় ও সেখানেই বিবাহ হয়। মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয় হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর। যেখানে বসে, মতুয়া আচার্য বা মতুয়া গোঁসাই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বিবাহের নিয়মানুসারে সাতপাক প্রদক্ষিণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল ও হৃদয় বিনিময়, সিঁদুর পরানো, গ্রন্থিবন্ধন ও সকলের সমবেত

প্রার্থনায় ও আশীর্বাদে বিবাহ অনুষ্ঠান কাজ সমাপ্ত হয় ও সরকারী নিয়মানুযায়ী রেজিট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়ায় মতুয়া বিবাহেও এই নিয়ম অবশ্যই পালন করেন। কখনো বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে কোথাও সেই দিনে ম্যারেজ রেজিষ্টার দিয়ে করানো হয়।

বিবাহ সমাপ্ত হবার আগে ও পরে কন্যার পিতা যথাসাধ্য অনুযায়ী বরযাত্রী ও আত্মীয়দের সম্মান পূর্ব্বক ভোজনের আয়োজন করে ভোজন করান। বরকর্তার পিতা ও গুরুজনগণও যথাসাধ্য তার আত্মীয়-পরিজনকে ভোজন করান বিবাহ উপলক্ষে, বিবাহ করে আসার পর। বৌভাতের বা পাকপরশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

মতুয়া ধর্মাদর্শে শুভ বিবাহের একটি উদাহরণ তুলে ধরলাম। ''গত ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৪১৭ (ইংরাজি ২৮শে ডিসেম্বর ২০১০), বুধবার চিংড়ীঘাটা, কল্যাণ সাউথ রোড, পো: নাওভাঙা, কলমাতা ১০৫ নিবাসী শ্রীমুকুন্দ মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় ধ্রুবজ্যোতির সহিত মুড়াগাছা, নদীয়া নিবাসী শ্রীশ্যামাপদ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা বিউটির শুভ বিবাহ মতুয়া আদর্শ মতে ড. বিরাট কুমার বৈরাগ্য মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়।''[৩২]

শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন :

মতুয়া ধর্মানুযায়ী মৃত ব্যক্তির প্রতি রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন করেন। মতুয়া ধর্মানুযায়ী মৃতদেহকে সমাধি ও দাহ করা হয়।

মৃত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে পরিবারের ও গ্রামের আত্মীয় পরিজন একত্রে মিলিত হয়ে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে। সুন্দর সাজ সজ্জায় সজ্জিত করে সযত্নে দোলা বা চৌকিতে করে শবদাহ শ্মশানে বা সমাধি স্থানে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে নববস্ত্র ফুলের মালা চন্দন ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলিত করে শেষ কৃত্য হিসাবে দাহ বা সমাধি দেওয়া হয়। 'হরিবল' ধ্বনিতে ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় সমাধি ক্ষেত্রে।

মৃত ব্যক্তির পুত্ররাও পুত্রবধূগণ ও কন্যা সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতার প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেই নিয়মাবলী হল—

পুত্ররা দশ দিন যাবৎ পিতার উদ্দেশ্য নিয়ম পালন করে। বিবাহিত কন্যা চারদিনে পিতা মাতার শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন করে। দশদিন পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণ একবার হবিষান্ন আহার করে। ও এক বস্ত্রধারী হয়। ও দশদিন সাধারণত কম্বলে মেঝেতে ঘুমায়। ও সন্ধ্যায়

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের আরাধনা করেন। দশদিনে 'দশা' পালন করে ক্ষুরকর্ম করে সকল শ্মশান যাত্রীদের ও দশার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন মতুয়া ধর্মানুসারে কোন মতুয়া গোঁসাই বা আচার্য দ্বারা। একাদশ দিনে শ্রদ্ধানুষ্ঠান পালন ও মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে ভোগরাগ নিবেদন করা হয়। মতুয়া বিধানানুসারে। দ্বাদশ দিনে বিশ্রাম ও 'শ্রীহরিলীলামৃত' পাঠ। এয়োদশ দিনে শ্রদ্ধানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ভোজন করান গৃহকর্তা সাধ্যানুসারে মতুয়া মতে গৃহ নির্মাণের পূজা, গৃহ প্রবেশ, শিশুর নামকরণ, শিশুর মুখে ভাত বা অন্নপ্রাসন করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক ক্রিয়ার সকল কাজই মতুয়া ধর্মানুসারে করেন মতুয়া ভক্তগণ।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৫. হালদার, আচার্য মহানন্দ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭৩।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪।

৭. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

৮. হালদার, আচার্য মহানন্দ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭২-৫৭৩।

৯. রায় ঠাকুর, নবকুমার—শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ নিত্য পূজা বিধি, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

১০. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

১১. সরকার, শ্রীঅশ্বিনীকুমার—শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত, দ্বাবিংশতিতম সংস্করণ, বারুণী মহামেলা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, ২০১০, পৃ. ৩-৪।

১২. রায় ঠাকুর, নবকুমার—শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ নিত্য পূজা বিধি, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

১৩. হালদার, আচার্য মহানন্দ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪।

১৬. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৫।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৪. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ৩২।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

২৭. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৬।

২৮. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ৩৪।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

৩২. শ্রীহরি যুগ দিশ, পৃ. ১১।

চতুর্থ অধ্যায়
সমাজ সংগঠনে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ হরিবোলা 'মতো' নামে আখ্যায়িত। হরিনাম কৃষ্ণনাম ছিল এক ও অভিন্ন ভক্তি ভাবনা। কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুরকে তৎকালীন সমাজের বহুভক্ত মানুষেরা 'হরি' অবতার বলে ভক্তি করেছে এবং 'হরিবল' নামে জোর দিয়েছেন তৎকালীন ভক্ত মানুষগুলি। 'হরিনাম'কারী সকলকে হরিবোলা 'মতো' বা 'মতুয়া' উপাধি দিয়েছে গ্রামবাসীগণ। সেই যে মতুয়া উপাধিতে ভূষিত হলেন হরিনামে মত্ত মানুষগুলি তা কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুর মেনে নিলেন। আর ভক্তদের মধ্যে ভক্তির প্রাবল্য জনিত কারণেই এই মত বিরোধ ঘটেছে আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভক্ত মানুষগুলিকে 'হরিবোলা' 'মতো' নামে অভিহিত করলেন, সেই থেকে তাদের নাম মতুয়া হয়েছে। 'মতুয়া' মানুষগুলির ভক্তি ভাবনার জন্য দরাকর সমাজ বিধি, ধর্ম ভাবনার গতি প্রকৃতি ও সমাজ মানুষের সার্বিক পরিকাঠামো। এই ভক্ত মানুষগুলি সমাজ কীভাবে সামগ্রিক জীবন যাপন করবেন সেই সমস্তই নিয়ম রীতি কীভাবে গঠিত সেগুলিই আমার এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

'মতুয়া' খ্যাতির আগেই হরিচাঁদ ঠাকুরের 'হরি' রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে ছিল মানুষের কাছে। 'রাউৎখামার গ্রামে প্রভুত্ব প্রকাশ ও ভক্ত সঙ্গে নিজালয় গমণ' অংশের থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত মানব সমাজে 'হরিঅবতার' রূপেই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে ছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার তাঁর আকরগ্রন্থ 'শ্রশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে ভক্ত মানুষের ভক্তির বর্ণনা করেছেন—

''আত্ম সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হলেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ।।
শ্রীবংশী বদন আর শ্রীরাম সুন্দর।
বাসীরাম কাশীরাম শ্রীরামকিশোর।।
বালাদের বাড়ী দিন দুদিন থাকিল।
বালারা সগণ সহ মাতিয়া উঠিল।।

ভক্তগণ সঙ্গে করি হরিপ্রেম রসে।

নাম গান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে।।

দেশভরি শব্দ হল মধুর মধুর।

যশোবন্ত ছেলে হরি হয়েছে ঠাকুর।।

রোগ যুক্ত লোক যত প্রভু স্থানে যায়।

কীর্ত্তনের ধূলা অঙ্গে মাখিবারে কয়।।

অমনি সারিয়া ব্যাধি করে সংকীর্ত্তন।

কেহ বা লোটায় ধরে প্রভুর চরণ।।"[১]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে একেবারে প্রথমাবস্থায় যাঁরা হরিচাঁদ পারিষদ বলে খ্যাত হয়েছিলেন তাদের বহু ভক্তের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য। ভক্ত হৃদয় সর্বদাই নিজ অনুরূপ ভগবানের সন্ধান করে। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের বাল্যাবস্থা থেকেই কয়েকজন ভক্ত মানুষ ছিল তাঁর নিত্য সহচর। তার পরবর্তী সময়ে ওড়াকাঁন্দি বাসকালে আর অনেক মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাথি ছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পারিষদের প্রথমাবস্থার একটি বর্ণনা করেন যা থেকে আমরা জানতে পারি 'মতুয়া' খ্যাতির পূর্ববর্তীকালের ভক্তগণ ও তৎসময়ের ও তৎপরবর্তীকালের অগণিত মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনায় যুক্ত হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত 'সূক্ষ্মসনাতন ধর্ম' পালন করতে শুরু করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর কখনো একা কোন কাজ করেন নি, তার সহযোগী মানুষের অভাব হয়নি কর্ম সম্পাদনের জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে ভক্তদের যে ধর্ম দর্শন দান করেন তা সকলেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। যে ভক্ত মানুষগুলি তাকে ভগবান বলে বিশ্বাস করতেন তারা সর্ব প্রথমেই তাকে 'হরি অবতার' গ্রহণ করেন নি। হরিচাঁদ ঠাকুরও ভক্তদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন বহুবার বহুভাবে। আর একথা প্রায় বেশিরভাগ ভক্তদের সম্পর্কেই বলা যায়। পরীক্ষার পর ভক্তদের কাছে তিনিই হলেন ভক্তের ভগবান হরিচাঁদ ঠাকুর। এমনকি 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা কবিরসরাজ তারক চন্দ্রও ঠাকুরকে পরীক্ষা করেছিলেন। কবি তারকচন্দ্র সরকার একাধারে ভক্ত এবং শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে ভক্তদের কাছে পরীক্ষিত হয়েছিলেন সেই পরীক্ষাগুলিতেই হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটিকে পাব যিনি মানবতার যথার্থ পূজারী। তারকচন্দ্র সরকার প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং বলে স্বীকার করেন নি। তারকচন্দ্র সরকার

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে শাস্ত্র অধ্যায়ন করতেন। তার কাছে জানতে পারেন যে 'হরি অবতার' কিন্তু তারকচন্দ্র সরকারের মনে বিশ্বাস হয় না যে স্বয়ং 'হরি' অবতার হয়েছে। একথাও তারকচন্দ্র সরকার বলেন গৌরাঙ্গের পর আর কোথায় অবতার। তখন অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাস করানোর জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মহাশয় তারকচন্দ্র সরকারকে সঙ্গে নিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরকে দর্শনের জন্য নিয়ে যান ওড়াকাঁন্দি। হরিচাঁদ ঠাকুরকে তারকচন্দ্র সরকার দেখেছেন যেমন তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ংস্বরূপ বলে বিশ্বাস করেছেন। পরবর্তীকালে তারকচন্দ্র সরকারই 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচনা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনের পূর্ণাঙ্গ কাহিনিটি তুলে ধরলাম আলোচনার সুবিধার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে তারক ছিল বড় আদরের ধন। হরিচাঁদ ঠাকুর তারকচন্দ্র সরকারকে খুব স্নেহ করতেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল ভক্ত মানুষই তারকচন্দ্রকে বড় ভালো বাসতেন। তারকচন্দ্র সরকারের আত্ম পরিচয়টিও হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শন প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জীবন সম্পর্কেও কতকটা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে তারকচন্দ্র সরকারের হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শন অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরলাম—

''কাশীনাথ নামে সাধু জিলা যশোহরে।
নমঃশূদ্র জাতি গ্রাম জয়পুরে।।
তাহার নন্দন আমি অতি অভাজন।
শ্রীতারক সরকার জানে সর্ব্বজন।।
মৃত্যুঞ্জয় পদসেবী তাহার আশ্রিত।
তাঁর কৃপাক্রমে চিনি বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত।।
সেই প্রভু মোর কাছে কহে সমাচার।
'তারক রে জান নারে হরি অবতার।'
আমি বলি 'প্রভু যদি ইহা সত্য হয়।
সেই হরিচাঁদে আমি দেখিব নিশ্চয়।।
অবতার হলে আছে লক্ষণ তাহার।
গৌরাঙ্গের পরে পুনঃ কোথা অবতার?
সাধক মহান্তকেহ মহাশক্তিশালী।

ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ হরি হরি বলি।।'

মৃত্যুঞ্জয় বলে 'তুমি জাননা তারক।

পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদ ভূবন পালক।।

যদি না বিশ্বাস কর মোর সাথে চল।

দেখিলে বুঝিতে পাবে জীবন সফল।' ''[২]

তারকচন্দ্র সরকারের সফল জীবন সত্যই হল। তিনিই হলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের বিশ্বাসের প্রিয় পাত্র। মৃত্যুঞ্জয় কথা শুনে তারকচন্দ্র সরকারের হৃদয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনের আগ্রহ জাগ্রত হল এবং পরদিন যাওয়ার জন্য মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়কে বললেন—

''এত কথা শুনি মনে আগ্রহ হইল।

মৃত্যুঞ্জয়ে বলি প্রভু ওড়াকাঁদি চল।।

ওড়াকাঁন্দি উপনীত হই পরদিনে।

দূর হইতে শ্রীমূর্ত্তি দেখিনু নয়নে।।

উজ্জ্বল শ্যামল কান্তি নিবু নিবু আভা।

রক্ত রাগ যুত পদ বরণীয় শোভা।।

দীর্ঘ কেশ দীর্ঘভুজ আয়ত লোচন।

মরি! মরি! হাসি হাসি প্রফুল্ল বদন।।

বসিয়া আছেন প্রভু ধ্যান মগ্ন প্রায়।

মহাভাব সমাধিস্থ মহাভাব ময়।।

বিরহিনী নদী যথা সাগরে মিলায়।

মমচিত্ত গঙ্গা তথা শ্রীপদে লুটায়।।

নয়নের জলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইল।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণ তাহে ভাসিয়া উঠিল।।

অষ্টবজ্র ধ্বজ চক্র সব দেখা যায়।

বক্ষেতে কৌস্তভ মণি পদে গঙ্গা বয়।।

ভুলিনু জগৎ হেরি জগদিষ্ট রূপ।

নিশ্চয় বুঝিনু হরি স্বয়ং স্বরূপ।।

কৃপা করি বাণীনাথ কহে মোরে বাণী।

'তুইরে ময়নার ছা' তারক বাছানি।।

কার পোষা পাখী তোর তাহা মনে নাই।।

মৃত্যুঞ্জয় তোরে আনে তাই তোরে পাই।।

যাও বাপ ঘরে যাও কর কাজ কর্ম।

সংসারের মোহে যেন ভুলিও না ধর্ম।।

তন্দ্রমন্ত্র ভেক্ ঝোলা সব ধাধাবাজী।

পবিত্র চরিত্রে থেকে হত্ত কাজে কাজী।।

সেই হতে রচি পদ 'কাজ কি মন্ত্রবীজে।'

হরি রবি কিরণেতে মধু চিত্ত মাঝে।।''[৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর তারকচন্দ্র সরকারের মনোবাঞ্ছিত ভগবানের চিত্রকে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সেই তারকচন্দ্রই হলেন পরবর্তীতে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় পাত্র এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের ও প্রিয় ছিলেন তারকচন্দ্র সরকার। এমনকি তৎকালীন সকল মতুয়া ভক্তগণ তারকচন্দ্রকে বড় স্নেহ করতেন। এই তারকচন্দ্র সরকারকে দু'জন গ্রন্থ রচনা কালে যা বলেছেন তা থেকেই বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শও ধর্মাদর্শের পরিচয়। গোস্বামী গোলকচন্দ্র ও বড় ভাল বাসতেন প্রিয় তারককে। কবি নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত সকলের প্রিয় ছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারকে গ্রন্থ রচনার জন্য 'বর' প্রদান করেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারেই তারকচন্দ্র লিখতে সম্মত হন এবং গোলক গোস্বামীও বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা কথা লিখে দিতে। গোলক গোস্বামী যা তারককে বলেছিলেন সেই কথাই কবি গ্রন্থ রচনার প্রথমে বলছেন—

''মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর মহানন্দ।

তোরে করে ফেলাফেলি তাদের আনন্দ।।

শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।

লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে।।

যা দেখিস যা শুনিস তাহাত লিখিবি।

না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি।।

কোন ঠাঁই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।

আরোপে দেখিবি হরি-চরণার বিন্দ।।

অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে প্রেমানন্দ।

হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র।।"[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত সমাজের কাজ যেভাবে করেছিলেন তাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। কারণ তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক হওয়ায় তিনি বেশির ভাগ সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে অনেক কাজের সাক্ষী হয়েছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার অনেক সময় ওড়াকাঁদির ঠাকুর বাড়িতে থাকতেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তালয় ও গমন করতেন ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মদর্শ ও মানুষের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা সর্বংশেই সত্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভক্ত 'লালচাঁদ মালাকারের উপাখ্যান' থেকে বোঝা যায় তারকচন্দ্র সরকারের সঙ্গে ঠাকুরের আত্মিক সম্পর্ককে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে—

".....

একদা সকালে প্রভু বসিয়া নির্জনে।

একমাত্র তারক বসিয়া প্রভু স্থানে।।

হরিচাঁদ কহিলেন তারকের ঠাঁই।

চলরে তারক মোরা রাজপাট যাই।।

রাজ পাট লালচাঁদ কট করিয়াছে।

আমাকে খাওয়াবে আম সে খাইবে পাছে।।"[৫]

সমাজ সংগঠন সম্পর্কে 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' বা মতুয়া ধর্ম কি ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন সময়ে সেই সমাজ সংগঠন আজকের যুগে কতটা কার্যকারী বা যুগপোযোগী মানুষের। সেই সময় সমাজে কীভাবে মতুয়া ধর্মের প্রসার ঘটেছিল তার আলোচনা তারকচন্দ্র সরকার ও তাঁর কিছু পরবর্তীকালের লেখকগণ তাদের রচনাবলীতে ব্যক্ত করেছেন। 'মতুয়া' ধর্মের সঙ্গে সবসময় সরাসরি ভাবেই যুক্ত থেকেছেন, এই ভক্ত লেখকগণ সর্বপরি একথা বলে আরও নিশ্চিত হব যে লেখকগণ সকলেই 'মতুয়া' ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মই পালন করছেন।

সেই সকল লেখকদের আকরগ্রন্থ থেকেই সমাজ সংগঠনে 'মতুয়া' ধর্মের প্রভাব আলোচনা করব। প্রথমেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা অনুযায়ী সমাজ সংগঠন ও তারপরে গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই পূর্ব ভাবনা অনুযায়ী সমাজ সংগঠন করে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরও ভক্তগণের বিভিন্ন কার্যাবলীর পরিচয় গ্রহণ করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য সমাজ সংগঠনে মতুয়াধর্মের ভূমিকাকে কয়েকটি ভাগ করে আলোচনা করব। যথা—

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা :

ঊনবিংশ শতককে নবজাগরণ কাল বলা হয়। এই নবজাগরণ মানুষের নবচেতনার উন্মোচন ঘটায়। মানুষ এই সময় থেকে ধর্মভাবনাকে যুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা করে সেই আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হল কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুর এই পাশ্চাত্য জ্ঞান বা শিক্ষা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হন নি একথা সর্বাংশেই সত্য যেমন তেমনি ভাবে একথা বলা যায় তিনি যেভাবে মানুষের মানবতা বোধের আত্মজাগরণের জন্য কাজ করলেন তা উনিশ শতক কেন সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত খুঁজলেও তাঁর মতো কাজ বিরল। মানুষের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রথম থেকে প্রয়োজন তার জন্য ভেবেছেন মানুষের জীবনের উপযোগী করে। এদিক থেকে তাকে এক এবং অদ্বিতীয় বলাই যায়। এবার হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

'ভক্তগণের মহাসংকীর্ত্তনোচ্ছাস' পর্বে দেখা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের অগণিতভক্তের মধ্যে কয়েকজনকে তারকচন্দ্র সরকার পূর্ব পারিষদ বলে ব্যক্ত করেছেন। ভগবানের দর্শন পেলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ হয় এই চিরাচরিত বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখব তিনি মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ কীভাবে করেছেন। কবির বর্ণনায় ভক্তগণের পরিচয় পাই—

"……

প্রেম অনুরাগে সব ভকত জুটিল।

'মতুয়া' বলিয়া দেশে ঘোষণা হইল।।

মঙ্গল নাটুয়া বিশে পূর্ব্ব পারিষদ।

ওড়াকাঁন্দিবাসী পারিষদ রামচাঁদ।

ভজরাম চৌধুরীর ছোট ভাই যেই।

ঠাকুরের ঐকান্তিক পারিষদ সেই।।

কুবের বৈরাগী রামকুমার ভকত।

প্রভুর ভকত সেই হয়েছে ব্যকত।।

গোবিন্দ মতুয়া আর স্বরূপ চৌধুরী।

প্রেমাবেশে ভাবে মেতে বলে হরি হরি।।

চূড়ামণি বুধই বৈরাগী দুই ভাই।

হরিচাঁদ পেয়ে আনন্দের সীমা নাই।।"[৬]

ভক্তগণ মিলে একসঙ্গে 'হরিনাম' করার সময় কীভাবে পার হত তা ভক্তগণ বুঝতে পারতেন না। ভক্তগণ এতটাই নাম গাণে মত্ত হয়ে থাকত একথা কবির বর্ণনায় এভাবে ধরা পড়েছে—

"ভক্তগণে হুঙ্কারিত বলে হরিচাঁদ।

সে ধ্বনি শ্রবণে যেন মত্ত সিংহ নাদ।।

সবলোকে মত্ত হয়ে দিত হরিধ্বনি।

তাহাতে হইত যেন কম্পিতা মেদিনী।

কেহ না জানিত দিবা কীভাবেতে গেল।

না জানিত যামিনী কীভাবে গত হল।।"[৭]

দিবস রজনী ব্যাপি নাম গান করতে করতে মানুষ ভক্তির দ্বারাই আপ্লুত থাকতেন। আর এই ভক্তি ভাবনার দ্বারাই প্রথম হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে একত্রে সংঘবদ্ধ করলেন। তাদের সঙ্গে তিনি একত্ম হয়ে মিশে গেলেন। এভাবেই তিনি মানুষকে একান্ত আপনার জন করে তুললেন যেমন অপরদিকে সকল ভক্ত মানুষেরও তিনিই একমাত্র স্মরণ্য হলেন তার কর্মের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম সময় থেকেই প্রায়ই ভক্তদের সঙ্গে ভ্রমণ করতেন এবং নিজ বাড়িতে অল্প সময়ই বাস করতে পারতেন ভক্তদের জন্য। ভক্ত মানুষদের সঙ্গে থেকেই তিনি তাদের আত্মীক উন্নতি, পারিবারিক উন্নতি এবং শারীরিক সুস্থতাকে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের যে সার্বিক উন্নতিকরণ মূলক কাজ করেছিলেন সেগুলিকে যদি এভাবে ভাগ করে আলোচনা করি—

মানুষের আত্মীক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র গঠন।

শারীরিক সুস্থতার জন্য বিধি ব্যবস্থা দিতেন।

পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার জন্য কর্ম প্রণালীর শিক্ষা।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে যে সকল ভক্ত মানুষ গ্রামে সমাজে প্রচার করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে প্রসার করেছিলেন তারা সেই সময়ের এক একজন মহাধর্মবান মানুষ ছিলেন। অগণিত মানুষের মধ্যেও হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মগত ভক্তদের নাম না করলেই নয়। যারা তারা প্রত্যেকেই 'মতুয়া' ধর্মে কেউবা পাগল কেউবা গোঁসাই কেউবা ঠাকুর আখ্যায় ভূষিত ছিলেন মানুষের কাছে তাদের কর্মের দ্বারা। এই মানুষগুলি হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেই তাদের জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মানুষেরা হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মবিক্রিত হয়েছিলেন কোন না কোনভাবে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণকারী মানুষ। এরা হলেন—ক. গোলক গোস্বামী, খ. হীরামন গোস্বামী, গ. লোচন গোস্বামী, ঘ. দশরথ বিশ্বাস, ঙ. মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, চ. বদন ঠাকুর, ছ. গোলক কীর্ত্তনীয়া, জ. তারকচন্দ্র সরকার, ঝ. দশরথ বৈরাগী। এরা সকলেই ছিল মহাসাধু যারা ধর্ম-কর্ম সাধনার দ্বারাই ব্যক্ত হয়েছিলেন। এই মানুষগুলি হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক এবং এরা হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে 'হরিনাম' প্রচার করেন এবং তাঁর আর্দশগত মতকে মানুষের মাঝে প্রচার করে আত্মীক উন্নতির সঙ্গে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা দিতেন যাতে মানুষের শারীরিক ব্যাধিও মুক্ত হওয়ার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকে যারা বহন করতেন তাদের নিয়েই সার্বিক কল্যাণ কথা আলোচনাও সকল ভক্ত মানুষকে নিয়েই চলতেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

মানুষের আত্মীক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র গঠনে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা :

'মতুয়া' ধর্ম সম্প্রদায় একটি নব সম্প্রদায় রূপে বিভক্ত হয়ে দেখা দিল। সেই 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত ভক্ত মানুষগুলির প্রাণ পুরুষ হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে তারকচন্দ্র সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—

''সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙ্ঘি এবে করিলেন স্থূল।

শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।

জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।

এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।

জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।"[৮]

মানুষের নিত্য কর্তব্য হিসাবে হরিচাঁদ ঠাকুর যে নিয়ম পালন করার নির্দেশ দেন তা জীবন গঠনের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশাবলী 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এবং এই দ্বাদশ আজ্ঞা প্রত্যেক 'মতুয়া' ভক্তের পালন করাই হল জীবন গঠনের মূল দিক। এছাড়াও অবশ্য পালনীয় কর্ম রয়েছে। যা মানুষকে আদর্শ গৃহ জীবন পালনের মধ্যেই ধর্মাচরণ করে মানুষ মহামানব পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। আলোচনা ক্রমে সকল দিকগুলিকে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরব।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা :

প্রথম আজ্ঞা : সদাসত্য কথা বলবে।[৯]

মানুষ হল এমন একটি জীব যার কথা বলার ভাষা আছে, লিখবার ক্ষমতা আছে। সেই মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পূর্ণতা পাওয়ার জন্য সর্বদাই সক্রিয় হতে হয়। আর মানুষ জন্মানোর এক বছর বয়স থেকে তার কথার মাধ্যমে তার অভিমত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়। সেই বাল্যকাল থেকেই তাকে সত্য বলার মধ্যে বড় করলে তার জীবন সত্যের আদর্শেই গড়ে উঠবে। মানুষের জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে সত্য বলার অভ্যাস থাকলে জীবন সত্যের জ্ঞান আলোক দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। সত্য কথা, সৎ কর্ম এবং সৎ পথে চলা মানুষের মানবিক মেরুদণ্ড স্বরূপ।

দ্বিতীয় আজ্ঞা : পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান করবে।[১০]

হরিচাঁদ ঠাকুর এই দ্বিতীয় আজ্ঞায় পুরুষ চরিত্রকে যথার্থ পুরুষ হওয়ার কথা বললেন। মানুষের যৌবনকালটাই যেমন কর্ম বিকাশের যথার্থ সময় তেমনি এই সময় আবার 'কাম' বা 'কামনা' চরিতার্থরও আদর্শ সময়। তাই পুরুষের চরিত্রকে কলুষতা মুক্ত করতেই তিনি বললেন পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান করতে।

অপরদিকে যদি কথাটিকে এভাবে আলোচনা করি তাহলে সমাজ জীবনে নারীরও যথার্থ কর্তব্য রয়েছে। একজন নারীও যদি নিজ স্বামী ছাড়া অন্যকে পিতৃ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করার

কথা ভাবে তাহলে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই পূর্ণ যৌবনের ভোগাকঙ্খা থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থ মনুষ্যত্ব বোধের স্তরে পৌঁছাতে সম্ভব হবে। যৌবনে কর্মময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে ও পুরুষ ও নারী যথার্থ মানব চরিত্রের উপযোগী হবে।

তৃতীয় আজ্ঞা : পিতা মাতাকে ভক্তি কর।[১১]

হরিচাঁদ ঠাকুর এই কথার মর্মার্থ এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"পিতা-মাতা গাছের গোড়া হরি গাছের ফল
গাছের গোড়ার জল না দিয়া কোথায় ঢালো জল।"

সন্তান মাতা পিতার আদরের ধন। সন্তানের শুভ চিন্তাকারী, শুভ কর্মকারী মানুষ প্রথমেই বাবা ও মা। তাই বাবা-মাকে শ্রদ্ধা সন্তানের সহজাত কর্ম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পিতা-মাতা বাল্যকালের থেকে বৃদ্ধ হলেও মা বাবার কাছে ছোটই থাকে। তাই সন্তানের বড় হয়ে বাবা মাকে যথোপযুক্ত ভাবে পালন করাও স্বধর্ম পালনের মধ্যেই পড়ে। আর বাকি রইল ধর্ম জীবন পালন করার কথা। একথাই তো সর্বাংশেই সত্য যে মা-বাবা বড় করেছে তার পরই সে ধর্ম জীবন পালনের জন্য উপযুক্ত হওয়ার জন্য। তখন যদি ধর্ম জীবন পালনের মত অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হয় মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পরায়ণ তাহলে জীবন যথার্থভাবেই অর্থবহ হয়। আর বড়দের শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান জানালে সমাজে বয়স্ক ও ছোটদের মানবিক বোধের পরিচয়টিও ধরা পড়ে।

চতুর্থ আজ্ঞা : জগতকে প্রেম কর।[১২]

জগত বলতে মা বসুমতিও তারপর বসবাসকারী গাছপালা তথা উদ্ভিদ জগত ও জীবজগতকে বোঝায়। জগতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হল মানুষের কর্তব্য। একটি সাধারণ জ্ঞানের কথা হল আমরা যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করি সেই পরিবেশে অনেক গাছপালা পশুপক্ষি বাস করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। তাই জগতে একমাত্র মানুষের প্রতিই নয় সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া মানুষের কর্তব্য। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন জগতকে প্রেমদান কর। এবং সর্ব্বপরি বলা যায় মাটির প্রতিও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া উচিত।

পঞ্চম আজ্ঞা : চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতি ভেদ করো না।[১৩]

চরিত্রই মানুষের মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে চরিত্রকে কেন্দ্র

করে। চরিত্রই ব্যক্তিগত পরিচায়ক যেমন তেমনি একজন আদর্শ মানুষ সেই জাতীর গৌরব বহন করে এবং বৃহৎ অর্থে সেই চরিত্রাদর্শই সমগ্র মানুষ জাতির ঐতিহ্যবহন করে। মানুষের কর্তব্য জাতিভেদ প্রথার দ্বারা কোন একটি জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। তাতে মানুষের ব্যক্তি চরিত্র কলুসিত হয় ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় পায়।

ষষ্ঠ আজ্ঞা : কারো ধর্ম নিন্দা করো না।[১৪]

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল ধর্ম। ধর্মকে মানুষ ধারণ করে। মানুষ ধর্মকে ধারণ করে আত্মীক উন্নতি ঘটায়। এবং ধর্ম জীবন পালনের দ্বারা মানুষ নিজের আত্মদর্শন ঘটিয়ে মানুষের জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। একথা যে কোন ধর্ম সম্পর্কেই বলা যায়। তাই ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সাধন। তাই কোন মানুষ ধর্ম জীবন পালন করছে তাকে নিন্দা করা কখনোই উচিত নয়। এটা মানবতাবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা মানুষকে সংযমী হতে শেখায়।

সপ্তম আজ্ঞা : বাহ্য অঙ্গ সাধু সাজ ত্যাগ কর।[১৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর সাধু সাজতে বলেন নি। সাধু হতে বলেছেন। সাধু হতে গেলে অন্তর শুদ্ধ করতে হয় আর অন্তর যদি পবিত্রময় থাকে তাহলে বাইরে কোন বিশেষ পোষাক না পরেও সাধু চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। তাই মানুষকে বাইরের সাধু সাজের ত্যাগের কথা বলেছেন। কিন্তু অন্তর শুদ্ধ হয়ে সত্যের দ্বারা জীবন যাপনের কথা বলেছেন।

অষ্টম আজ্ঞা : হাতে কাজ মুখে নাম করবে।[১৬]

মানুষতো মুখেই কথা বলে। হাতের দ্বারা কাজ করে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে 'হরিনাম' করার কোন একটি নিদৃষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেননি। আর মানুষকে সর্বদাই কর্মময় থাকতে হয় তাই কর্ম করে হাতের দ্বারা মুখটি থাকে চুপ করে। তাই কর্মের সময় হাতের কর্মের সহযোগে মুখের দ্বারা 'হরিনাম' করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে 'হরিনাম' করাও হল আবার গৃহকাজ বা যে কোন কাজটি ও সম্পন্ন হল। ফলে 'হরিনাম' করার জন্য আলাদা করে সময় নষ্ট করতে হয় না।

নবম আজ্ঞা : শ্রীশ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা কর।[১৭]

ধর্ম পালন করে মানুষ। তাই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে যদি শ্রীশ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে জগৎ থেকে অজ্ঞান তামসিকতার বিনাশ ঘটে

মানুষের জীবন পূর্ণ মানবতাবোধের জ্ঞানের আলোক পূর্ণ হয়ে সত্য সুন্দর হয়ে বিকশিত হবে।

আর বাড়িতে শ্রীশ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মনুষ্য জীবনের মহামূল্যবান সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

দশম আজ্ঞা : ষড়রিপু থেকে সাবধান থাকবে।[১৮]

ষড়রিপু হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। এরা মানুষের দেহকে পরিচালনা করে। মানুষের কর্তব্য হল এই পরিচালকগণকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করার ক্ষমতা অর্জন করা। তাই ধর্ম পালন বা 'হরিনাম' মাহাত্মের দ্বারা সর্বদাই জ্ঞান ভক্তির দ্বারা এই ষড়রিপু গুলিকে ঊর্ধ্বমুখী করে মানুষের জীবনকে চালনা করা। এই ষড়রিপু বা ষড় ইন্দ্রিয়কে জয় করে জিতেন্দ্রীয় হয়ে মানুষের জীবন যাপন করাতেই মানুষের মনুষত্বের বিকাশ হয়।

একাদশ আজ্ঞা : দৈনিক প্রার্থনা কর।[১৯]

মানুষের হৃদয়কে নির্মল পবিত্র রাখার বা চিত্ত স্থির করার একমাত্র উপায় দৈনিক ভগবানে প্রার্থনা করা। প্রতিনিয়ত যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয় তাহলে মানবাত্মার শক্তির বিকাশ ঘটে। যা বিখ্যাত মানবাত্মার প্রতীক। নিত্য প্রার্থনায় আত্মদর্শন ঘটে এবং ভগবানের সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ হয়। এবং মানুষের জীবন জ্ঞান ভক্তির মেলবন্ধন ঘটে মানুষ পূর্ণ হয়।

দ্বাদশ আজ্ঞা : ঈশ্বরকে আত্মদান কর।[২০]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ঈশ্বরে বা ভগবানে আত্মদান করতে বলেছেন। ভগবানে আত্মদানের মাধ্যমে নিজেরই আত্মচৈতন্যের জাগরণ ঘটে। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষই সমাজের প্রকৃত মানবসত্তার অধিকারী। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভগবানের চিন্তা কর্ম করতে গেলে প্রথমেই আত্মশুদ্ধ হতে হয়। আত্মশুদ্ধ হলে মানুষ নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় আস্তে আস্তে। এ ভাবেই মানুষের চরিত্রকে আত্মীক উন্নতির পথে গমন করতে হয়। ভগবানে আত্মদান করলে ভগবান ও মানুষকে নিজ গুণে যদি আত্মদান করে তার স্বরূপকে জ্ঞাত করান তাহলে মানুষের জীবন ধন্য হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম পালনের এবং গৃহজীবনের উন্নতির জন্য যে নিয়ম ও কর্মাদর্শকে নিজে পালন করেছেন ও সকল মানুষকে জীবনে সেই নীতি আর্দশ পালন করে আর্থিক উন্নতি করার কর্ম করতে বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহস্থ জীবন পালন করার মধ্যেই ধর্ম পালন করার শিক্ষাদান করেছেন। এক্ষেত্রে হরিচাঁদ ঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলা যায় তিনিও আদর্শ গৃহকর্ম পালন করেছেন এবং পরিবার জীবনে থেকেই তিনি সকল মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্ম জীবন ও কর্মজীবনকে এক সংসার জীবনের সঙ্গে পালন করার রীতিকে প্রচলন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেও ছিলেন এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের প্রতিনিধি। কৃষি ভিত্তিক কাজকর্ম ছিল তার নখদর্পণে যেমন তেমনি তিনি জানতেন যে কৃষি ও ব্যবসার দ্বারা মানুষ অর্থ উপার্জন করে দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। আর চরিত্র যদি সৎ আদর্শবান হয় তাহলে ভগবান সম্পর্কে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়াও অত্যন্ত সহজ হবে। যা সকল মানুষের জন্যই প্রয়োজনীয়তা বহন করে সমান ভাবে। সংঘবদ্ধতা মানুষের সমাজের তথা মানব মৈত্রির যোগ সূত্র সেই জন্য তিনি নিজেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। 'হরিসংকীর্ত্তন' 'হরিবাসর' করার মধ্যে দলবদ্ধভাবে কীর্ত্তন করার প্রথাকে প্রচলন করেন এবং সমবেত ভাবে 'হরিনাম' অর্থে বহুক্ষণ ব্যাপি 'হরিবল' নাম একত্রে করতেন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। যা মহাসংকীর্ত্তন নামে বা 'মহানাম' নামে পরিচিত। আর দলবদ্ধভাবে চলার নির্দেশ দিতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর আদর্শ গৃহধর্ম শিক্ষার জন্য যে কাজ তিনি নিজে করেছেন ও সকল ভক্ত মানুষদের শিক্ষা দিয়েছেন তাকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার সহ আরও অনেক লেখকগণ। কিন্তু কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারই শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের সমগ্র জীবনীকে ও কার্যাবলীকে সুসংহত আকর গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকেই সমগ্র হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীকে গ্রহণ করছি। হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম ভাবনার যে পরিচয় পাই তা হল—

.....

''প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।

হরিচাঁদ অবতীর্ণ হল অবনীতে।''[২১]

এরপর গৃহীকে কি কাজ করতে তিনি বলেন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে গৃহধর্ম পালনের সময় নিজেই কৃষক হয়েছেন, ব্যবসায়ী হয়ে

ব্যবসা করেছেন, এবং সর্ব্বপরি মানুষের সঙ্গে নিজেই হরি প্রেমে মত্ত হয়েছেন। এই সকল কাজই মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহ ভাবনাটিও মানুষের প্রতি এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে—

"সর্ব্ব কর্ম্ম করা ভাল গৃহীজন পক্ষে।
গৃহস্থের করা ভাল সর্ব্ব কার্য শিক্ষে।"[২২]

গৃহকে পরিপূর্ণ শান্তির আগার করে গড়ে তোলার জন্য গৃহী মানুষকে সকল কাজ শিখে রাখার প্রয়োজন হয়। কেননা কখন কোন কাজ করতে হবে কাজ শিখে রাখলে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে নেওয়া যায় নিজের শেখা দক্ষতায়।

বাংলার মানুষ অধিকাংশই পল্লীর অধিবাসী। আর গ্রাম বাংলার আজও প্রধান কাজ কৃষিকাজ। তাই তিনি সমস্ত কাজকে গুরুত্ব পূর্ণভাবে করতে বলেও কৃষিকাজকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময়ে মানুষের কৃষির জন্য কম-বেশি সকলেরই ধানের জমি ছিল এবং বাঙালি জাতির প্রধান খাদ্যশষ্য হিসাবে আজও পরিচিত হল ভাত ও মাছ ডাল ও নানা প্রকারের সব্জি যা তৎকালীন সময়ে কৃষিকর্মের দ্বারা প্রত্যেকের উৎপাদন করা সম্ভব ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহভাবনার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় যে মানুষের জীবনে অন্যতম উপাদান খাদ্য সেই খাদ্যের কোন অভাব থাকবে না কৃষির উৎপাদন যত্নসহকারে করলে, তাই তিনি বলেন—

"সর্ব্বকার্য্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য্য হয়।
এ কার্য না করা আমাদের ভাল নয়।।"[২৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃষিকার্য থেকে বোঝা যায় তিনি সত্যিই প্রকৃত কৃষক। আর তিনি কৃষির উন্নতির জন্য যেমন পতিত জমিকে বেছে নিয়ে চাষযোগ্য করে সোনার ফসল ফলিয়েছেন। তেমনি ভাবে মানুষকেও নিয়েছেন ধর্ম শিক্ষার জন্য যারা সমাজে পতিত মানুষ হিসাবে পরিচিত সেই মানুষের মাঝেও সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে দিয়েছেন। যাতে মানুষের জীবনেও সোনার ফসল ফলার জন্য অর্থাৎ সর্ব্বভাবে মানুষকে জীবনের পূর্ণ মানবসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই কর্ম প্রণালীর যথার্থ প্রয়োগ করেছিলেন তা আলোচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বর্ণনাতে পাই—

.....

"একবন্দ জমি দুই বিঘা পরিমাণ।
বহুদিন সে জমিতে নাহি হয় ধান।।
সব জমি মধ্য হতে লোনা উথলিয়া।
বুনাইলে ধান্য যায় করাটে হইয়া।।
চারিবর্ষ সে জমিতে হাল চাষে নাই।
সেই জমি চাষ কর্ত্তে লাগিল গোঁসাই।।
লোকে বলে এ জমিতে ধান্য নাহি ফলে।
বৃথা পরিশ্রম প্রভু কর কিবা বলে।।
এত শুনি হাসি মুখে কহেন গোঁসাই।
অফলা জমিতে আমি সুফল ফলাই।।
যশোবন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।
এবার করিব যত পতিত আবাদ।।"[২৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর পতিত জমিকে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে তবে তিনি ধান চাষ করলেন সেই জমিতে ধান হল অতি উৎকৃষ্ট। আর পূর্ব বাংলার এখনকার বাংলাদেশের কৃষকগণ একসঙ্গে দু'ধরণের ধান চাষ করতেন। আউস ও আমন ধান। হরিচাঁদ ঠাকুরও এক সঙ্গে দু'ধরণের ধান বুনলেন ও ফসল তুললেন গতানুগতিক কৃষকের থেকে অনেক বেশি। সেকথা ব্যক্ত করেন কবি এভাবে—

"আউস হইল আর হইল আমান্য।
দুই বিঘা জমিতে দ্বিগুণ হইল ধান্য।।"[২৫]

এই ধান চাষ প্রসঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুর যে জ্ঞান গভীর তত্ত্বকথা বলেছেন তাতে মানুষের জীবনের উন্নতির গূঢ়ার্থ ব্যক্ত হয়েছে। এবং মানুষের গৃহজীবনের মধ্যেই ধর্ম জীবনকে মিল করানো সম্ভব ও গৃহ ধর্ম ও ধর্মচর্চাকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই পালন করার শিক্ষা দিলেন। জমি পতিতে ফসল ফলালেন ও মানুষ পতিতের জীবনেও ধর্ম জীবন পালনের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় সেই পথের সন্ধান দিলেন। আর পতিত থেকে যে উদ্ধার কার্য করে তাকে চিনতে বললেন। অর্থাৎ ভগবানকে ভক্তি দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা আত্ম উপলব্ধি করে চিনে নিলে মানুষের কোন বিপদ হয় না সেকথাই বলেছেন। আবাদকারী সেই ভগবানের

সন্ধান পেলে মানুষের জীবনে সর্ব্বময় সৌন্দর্যের বিকাশ সম্ভব হয় একাগ্র ইচ্ছার দ্বারা। সব শেষে একথা বলা যায় একাগ্রভাবে সংসার জীবনে কর্মের দ্বারা যেমন সাফল্য লাভ করা সম্ভব তেমনিভাবে একান্ত আপনার জন ভেবে ভগবানের স্মরণাগত হলে তিনি তাঁর স্বরূপ নিজে জ্ঞাত করিয়ে দেবেন এবং জীবনের মূল লক্ষ্যে নিয়ে যাবেন। সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে'র এই কয় ছত্র কবিতায়—

''এদেশে আবাদী তোরা চিনিলিনা কেহ।
মাটি যে অফলা থাকে এবড় সন্দেহ।।
পতিত আবাদ জন্য আশা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে।।
খাঁটি মাটি হলে ফল না হয় বিফল।
ভক্তি করে ডাকে তারে দেই প্রেম ফল।।
যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
কল্প বৃক্ষ মূলে যদি প্রার্থনা করিবি।।
সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।''[২৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর সংসারী মানুষের জন্য কোন আদর্শ দান করেন। এবং কি ধর্ম নিয়ে নিজে জীবন যাপন করেন এবং তিনি যে ধর্মাদর্শ কর্মাদর্শকে ভক্ত মানুষের সমাজে প্রচার করেন তার তালিকাটি হল এইরূপ—

.....
''হরিচাঁদ অবতীর্ণ নামধর্ম্ম নিয়া।।
.....
বজ্রস্বরে ঘরে ঘরে হরিচাঁদ কয়।
..... আর নাহি ভয়।।
সংসারে সংসারী থাক তাতে ক্ষতি নাই।
চরিত্র পবিত্র রাখি সত্য বলা চাই।।
গৃহ ধর্ম রক্ষা করো বাক্য সত্য কও।

হাতে কাম মুখে নাম দেল খোলা হও।।

অসতের সঙ্গ ছাড়ি হরি হরি বল।

কুফল বিফল হবে পাবে প্রেমফল।।

পুরুষে করিবে ভক্তি পিতা মাতা ভাই।

নারী পক্ষে পতি ভিন্ন অন্ন গতি নাই।।

পরপতি পরসতী স্পর্শ না করিবে।

না ডাক হরিকে হরি তোমারে ডাকিবে।।

গৃহ ধর্ম্ম গৃহ কর্ম্ম সকলি করিবে।

হাতে কাম মুখে নাম ভকতি রাখিবে।।

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।

যোগী, ন্যাসী, কি সন্ন্যাসী কেহ তুল্য নয়।।

গৃহেতে থাকিয়া যাঁর হয় ভাবোদয়।

সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।।

তারস্বরে প্রভু সবে এই ভীর দিল।

রোগী ভোগী দুঃখী পাপী সকলি আইল।''[২৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই আত্মদর্শী মানুষ ছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজেই গৃহধর্ম্ম রক্ষা করেছেন পরিপূর্ণভাবে এবং যে আদর্শ নিজে পালন করেছেন সেই জ্ঞান ও ভক্তির পথকে সমাজের সকল মানুষকে পালন করতে বলছেন। আর ভক্তি পথে তিনি ছিলেন অকামনা প্রেমভক্তির অধিকারী। হরিচাঁদ ঠাকুর এই ভক্তি পথের সন্ধান দেন ভক্তগণকে এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক অকামনা প্রেমভক্তির ভক্ত মানুষের আগমণে হরিচাঁদ ঠাকুর বহু ভক্ত মানুষের মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজে পেয়ে একদেহ ধারী হয়েও বহু ভক্ত দেহে অনেক শক্তির অধিকারী হলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায় হরিভক্তির আদর্শ এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

.....

''আপন আত্মাকে হরি আপনি দেখিল।

কত লীলা করে হরি চটকার তলা।।

কল্প বৃক্ষ মূলে বসে শ্রীহরি ঠাকুর।

অকামনা, নামে রুচি কামবাঞ্ছা দূর।।

অকামনা বৃক্ষমূলে মিলে সর্ব্বফল।

অকামনা ব্রত সাধে ভকত বৎসল।।

একা প্রভু বহু হল ভকতের দেহে।

ভক্তি আকর্ষণে চলে ভক্তগণ গৃহে।।"[২৮]

ভক্ত মানুষ সহযোগে হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠন :

'দেশ ভরি শব্দ মধুর মধুর। যশোবন্ত ছেলে হরি হয়েছে ঠাকুর।' 'ঠাকুর' হয়েছে শব্দ শুনে বহু মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনে এসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কেউবা এল রোগ হতে মুক্ত হবার জন্য। আবার কেউ বা এল অন্তরের গভীর সন্ধানের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে। এভাবে হরিভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসেন ও অভিষ্ট পুরণ হওয়ার পর আত্মসমর্পণ করেছিলেন বহু ভক্ত। হরিচাঁদ ঠাকুর এই ভক্তগণের মনবাসনাকে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তারা সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় ভক্তেও পরিণত হলেন। এবং সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে ব্যক্ত করেন তৎকালীন সমাজ মানুষের কাছে। আলোচনার মাধ্যমে দেখব কোন ভক্ত কীভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে মানুষের সমাজে প্রচার করেছিলেন।

প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের আত্মসমর্পণ কাহিনিটি আলোচনা করা যাক। মল্লকাদি গ্রামে বাস করতেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। 'অথ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের উপাখ্যান' অংশে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন একজন জ্ঞানীভক্ত। তার শরীরে রসপিত্ত ব্যাধির জন্য আত্মধিক্কার জন্মে যে আমার পিতামাতা পরম ভক্ত তাদের সন্তান হয়ে আমার এহেন ব্যাধি হল। আমি আমার জীবন ত্যাগ করবো কিন্তু জীবন ত্যাগের জন্য বিষ সংগ্রহ করেন এবং মনে মনে ভাবলেন ওড়াকাঁন্দি হরি অবতার রূপে ব্যক্ত হয়েছেন। তখন মৃত্যুর আগে হরিদর্শন করলে মৃত্যুর পর হরি পাব। এই সংকল্প করে হরিদর্শনে যান বিষ নিয়ে। এই বর্ণনাগুলি তারকচন্দ্র সরকার মহাশয় এভাবে জানালেন—

"মল্লকাদি গ্রামে মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ।

যেভাবে ঠাকুর প্রতি বাড়ে অনুরাগ।।

.....

শাস্ত্র শ্লোক বক্তা ছিল ধীর অতিশয়।।

শাস্ত্র আলাপনে অতি ছিলেন সমর্থ।

করিতেন শাস্ত্রের মাঝেতে নিগুঢ়ার্থ।।

সাধু সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠ করে নিরবধি।।

দৈবেতে হইল তার রসপিত্ত ব্যাধি।।

.....

আমার এ ব্যাধি হল না রাখিব প্রাণ।।

কোন মুখে এই মুখ লোকেরে দেখাব।

ভাবিলেন বিষ খেয়ে জীবন ত্যজিব।।

ওড়াকাঁদি হল হরি ঠাকুর প্রচার।

.....

এদেশ এ গ্রাম সব ধন্য হইয়াছে।

আমিও যাইব সেই ঠাকুরের কাছে।।

.....

জ্ঞান হয় ওড়াকাঁদি স্বয়ং অবতার।

তিনি বিনে পতিতের বন্ধু নাহি আর।।

.....

ওড়াকাঁদি হতে প্রেম বন্যা উথলিল।

আমি বিনে জগতের সকলে ডুবিল।।

মরিলে ঠাকুর দেখে পরকাল পাব।

শেষে বিষ খেয়ে আমি আত্মঘাতী হব।”[২৯]

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই ওড়াকাঁদি গমন করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে। হরিচাঁদ ঠাকুর তার দূরদর্শিতার পরিচয় দেন গোপন করা বিষকে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের কাছ থেকে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন। এবার মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়ের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন অন্তর্যামী ইনি। হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে বিশ্বাস করলেন। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাজও কথায় ব্যক্ত হয় গভীর আত্ম প্রত্যয় শক্তির পরিচয়। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসকে রক্ষা করলেন বিষ পানের কবল থেকে। আর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের যে মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছিলেন সেই মনোবাসনাকেও ঠাকুর পূর্ণ করেন। অর্থাৎ ভক্ত মৃত্যুঞ্জয়কে আত্মসমর্পণ করান হরিপদে। এভাবেই ভগবানের সাথে ভক্ত মহাভাগ মৃত্যুঞ্জয়ের মিলন হল। কবির বর্ণনায়—

.....

''বিষ লয়ে ওড়াকাঁদি উপনীত হল।
প্রভুর নিকটে গিয়া কাতরে বসিল।।
প্রভু বলে মৃত্যুঞ্জয় এলি ওড়াকাঁদি।
পরিধান কাপড়েতে কি আনিলি বাঁধি।।
অমনি বিস্ময়ান্বিত হল মৃত্যুঞ্জয়।
মুখ পানে চেয়ে রল কথা নাহি কয়।।
বসন টানিয়া প্রভু বিষ খসাইল।
বাহির করিয়া নিজে বিষ পান কৈল।।
এলি এই বিষ খেয়ে মরিবার তরে।
ওড়াকাঁদি এলে কিরে বিষে লোক মরে।।
এই বিষ খেয়ে বাছা মরিতে কি তুমি।
এই তো খেলাম বিষ মরিতনা আমি।''[৩০]

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের মরবার ইচ্ছাকে 'হরিচরণে' সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে তাকে তার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে হরিচাঁদ ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুঞ্জয়ী করলেন। কবি বলছেন এভাবে—

''গোপনে রেখেছি কিসে পাইল সন্ধান।
অন্তর্যামী ইনিত স্বয়ং ভগবান।
প্রভু কয় মৃত্যুঞ্জয় শুনরে বচন।
বিষ খেয়ে মরে যে সে মানুষ কেমন।।

নিজ দেহ প্রতি যার দয়ামায়া নাই।

সে ভাল বাসিবে পরে বিশ্বাস না পাই।।

মৃত্যুঞ্জয় কহে প্রভু তোমার সাক্ষাতে।

মরিব বিষের বিষে ভয় কি তাহাতে।।

প্রভু বলে যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।

মরিলিত ভাল করে মর মোর কাছে।।"[৩১]

এরপর প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। কবির বর্ণনায়—

.....

"পড়ে পদে মনোখেদে বলে মৃত্যুঞ্জয়।

দোষ ক্ষমা করি প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়।।

দীন দয়া ময় দয়া কর এক বার।

আমিও তেমার প্রভু এ দেহ তোমার।।

প্রভু বলে যদি মোরে দেহ দিলি ধরি।

ব্যাধি মুক্ত হল তুই বল হরি হরি।।

শ্রীনাথ শ্রীমুখ বাক্য যখন বলিল।

ব্যাধি মুক্ত মৃত্যুঞ্জয় নাচিতে লাগিল।।

মৃত্যুঞ্জয় ধরি হরি চরণ যুগল।

বলে হরিবল হরিবল হরিবল।।

মৃত্যুঞ্জয় পাইল প্রভুর শ্রীচরণ।

কহিছে তারক হরিবল সর্ব্বজন।।"[৩২]

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের যে মৃত্যু ইচ্ছা ছিল সেই মৃত্যু ঘটিয়েছেন তার মানষিক ব্যাধির যেমন তেমনিভাবে শারীরিক ব্যাধির ও মুক্তি দিয়ে তাকে নিজের করে নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিভক্তি থাকলে ভক্তপ্রাণে মৃত্যু আকাঙক্ষা থাকে না একথাও ব্যক্ত করলেন নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুর। আর মৃত্যুর পর হরি পাওয়ার আকাঙ্খা ছিল ভক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের হরিচাঁদ ঠাকুর ইচ্ছা পূর্ণ করেন, মৃত্যুর পর নয় আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরকে পেলেন ভক্তসাধক মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। জীবিত থেকেই হরি পান। এই মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসই পরবর্তী সময়ে হরিনাম প্রচার

করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে।

বদন ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শন করে কেমন করে হরিভক্ত হলেন তার পরিচয় গ্রহণ করব। বদন ঠাকুর গোলক পাগলের কাছে যাতায়াত করত তখন থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হন। পরে তার বিষম পেটে ব্যথা হয় এবং আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করার ফলে আরো বৃদ্ধি পায় ব্যথা এবং আরো রোগ বৃদ্ধি পায়। বদন ঠাকুরের শারীরিক পরিস্থিতি এতটা অবনতি ঘটে যে মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়। এই শারীরিক পরিস্থিতিতে অনেকে হরিনাম করার পরামর্শ দেন এবং সমস্ত রোগের আরোগ্য কর্তা অর্থাৎ ভগবানের স্মরণাগত হওয়ার পরামর্শ দেন ও বলেন ওড়াকাঁন্দি ঠাকুরের কাছে চল তিনি বাঁচালে বাঁচাতে পারেন। শুনেই বদন ঠাকুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। সকলে মিলে নৌকায় নিয়ে যান ওড়াকাঁন্দি। ওড়াকাঁন্দি যাওয়ার সময় মনোবাসনা প্রকাশ করেন যে যদি কিছু সময় পেতাম মনোসাধ মিটায়ে নিতাম হরিনাম। অসুস্থ বদন ঠাকুরকে ঠাকুরবাড়িতে আনলে হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহ মধ্যে চলে যান। অসুস্থ ঠাকুর ঠাকুরবাড়িতে বসে হরিনাম করতে থাকেন ও হরিচাঁদ ঠাকুরকে একমনে স্মরণ করেন। অসুস্থ ভক্তের হৃদয়ার্তিতে ঠাকুর প্রীত হন ও বাইরে এসে তার উপর অনেক ভৎর্সনা করেন ও সকলকে বাড়িতে পাঠান, বলেন তোরা বাড়িতে গিয়ে বল বদন ওড়াকাঁন্দি গিয়ে মারা গেছে। সকলকে বাড়িতে পাঠিয়ে চিকিৎসায় সুস্থ করে তোলেন বদন ঠাকুরকে। বদন ঠাকুরকে আত্মসম ভালোবেসে নিজের করে নিলেন। এভাবেই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে বদন ঠাকুর আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হনও হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায় 'হরিনাম' দান করেন ও রোগের আরোগ্য ব্যবস্থাও করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"গোলক পাগল হল ঠাকুরের ভক্ত।
ভক্তি ভাবে আত্মহারা সদাই উন্মত্ত।।

.....

অনুক্ষণ আসে প্রভু গোলকের ঠাই।
ক্রমে প্রেমে ভাবাবিষ্ট বদন গোঁসাই।।

.....

হইল অসাধ্য ব্যাধি উদরে বেদনা।

অহরহ বেদনায় বিষম যাতনা।।

.....

একেত ঘায়ের ব্যথা, ব্যথা পুরাতন।

উভয় ব্যথার জ্বালা নাহি নিবারণ।।

ক্রমে বৃদ্ধি বেদনাতে অস্থিচর্ম সার।

অদ্য কিম্বা কল্য মৃত্যু এরূপ আকার।।

কেহ বলে চিকিৎসায় নাহি প্রয়োজন।

কেহ বলে বৈদ্যনাথ প্রতি দেহ মন।।

.....

কেহ বলে বাঁচ যদি ওড়াকাঁদি চল।।

জগত জীবন তিনি জগতের কর্ত্তা।

মরিলে বাঁচাতে পারে সবে কহে বার্ত্তা।।

আত্মস্বার্থ সমর্পণ করহ তাহায়।

.....

সবে বলে মোরে লয়ে ওড়াকাঁদি চল।।

.....

ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক অজ্ঞান।।

উত্থান শকতি নাই থাকেন শয্যায়।

তরণী সাজিয়া চলে দুই মহাশয়।।"[৩৩]

মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষের মনে আশা থাকলেও উপায় থাকে না। এ চিরসত্য কথা চিরকালের মহাসত্য, মানুষের জীবনে। এ সত্য থেকে বদন ঠাকুরও ব্যতিক্রম নন। আর মানুষের জীবনে আর একটি মহাবাক্য মহাসত্যের সঙ্গে বদন ঠাকুরকে পরিচয় করান তা হল মানুষ এই জগতে একাই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে আর একাকেই কর্ম দ্বারা এজগতে জীবন ধারণ করতে হয়। কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করে ভগবানকে চিনতে হয় ও মানুষকে পূর্ণ মনুষত্বের স্তরে উন্নীত হতে হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের স্তরে পৌঁছাতে একমাত্র উপায় 'হরিনাম' ও শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ করলে ভগবান স্বয়ং আত্মসমর্পণকারীকে আত্মগত

করে নেন ও তার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করান। হরিচাঁদ ঠাকুর বদন ঠাকুরকে সুস্থ করে তোলেন ও হরিনাম করার আদেশ দেন। কবির বর্ণনায়—

.....

''মনোসাধ মিটায়ে নিতাম হরিনাম।।

.....

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আসিল বাহিরে।

তর্জ্জন গর্জ্জন করে বদনের পরে।।

গালাগালি দিয়া বলে উঠ বেটা দুষ্ট।

বল দেখি তোর কেন হল এত কষ্ট।।

.....

এখন সে সোর শব্দ রহিল কোথায়।

একা আসা একা যাওয়া সাথি কেবা হয়।''[৩৪]

এই ভক্ত মানুষের সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের যে কথপোকথন হয় তার মধ্যে গভীর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বদন ঠাকুরের অন্তিম সময়ের তীব্র জীবনাগ্রহকে নবভাবেই জাগ্রত করেন ঠাকুর হরিচাঁদ। হরিচাঁদ ঠাকুর বার বার ভক্তদের মৃত্যু আর্ত্তি শোনার পর বলেন ''মরিবি তো ভাল করে মর মোর কাছে' একথার একটিই অর্থ বোঝা যায় আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরাত্মা ভক্ত হওয়ার কথা বলেন। এই অসুস্থ ভক্ত মানুষের শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে পূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করেন ও মানুষের জন্য কাজ করার যোগ্য করে গঠন করে নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। 'বদন মরেছে ওড়াকাঁন্দি' কথার অর্থ ওড়াকাঁন্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। বদন ঠাকুরের ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবালাপটি এভাবে প্রকাশ করেন কবি—

''বদন বলিছে প্রভু মরিয়াছি আমি।

ভগ্ন তরী ডুবে মরি কর্ণধার তুমি।।

ঠাকুর বলেন চিনে সে কাণ্ডারীধর।

মরিলি যদ্যপি বেটা ভাল করে মর।।

বদন বলেন মম ডুবু ডুবু তরী।

আর কি চিনিতে যাব চিনেছি কাণ্ডারী।।

বদন বলেন তরী সবে যায় বেয়ে।

ডুবা তরী যেই বাহে তারে বলি নেয়ে।।

বদন বলেন হরি পদ তরী দেও।

ছাড়িলাম দেহ তরী বাও বানা বাও।।

হরি হরি হরি বলি উঠিল বদন।

ধরণী লোটায়ে ধরে প্রভুর চরণ।।

.....

বাটী গিয়া বল সবে মরেছে বদন।

যে দারুণ পেট ব্যথা না রবে জীবন।।

কেহ যদি থাকে সে করুক শ্রাদ্ধ আদি।

বল গিয়া বদন মরেছে ওড়াকাঁদি।।

.....

ঠাকুর বলেন তোর পেটে ছিল যেই।

দেখ বাছা তোর পেটে আছে কিনা সেই।।

বদন বলেন মোর পেটে সেই ছিল।

শ্রীপদ পরশে সেই মুক্তি পেয়ে গেল।।

হরিভিন্ন বদনে বলে না অন্য বোল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি বলেছে কেবল।।''[৩৫]

বদন ঠাকুরকে হরিচাঁদ ঠাকুর অনেকদিন পর্যন্ত নিজের কাছে রাখেন ও হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে আজ্ঞা দেন রোগারোগ্য করে ভক্ত মানুষকে শারিরীক ভাবে ও হরিনাম দানে মানসিকভাবে সুস্থ করে মানুষের উপকার করতে। সে কথা এভাবে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ব্যক্ত করেছেন—

''প্রভু সঙ্গে বদন থাকেন একতর।

কভু ঠাকুরের বাড়ী কভু ভক্তঘর।।

কোন কোন লোক যদি হয় ব্যাধি যুক্ত।

ঠাকুরের কাছে আসে হতে ব্যাধিমুক্ত।।

কারু কারু আজ্ঞা দেন মুষ্টি যোগ করে।

কারু বলে লয়ে যাও বদন ঠাকুরে।।

ঠাকুর বলেন তবে বদন ঠাকুরে।

যেই তুমি সেই আমি একই শরীরে।।

.....

তুইরে বদন মম ধন মন প্রাণ।।

তোর দেহ নিলাম আমার ইচ্ছামতে।

তোর ইচ্ছা যাহা হয় মোর ইচ্ছা তাতে।।

ঠাকুরের আজ্ঞা শুনি বদন উঠিল।

ঘুরে ফিরে নাচে যেন মত্ত মাতোয়াল।।

.....

নাহি ক্ষান্ত অবিশ্রান্ত করে হরিনাম।।

ব্যাধিযুক্ত কেহ যদি হয় নিরুপায়।

কাঁদিয়া ধরিত গিয়া বদনের পায়।।

হরিচাঁদ বলিয়া দিতেন আজ্ঞা করে।

অমনি সারিত ব্যাধি আজ্ঞা অনুসারে।।"[৩৬]

বদন ঠাকুর নিজে শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি থেকে চিরমুক্ত হন হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায় এবং অগণিত মানুষেরও মুক্তির পথ দেখান হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে।

গোলক পাগলের কথা আলোচনা করার মধ্য দিয়ে দেখব হরিচাঁদ ঠাকুরও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তেরা কীভাবে তৎকালীন সমাজের মানুষের দুঃখ কষ্টের নিবারণ করতেন। আর গোলক গোস্বামী যেভাবে হরিচাঁদ পদে আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হন। সেই কথার তারকচন্দ্র সরকার পরিচয় দিয়েছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন— গোলক গোস্বামীর অখ্যান কথা সম্পূর্ণ ভাবে বলতে গেলে একটি অধ্যায় হয়ে যায়। ভক্ত গোলকের বাড়ি নারকেলবাড়ি গ্রামে। তিনি হরিভক্ত হন। কৃষিকাজে দারুণ নিপুণ ছিলেন। এই গোলক গোস্বামীর গলায় অসুখ করে। কোন

খাবারই তিনি খেতে পারছিলেন না। এই সময় বাউৎখামার গ্রামের ভক্ত রামচাঁদ হরিচাঁদ রামচাঁদ ঠাকুরের নামে রোগারোগ্য করতেন। সেই ভক্ত রামচাঁদকে আনবার জন্য রাউৎখামার যাচ্ছিলেন রামকুমার গোলকের অগ্রজ ভাই। এই সময় বালাবাড়ির গিরিধর বালা ছিল জ্বরে অচেতন তাদের বাড়ি থেকেও রামচাঁদকে আনবার জন্য যায়। গিরিধরকে চিকিৎসা করার জন্য ভক্ত রামচাঁদ আসেন ও গিরিধরকে সুস্থ করার পর রামকুমারের গলা ঝাড়েন। এবং বলেন তুমি বাড়িতে গিয়ে দেখ গোলকের গলা 'ফুলা নাই'। এবং রামকুমার সেই ঘটনাই দেখেন বাড়িতে গিয়ে গোলক সুস্থ হয়েছে। একথা গোলক গোস্বামীকে বলার পর গোলক গোস্বামী হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যান। সেখানে তিনি তার প্রাণের ঠাকুরকে দেখতে পানও নিজেই ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের 'গোস্বামী গোলকচাঁদের আখ্যান' থেকে গোলক চাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানা যায়—

.....

''সাহাপুর পরগণা তাহার অধীনে।
নারিকেল বাড়ী গ্রামে জানে সর্ব্বজনে।।
এই বংশে যতজন সবে মহোদয়।
বংশ অনুরাগ হরিভক্তি অতিশয়।।

.....

.....

গোলক উন্মত্ত চিত্ত ঠাকুর ভাবিয়া।
উপাধি হইল শেষে 'পাগল' বলিয়া।।
কৃষিকার্য্য করিতেন গোস্বামী গোলক।
ধান্যক্ষেত্র কার্য্যে ছিল বড়ই পারক।।

.....

উঁচু নিচু না রাখিত জমির মাঝেতে।
সমতল ধান্যক্ষেত্র করিত স্বহস্তে।।
যে জমির ধান্য কাটে আঠার কিষাণে।
তাই তিনি কাটিতেন একা একদিনে।।

.....

কণ্ঠ দেশ ফুলিয়া ক্রমশ হল ভারী।

শয্যাগত রহিলেন হয়ে অনাহারী।।

নাসারন্ধ্রে ঘনশ্বাস বাক্য নাহি সরে।

দুগ্ধ পান আদি বন্ধ হল একেবারে।।

রাউৎখামার রামচাঁদ মহাশয়।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ ঠাকুরের কাছে আসে যায়।।

রোগ যুক্ত রোগী যত রামচাঁদে ধরে।

ঠাকুরের নামেতে রাখিয়া রোগ সারে।।''[৩৭]

রামচাঁদ মহাশয় অচেতন জ্বরের রোগী গিরিধরকে সুস্থ করেন। নারকেলবাড়ি যাননি তিনি। গোলক গোস্বামীর ভাই রামকুমারের গলা ঝাড়লেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে। তার চিকিৎসায় গোলক গোস্বামীর গলা ফুলা সারলেন। গোলক গোস্বামী ভাইয়ের কাছে আদ্য প্রান্ত বিবরণ শুনে ঠাকুরের ভক্ত হন ও ঠাকুর দর্শনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। গোলক গোস্বামী আজীবন ঠাকুরবাড়িতেই অবস্থান করছিলেন ও ঠাকুরের ভক্তদের সুখ দুঃখের সাথী হয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন। গোলক গোস্বামী মহা অনুরাগী হয়ে অনেক অনেক কাজ করেন সমাজের মানুষের। 'হরিনাম' দিতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায়ও রোগারোগ্য করতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে। এবং আজীবন হরিচাঁদ ঠাকুরের নিত্য সহচর ছিলেন। আর একটি কথা গোলক গোস্বামীর দেহত্যাগের পর তারকচন্দ্র সরকার পুত্র কাজ করেছিলেন। মহোৎসব করেছিলেন গোলক চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায়। এই গ্রন্থ লেখককে গোলক বলেছিলেন, 'তুমি যদি পুত্র মোর হইতে তারক।' কবিরসরাজ তারকচাঁদ সরকারও যথাসাধ্য পুত্র কার্য করেছিলেন। তারকচন্দ্র সরকারকে গ্রন্থ রচনার জন্য বরদান করেন। তাই হরিভক্তগণ এক একজন মহাভক্ত ও সমাজ মানুষকে সুস্থ সুন্দর মনুষ্যত্ববোধের বিকাশের জন্য সর্বদাই কর্মে নিযুক্ত থেকেছেন। কবির বর্ণনায়—

.....

''রামচাঁদ ঠাই রামকুমার বলিছে।

মোর ভাই গোলক সে আছে কিনা আছে।।

বড়দায় ঠেকে আসিয়াছি দৌড়াদৌড়ি।

দয়া করে যেতে হবে নারিকেল বাড়ি।।

.....

বাবা হরিচাঁদ বলে ছাড়ে এক ডাক।

.....

হুঙ্কারিয়ে দুই হাতে গিরিধরে ঝাড়ে।

.....

মুহূর্তেক মধ্যে ব্যাধি আরোগ্য হইল।

রোগমুক্ত গিরিধর উঠিয়া বসিল।।

.....

ঝাড়িতে লাগিল রামকুমারের গলা।

বাবা হরিচাঁদ বলে ঘন ডাক ছাড়ে।

রাম কুমারের গলা রামচাঁদ ঝাড়ে।।

'দোহাই ওড়াকান্দীর বাবা হরিচাঁদ'।

গলা ঝাড়ে ডাক ছাড়ে যেন সিংহনাদ।।

দণ্ডমাত্র রামকুমারের গলা ঝাড়ি।

বলে আমি যাইব না নারিকেলবাড়ী।।

তোমরা গৃহেতে যাও আমি গৃহে যাই।

দেখ গিয়া গোলকের গলা ফুলা নাই।।

.....

এইসব প্রকাশিল বাটীতে আসিয়া।

গোলক উন্মত্ত হল সেকথা শুনিয়া।।

প্রভুকে দেখিব বলে ওড়াকান্দী যায়।

লোটাইয়া পড়ে গিয়া ঠাকুরের পায়।''[৩৮]

গোলক গোস্বামীকে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজের করেই গ্রহণ করেন। আর যেন চিরপরিচিত মানুষের জন্য ঠাকুর অপেক্ষা করে আছেন এহেন প্রকারে গোলকের সাথে মিলিত হন। গোলক

গোস্বামীও আরাধ্য ধন পেয়ে তাঁর কাছে চির বিক্রিত হলেন এবং নিজ আশ্রয় খুঁজে পান। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গোলকের কথোপকথনের মাধ্যমে সেই চির পরিচিতির সঙ্গে যেন মহামিলন হল সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে—

''প্রভু বলে এতদিন কেন নাহি এলি।
ব্যাধি যুক্ত হয়ে কেন এত কষ্ট পেলি।।
এতদিন পরে যদি এলি মম ঠাঁই।
যাও বাপ গৃহে যাও আর ভয় নাই।।
শুনিয়া গোলক প্রেমে কম্পিত হইল।
অনিমেষ নেত্রে রূপ দেখিতে লাগিল।।
.....
.....
বলে ''আমি আর না করিব গৃহবাস।
গোলক বলেন আমি কার বাড়ি যাব।
চরণে নফর হয়ে পড়িয়া রহিব।।''
প্রভু বলে ''ঘরে যাও ওরে বাছাধন।
চিরদিন মোর বলে থাকে যেন মন।।''
গোলক বলেন হরি চিনেছি তোমায়।
চিরদাস বিক্রিত হইনু তব পায়।।
প্রভু বলে ''বিকাইলি পাইলাম তোরে।
কর গিয়া কৃষি কার্য্য যাব তোর ঘরে।''
গোলক চলিল ঘরে প্রভুর কথায়।
সময় সময় ওড়াকান্দী আসে যায়।।
মাসান্তর পক্ষান্তর সপ্তাহ অন্তরে।
মাঝে মাঝে যাইত প্রভুকে দেখিবারে।।
দশরথ মহানন্দ মাতিল তাহাতে।
গ্রাম্য লোক প্রমত্ত হইল সেই মতে।।

হরিচাঁদ গোলকের ভাব প্রেম রসে।

আসা-যায়া করে প্রভু গোলকের বাসে।''[৩৯]

গোলক গোস্বামীর ভক্তি ভাবের জন্য ভক্ত মানুষেরা গোলক পাগল নামে জানতেন। গোলক পাগল বা গোলক গোস্বামী একজন মানুষের নাম। গোলক পাগল ছিলেন আত্মজ্ঞানী ভক্ত। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহভার অর্পণ করেন। তখন এই গোলক পাগল গুরুচাঁদ ঠাকুরকে পরীক্ষা করেছিলেন যে ঠাকুরের ভাবাদর্শময় ভক্তদের নিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের যে মহাগৃহ সেই মহাগৃহভার বহনের ক্ষমতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের আছে কিনা। বালক গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। পরে পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর সেই পরীক্ষার কথা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বলেন ও আত্মজ্ঞানের শিক্ষাদান করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের দেহাবসানের পর গুরুচাঁদ ঠাকুরই সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের মহাগৃহ ভার পালন করেন। গোলক পাগল ছিল এহেন আত্মজ্ঞানী ভক্ত। আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ' চরিত' গ্রন্থে 'সংযম শিক্ষা লাভ' অধ্যায়ে গোলক পাগলের পরীক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন।

''শ্রীহরির ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাম শ্রীগোলক।

ব্যাধি হতে মুক্তি পেয়ে সাজিল সেবক।।

.....

.....

''শোন গুরুচাঁদ তুমি চেন না গোলকে।

তোমাকে দিয়াছি আমি সংসারের ভার।

গোলক করেছে মনে গূঢ় অর্থ তার।।

তুমি বুঝিয়াছ মনে এই ঘর বাড়ী।

গোলক বুঝেছে সে তো বাহির কাছারী।।

ধর্ম্ম খুঁটি দিয়া বান্ধি সেই ধর্ম্ম ঘর।

গোলক বুঝেছে পেলে সেই গৃহভার।।

এহেন দায়িত্বপূর্ণ সেই মহাভার।

পার কিনা নিতে করে পরীক্ষা তাহার।।

এ ভার বহিতে লাগে অসীম সংযম।

সংযমেতে প্রাপ্ত হয় ধৈয্য পরাক্রম।।

সামান্য দুঃখের কাজ জানিবে অস্থায়ী।

মহাদুঃখ সহ্য কর সাজিতে বিজয়ী।।

একেলা গোলক তোমা করিল বিরক্ত।

লক্ষ প্রাণী ভার নিতে তুমি তো অশক্ত।।

তব ধৈর্য্য পরীক্ষিতে গোলকের মন।

তার কাছে হেরে গেলে এ হল কেমন?

গোলক অলস কিসে মহাবীর্য্যবান।

দেখ গিয়া কাটিয়াছে সেই সব ধান।।

ধৈর্য্য শক্তি না থাকিলে সকলি বিফল।

ধৈর্য্য ধর কর্ম্ম কর প্রাণে হবে বল।।

আর শোন গুরুচাঁদ আমার বচন।

আমি যবে না রহিব কি হবে তখন।।

সংখ্যাতীত নরনারী সকলি আসিবে।

নানাভাবে সবে মিলি বিরক্ত করিবে।।

সকলি সহিতে হবে ধৈর্য্য শক্তি দিয়ে।

সে সব এখনে শেখ এক মন হয়ে।।

আর শোন জ্ঞানী লোক সেই কথা কয়।

'যে সয় সে মহাশয়' কথা মিথ্যা নয়।।"[৪০]

এ হেন আত্মজ্ঞান লাভের পর গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন সদয় হয় এবং গোলক গোস্বামীর কাছে যান গুরুচাঁদ ঠাকুর। মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

"প্রভুকে দেখিয়া সাধু হাসিয়া বলিল।

আমাকে ডাকিতে বাবা তোমাকে পাঠাল।।

গুরুচাঁদ বলে 'দাদা সকলি তো জান।

উঠে এস বাড়ী পরে আর জলে কেন।।'

এইভাবে গুরুচাঁদ সংযম শিখিল।

গোলকের প্রতি মন নির্ম্মল হইল।”[৪১]

এ হেন কর্মী জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন গোলক পাগল। তার অগণিত কার্য কলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। যার দ্বারা সমাজের মানুষের বহু উপকার সাধিত হয়েছিল। গোলক পাগলের প্রিয়পুত্র সম এক ভক্ত হল কার্ত্তিক ও অম্বিকা। এই কার্ত্তিকের পুত্র হল গুরুচাঁদ ঠাকুর কথিত মহারত্ন অশ্বিনী গোঁসাই। যিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ও ‘শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন’ গ্রন্থের রচয়িতা।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোস্বামী হীরামন অন্যতম। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হরিভক্ত হওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও দেবী কাশীশ্বরী হরিচাঁদ ঠাকুরকে একদিন পদ্মফুল দিয়ে সাজান তাদের বাড়িতে। সেই দিন হীরামন গোস্বামী হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখতে যান মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়িতে। হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে হীরামন গোস্বামী মূর্ছাযান ও মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস অচেতন হীরামনকে ‘হরিনাম’ কর্ণে শোনানোর পর জ্ঞান ফিরলেও সেই থেকেই হরি প্রেমে মত্ত হন। কৃষিকর্মে অত্যন্ত পারক থাকা সত্ত্বেও হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনে আত্মহারা হয়ে হরিনামে রত হন। হীরামন গোস্বামী নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে হরিনামে প্রেমে মত্ত হন। পরে হীরামন গোস্বামীর অসুখ হলে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ফেলে আসেন তার বাড়ির লোকেরা। ফেলে আসা মৃতপ্রায় হীরামনকে সুস্থ করে নিজের করে নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। পরবর্তীকালে এই হীরামন গোস্বামী পাগল আখ্যায় ভূষিত হন ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকেই বহন করেছেন সারা জীবন। তিনি সংসারী থাকলেও পরে সংসার থেকে চলে আসেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছেও ভক্ত মানুষের মাঝে। হীরামন গোস্বামীকে যে কথা বলেন ঠাকুর তা বহিরঙ্গ ভক্ত মানুষের কাছে ব্যক্ত করতে নেই। একথা বলেছেন ভক্ত হীরামনকে। কেননা ভগবানে বিশ্বাস হল যার যার হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তির প্রকাশ। তাই একেই সকলের হৃদয় তৃপ্ত হয় না। আবার কেউ কোন অসম্ভব কিছু কারো মাঝে দর্শন করলেও তাকে গোপনে রাখাই নিয়ম। লোকসমাজে ব্যক্ত করতে নেই। ‘হীরামন পাগলের উপাখ্যান’ থেকে জানা যায়—

“মৃত্যুঞ্জয় হরি বোলা হল ভাগ্যক্রমে।
যাতায়াত করে প্রভু মল্লকাঁদি গ্রামে।।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে আসেন হরিচাঁদ।
সস্ত্রীক সেবেন হরিচাঁদের শ্রীপদ।।

.....

.....

রাউৎখামার বাসী হীরামন নামে।

প্রভু প্রিয় ভক্ত বড় অপার মহিমে।।

কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিবারে যায়।

সেই সঙ্গে ধান্য জমি আবাদ ইচ্ছায়।।

.....

পাঁচ সাতজন কিম্বা দশ বারো জন।

দলে দলে সারি সারি চলে সর্ব্বজন।।

.....

হীরামন সেই সঙ্গে চলে গাতা ধরে।।

মৃত্যুঞ্জয় ফুল সাজে সাজায়ে ঠাকুরে।

বসায়েছে উত্তর গৃহের পীড়ি পরে।।

.....

এমন সময় হীরামন ফিরে চায়।

ঠাকুরের ঐ সজ্জা দেখিবারে পায়।।

সকল কৃষককে ডেকে বলে হীরামন।

চল সবে করি গিয়া ঠাকুর দর্শন।।

নহে তোরা অগ্রেতে যা, পরে আমি যাব।

নহে তোরা সবে চল ঠাকুর দেখিব।।

এত বলি অগ্রে চলে বালা হীরামন।

বাটীর উপরে গিয়া উঠিল তখন।।

ঠাকুরের মনোহর ফুল সাজ দেখি।

এক দৃষ্টে চেয়ে রহে ঠাকুর নিরখি।।”[৪২]

হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে হীরামন গোস্বামী তার আপন কল্পনার ভগবানকে দেখতে পান হরিচাঁদ ঠাকুরের মধ্যে। ফলে আত্মজ্ঞান হারা হয়ে পড়েন ভক্ত হীরামন।

.....

"হীরামন স্কন্ধে ছিল বাঁশ এক খণ্ড।

থোড়া বাঁশ ধান্য তৃণ আকষণী দণ্ড।।

স্পন্দহীন বাক্য রোধ ভুজে নাহি বল।

পড়ে গেল থোড়া বাঁশ চক্ষে বহে জল।।

লোমকূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটন আকার।

স্বেদ বহে শরীরে চমকে বার বার।।

অবশ হইল অঙ্গ পড়িল ধরায়।

প্রভু বলে ওরে ধর ধর মৃত্যুঞ্জয়।।

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে ধরে তার হাতে।

বসাইল আনিয়া প্রভুর সন্মুখেতে।।

দ্বিমুহূর্ত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত ছিল হীরামন।

.....

প্রহরেক জড় প্রায় রহিল বসিয়া।

থেকে থেকে মাঝে মাঝে ওঠে শিহরিয়া।।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে হয়ে এল বন্ধ।

মুখে না নিঃশ্বরে বাণী কণ্ঠ হল রুদ্ধ।।

এমন সময় মহা প্রভু ডেকে কয়।

ফিরে পল হীরে ওরে ধর মৃত্যুঞ্জয়।।

মৃত্যুঞ্জয় গিয়া হীরামনে স্পর্শ করে।

অস্থিরতা ঘুচে সাধু শান্ত হৈল পরে।

মৃত্যুঞ্জয় কর্ণেতে শুনায় হরিনাম।"[৪৩]

এভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে আত্মহারা হয়ে ভক্তিতে বাধ্য হন হীরামন গোস্বামী। তাঁর প্রতি হরিচাঁদ ঠাকুরের যে কথাগুলি পাওয়া যায় তাতে ভগবানের ও ভক্তের আত্মদর্শন তথা গভীর কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

.....

"প্রভু কহে কহি তোরে ওরে হীরামন।
যদি কেহ কারু কিছু করে দরশন।।
অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে।
শুনিলে সন্দেহ হয় লোকের অন্তরে।।
শৈল মাঝে অগ্নি থাকে জানে সর্ব্বলোক।
ঠুক্কি লৌহা ঘাতে জ্বলে উঠে সে পাবক।।
তেমনি পাথর মাঝে রহিয়াছে অগ্নি।
দেখিতে পাইবা পুনঃযদি থাকে ঠুক্কি।।
কিন্তু সে আগুন যদি জ্বালাইয়া লয়।
শীলাকাষ্ঠ পুড়ে যায় কিছু নাহি রয়।।
তুমি আছ আমি আছি তাতে কিবা ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যাও নিজালয়।"[৪৪]

হীরামন গোস্বামী হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে তার অন্তরাত্মায় যে ভক্তি নিহিত ছিল তার প্রকাশ ঘটে। ফলে তার নিজের কাজ যে কৃষি কাজ তাও ছেড়ে দিয়ে হরিনাম করে। বাড়িতে গিয়ে এহেন আচরণের ফলে তার খুড়া বিদ্বেষ করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি হীরামন গোস্বামী অসুস্থ হলে তাঁকে ওড়াকাঁন্দি ফেলে আসেন। আবার হীরামন গোস্বামী ওড়াকাঁন্দি থেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসেন সংসার ধর্ম পালনের জন্য। কিন্তু হরিনামে মত্ত থাকেন সংসার কর্মের মাঝেও হীরামন গোস্বামী সাধনার জন্য রাত্রে গৃহত্যাগ করে নির্জন স্থানে বসে হরিনাম করতে যেতেন । তাতে তার নারী অভিযোগ করেন যে ভক্ত হীরামনকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়ানোর জন্য হরিভক্ত হীরামনকে অকথ্য অত্যাচার করেন। ভক্ত হীরামন হরিনাম যান যায় শেষে আর অত্যাচার সহ্য করতে পারেন না, তখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিবাদ করে ওড়াকাঁন্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে চলে যান। আর সেই থেকেই হীরামন গোস্বামী সংসারের মায়া ত্যাগ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আবার কখনও ভক্তালয়ে ভ্রমণ করতেন। এই হীরামন গোস্বামীর কথা বিস্তারিত বলতে গেলে একটি বড় অধ্যায় হয়ে যাবে। তাই যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করেই ব্যক্ত করার চেষ্টা করলাম— তবুও তৎকালীন সমাজে হীরামন গোস্বামী কত মানুষকে রোগারোগ্য করেছেন তার ইয়ত্তা

নেই। হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম গান করেছেন এবং মানুষকে হরিনামে মত্ত করেছেন এমন মানুষের সংখ্যাতীত বর্ণনা পাওয়া যায়। হীরামন গোস্বামীর অত্যাচার প্রসঙ্গ ও রোগারোগ্যকে তারকচন্দ্র সরকার এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''আমরা জানি তিনি স্বয়ং স্বরূপ।।
সব হরিবোলা করে সংসারের কার্য্য।

.....

হীরামন কার্য্য ত্যাগী দেখিয়া বিশেষ।
ঠাকুরের প্রতি কারু জন্মিল বিদ্বেষ।।
শ্রীচৈতন্যবালা হীরামনের সে খুড়া।
ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করে সেই বুড়া।।

.....

মতুয়া হইল এরা কি ধন পাইয়া।
বেদবিধি না মানে ফিরেছে লাফাইয়া।।

.....

আত্মস্বার্থ সমর্পণ বাবা হরিচাঁদে।
হরি বলে দিন রাতি করে সোরা সোরি।
বাবা যদি হরিচাঁদ যাক সেই বাড়ী।।

.....

হরিচাঁদ মৃত্যুঞ্জয় দোহে নাকি ব্রহ্ম।
এমরা বাচাতে পারে তবে জানি মর্ম্ম।।

.....

ডুবু তরী যদি হরিচাঁদ করে রক্ষা।
কেমন ঠাকুর তবে বুঝিব পরীক্ষা।।

.....

হীরামনে লয়ে গেল ওড়াকাঁদি বাড়ি।
হীরা মনে তুলে এক গাছ তলা রাখে।।

.....

প্রভু হরিচাঁদ তবে কহেন অগ্রজে।

.....

একরাত্রে নিজ্জনেতে বলে হরি হরি।

এ রোগী চিকিৎসা আমি করি বারে পারি।।

.....

সেই গ্রামে হরিবোলা মতুয়ারা দল।

ভকত বাচাও ভাই ভকত বৎসল।।

.....

প্রভু বলে যাহা হোক সবে যাহ ঘরে।

আমি দেখি চেষ্টা করে ঈশ্বর কি করে।।

সবে গেল প্রভু মাত্র রহিল একেলা।

মরা হীরামনে লয়ে সেই গাছতলা।।"[৪৫]

অসুস্থ মৃতপ্রায় হীরা মন সুস্থ হলে হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে নির্দেশ দেন মায়াতীত হয়ে হরি গুণ গান করার। হরিচাঁদ ঠাকুর হীরামন গোস্বামীকে শিক্ষা দেন সংসারে নারীর প্রতি কর্তব্য রয়েছে। তার প্রতি নির্দেশ দেন সংসার ধর্ম পালনের।

"যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ।

নিরোগ শরীর হল পূর্ণ শক্তি মান।।

উঠিয়া চরণ ধরি বলে ওহে নাথ।

এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ।।

যে দিন তোমার দেখা পাই মল্লকাঁদি।

পিঞ্জিরা রাউৎখামার পাখি ওড়াকাঁদি।।

ঠাকুর বলেন আমি জানি তা সকল।

সে কথায় কাজ নাই হরি হরি বল।।

এমত আমার কর্ম্ম রোগ ভোগ দিয়ে।

সংসার হইতে তোরে নিলাম উঠায়ে।

তোর প্রতি আর কারু থাকিল না দাবি।।

মায়াতীত হলি এবে হরিগুণ গাবি।।

.....

সংসারের মাঝে তুই কারু দায়ী নাই।

একমাত্র দায়ী রৈলী রমণীর ঠাই।।

যাও বাছা দিন কত করগে সংসার।

শোধ দিয়া এস গিয়া রমণীর ধার।।

জন্মিলে একটি পুত্র তাহার গর্ভেতে।

রমণীর ধার তবে পার শোধ হতে।।"[৪৬]

হীরামন গোস্বামীকে ভূতে পেয়েছে এই ভ্রান্ত ধারণায় ভূত তাড়ানোর ছলে হীরামন গোস্বামীকে অকথ্য অত্যাচার করেন তার পরিবার। তার বিবরণ পাওয়া যায় 'গোস্বামী হীরামনের প্রতি কালাচাঁদ ফকিরের অত্যাচার বিবরণ' অংশে। কালাচাঁদ ফকির রোগারোগ্য করার জন্য ভক্ত হীরামনকে শাস্তি দেন। একথা বলাই বাহুল্য যে যার হয়েছে হরি প্রেমোন্মাদ তাকে ফকিরকি রোগারোগ্য করতে পারবেন। বরং অত্যাচার করলে হরিভক্তি আর গভীরতা পায়। একথাই ব্যক্ত হয়েছে ভক্ত হীরামনের জীবনে। কবির বর্ণনায়—

.....

"রুলাখাতে করিবরে পাগলাই দূর।

দেখিব কেমন তুই পাইলি ঠাকুর।।

.....

দৃকপাত তাতে নাহি করে হীরামন।

ঝুকে ঝুকে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।

.....

ফকির বলেছে বাছা কহ শুনি কথা।

হেট মুণ্ডে রহে সাধু নাহি তুলে মাথা।।

মাথা নাহি তুলে সাধু শ্বাস ছাড়ে দীর্ঘ।

সবে বলে কই হল রোগের আরোগ্য।।

.....

পুন পৃষ্ঠ মোড়া দিয়া দুবাহু বাঁধিল।

হস্তদ্বয় বাঁধি তার একত্র করিল।।

সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া তার বাঁধিল যে কর।

দুই দুই অঙ্গুলী করিয়া একতর।।

ওঝা বলে ছেড়ে যাবি কিনা যাবি বোঝ।

এত বলি অঙ্গুলির মধ্যে মারে গোজ।।

খর্জ্জুর কন্টক তবে চারিটি আনিয়া।

নখতলে মাংস মধ্যে দিল বিধাইয়া।।

ভাল রজ্জু দিয়া দিল পিঠ মোড়া বাঁধা।

নাহি তাতে হাহা হুঁহু নাহি তাতে কাঁদা।।

.....

.....

পুনর্ব্বার বেকি অস্ত্র আগুনে পোড়ায়।

পোড়া যা উপরে যবে ধরিবারে যায়।।

এমন সময় উঠি হুঙ্কার করিয়া।

গাত্র মোড়া দিয়া দড়া ফেলিল ছিঁড়িয়া।।

হাতঝাড়া দিলে কাঁটা খসিয়া পড়িল।

আঙ্গুল বন্ধন হাত মোড়ায়ে ছিড়িল।।

.....

বেকি অস্ত্র কাড়িয়া লইল অতি কোপে।

আরক্ত লোচন ক্রোধে হীরামন কাঁপে।

বিনয় চৈতন্য বলে শুন ওরে বাপ।

অপরাধী তোর ঠাই করিয়াছি পাপ।”[৪৭]

এই অসহ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষে ক্রোধ প্রকাশ করেন ও সকলকে ত্যাগ করে হীরামন গোস্বামী শ্রীধাম ওড়াকাঁদি ঠাকুরের কাছে চলে যান। গিয়ে দেখল আঘাতের

চিহ্নগুলি সকলই ঠাকুরের গায়। আর হরিচাঁদ ঠাকুর হীরামনকে নিজ হাতে তার সেবা করেন ও তাকে নিজের করে নেন। এভাবে পুনরায় হীরামন গোস্বামী ও হরিচাঁদ ঠাকুরের মহামিলন হল।

.....

''ঝুকে ঝুকে করে হরিনাম উচ্চারণ।।

.....

উপনীত ওড়াকাঁদি প্রভুর শ্রীধাম।।

বীররসে রাগাত্মিকা ভাবের উদয়।

দেখি প্রভু হীরামনে ক্রোড়েতে বসায়।।

হীরমনে পুকুরের ঘাটে লয়ে পরে।

শ্রীকরেতে শ্রীনাথ শ্রীঅঙ্গ ধৌত করে।।

কর্দ্দম শৈবাল অঙ্গে লেগে রহিয়াছে।

কমল কন্টক অঙ্গ ক্ষত করিয়াছে।।

ধৌত করি হস্ত ধরি গৃহেতে লইল।

কর্পূর মিশ্রিত তৈল অঙ্গে মাখাইল।।

.....

মারিতে দিলে না প্রভু তুমি কৈলে মানা।

মারিতে আমার মনে হল বড় ঘৃণা।।

সকল তোমার খেলা কি খেলা খেলাও।

করিয়া করাও রঙ্গ মারিয়া মারাও।

মহাপ্রভু বলে আর কহিতে হবে না।

জানি সব তবু ইচ্ছা তোর মুখে শুনা।।''[৪৮]

ভক্তিতে বাধ্য হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর হীরামনকে বললেন—

''মম প্রাণাধিক তুই উত্তম পুরুষ।

পরাধীন নহ বাছা খাসের মানুষ।।

যথা তথা আছ বাছা তথা আমি আছি।

তোর কাছে আমি বাছা বিক্রিত হয়েছি।।''[৪৯]

এভাবে হীরামন ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। এবং এই হরিচাঁদ ঠাকুর অন্ত প্রাণ পুরুষগণ তৎকালীন সমাজে যে কাজগুলি করেছেন মানুষের জন্য আজও মানুষেরা পুরুষানুক্রমে ব্যক্ত করে থাকেন। এভাবে একা হরিচাঁদ ঠাকুর আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণের দেহে বহু হয়ে সমাজে 'হরিনাম' প্রচারও মানুষের কল্যাণ কর্ম করেন।

লোচন গোস্বামীর কথা বললে প্রথমেই বলতে হয় যে হরিচাঁদ ঠাকুরের থেকে বড় ছিলেন লোচন গোস্বামী। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে খুব মধুর ভাষায় সম্বোধন করতেন। এই সঙ্গে তারকচন্দ্র সরকারের কথাও বলে নেওয়া যায়। একদিন ওড়াকাঁন্দির ঠাকুর বাড়িতে তারকচন্দ্র সরকার আছেন সেই সময় লোচন গোস্বামী ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা শুনে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত তারকের মনে বড় সাধ হয় যে লোচন গোস্বামীর সেবা করার। লোচন গোস্বামীর হরিচাঁদ ঠাকুরকে ডাকছেন সেই ডাক ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভোজনের প্রসঙ্গটি কবিরসরাজ তারক সরকার বড় ভাল লেগে যায়। লোচন গোস্বামী তখন ভক্ত তারককে ডেকে তার পরিচয় নেন ও বলেন আমি জয়পুর গ্রামে যাই। তার অর্থ এই যে আমি তোমার বাড়িতে যাব। সেই কথা পরবর্তীকালে লোচন গোস্বামী রেখেছিল কবি তারকচন্দ্র সরকারের কাছে সাত বছর ছিলেন। লোচন গোস্বামীর কথাকে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামে তারক গিয়াছিল।
সেদিনে গোস্বামী ধামে উপস্থিত হল।।
ও হরি! ও হরি! বলে গোস্বামীজী ডাকে।
মহাপ্রভু ডাক শুনে পরম পুলকে।।
.....
দুই চারি পদ হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
মহাপ্রভু সঙ্গে রঙ্গে কথা কন গিয়া।।
ডেকে বলে ওহে হরি তুমি ত গোঁসাই।
আসিলে তোমার বাড়ী বড় ভাল খাই।।
সেই জন্য আসি আমি সময় সময়।

তোমার বাটীতে বড় ভাল পাক হয়।

.....

হরিচাঁদ প্রভু কন থাক এ বেলায়।

কৃষ্ণের নৈবেদ্য যেন তোমা হতে হয়।।

থাকিল লোচন হল ভোজন সময়।

চারিদণ্ড রাত্রিকালে বসিল সেবায়।।

ঠাকুরে বলেন হরি! তুমিও বসহ।

আমি এই বসিলাম মাতাকে বলহ।।

দুই ঘরে দুই প্রভু বসিল সেবায়।

উত্তরের ঘরে হরিচাঁদ দয়াময়।।

.....

ভোজন করেছে আর বলেছে লোচন।

বড়ই সুপক্ক স্বাদু সুক্তার ব্যঞ্জন।।

হেন ব্যঞ্জনাদি আমি কোথাও না পাই।

তোমার মন্দিরেতে উদর পুরে খাই।।

শান্তি মাতা ব্যঞ্জন দিলেন দুইবার।

তাহা শুনি ব্যঞ্জন দিলেন আরবার।।

আর বার বলে হরি খাইলাম ভাল।

কিবা সুব্যঞ্জন মম রসনা রসিল।।

.....

গৃহস্থ হয়েছে ভাল হইয়াছে ভাল।

মাতা ভাল পাক ভাল খাই আমি ভাল।।

.....

এই রূপে ব্যঞ্জন লইল পাঁচ বার।

প্রভু হরিচাঁদ বলে না লইও আর।।

তাহা শুনি লোচন ভোজন করে ক্ষান্ত।

হীন নিদ্রা জেগে থেকে নিশি করে অন্ত।''[৫০]

লোচন গোস্বামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ হীরামন গোস্বামীকে বাকসংযম শিক্ষা দিয়ে তার চরিত্রকে আরও দৃঢ় নিষ্ঠা দান করেন। লোচন গোস্বামী ভিক্ষা করতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে রয়ঃজেষ্ঠ ভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি যেমন করে হরিচাঁদ ঠাকুরকে নাম ধরে ডাকতেন তেমন আর কারো সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনিও বহু জায়গায় গিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা ব্যক্ত করতেন। ও হরিচাঁদ ভক্তগণকে যথাসাধ্য উপকার করতেন নানাভাবে।

এই লোচন গোস্বামী জয়পুর গ্রামে তারকচন্দ্র সরকারের কাছে দীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত করেছেন। তারকচন্দ্র সরকার লোচন গোস্বামীকে ওড়াকাঁন্দি দেখেছিলেন। সেসময় তারকচন্দ্র সরকারের মনে হয় কতদিনে গোস্বামীর সঙ্গ পাবেন। একদিন তারকের ঘাটে নৌকা রাখেন লোচন গোস্বামী। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের কাছে সাত বছর থেকে যান ভক্তিতে বাধ্য হয়ে—

''সে হইতে তারকের বাঞ্ছা ছিল মনে।
হেন গোস্বামীর সঙ্গ পাব কতদিনে।।
হেন প্রভু তারকের ঘাটেতে উদয়।
গলে বস্ত্র কর জোড়ে তারক দাঁড়ায়।।
তারক কহিছে প্রভু আমি সে কারক।
আপনার দরশনে শরীর পুলক।।
ঘাটে নৌকা লাগাইল তারক তখনে।
আনন্দে গোস্বামী লয়ে চলিল ভবনে।।
সে হইতে গোঁসাই রহিল সপ্তবর্ষ।
পূর্ণানন্দ সদা সবে নাহিক বিমর্ষ।।
সময় সময় যাইতেন অন্য স্থানে।
বেশী হলে থাকিতেন দুই তিন দিনে।।
তারকের হত যবে একান্ত মনন।
মন বুঝে এসে দেখা দিতেন তখন।।''[৫১]

এভাবে লোচন গোস্বামীকে কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। আর তারকচন্দ্র সরকার ছিল সর্ব কনিষ্ঠ ভক্তদের অন্যতম তার ফলে তারকচন্দ্র সরকার ছিল সকলের প্রিয়। তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন সাধক ও সুগায়ক।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত গোলক কীর্ত্তনীয়া কীভাবে ওড়াকাঁন্দি ঠাকুরের ভক্ত হন সেই কাহিনিটি আলোচনা করব। গোলক কীর্ত্তনীয়া হল বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক। তিনি সুগায়ক ও সুশাস্ত্র বক্তাও ছিলেন। রামায়ণ গান করে জগৎ মাতালেও তিনি ছিলেন আত্মগর্বি মানুষ। তিনি যখন বাতব্যাধিতে শয্যাগত তখন গ্রামের মানুষ পরামর্শ দেন যে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভক্তি করলেই তিনি ভাল হতে পারেন। গোলক কীর্ত্তনীয়া নানা অবাক্য কুবাক্য বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে। পরে সকলের অনুরোধে তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে গেলেও তিনি বলেন তিনি যদি অন্তর্যামী স্বয়ং ভগবান হন তাহলে তার কথা বলে দেবেন এবং তখন তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। এভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরকে নানা কটুক্তি করেন বাড়িতে বসে। পরে গোলক কীর্ত্তনীয়াকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক কীর্ত্তনীয়ার বাক্যাবলী আদ্যপ্রান্ত বলে দেন। গোলোক কীর্ত্তনীয়ার আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয় ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে নিজেই আত্মসমর্পণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তার ভক্তদের কাছে কত যে পরীক্ষা দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর অবশেষে পরীক্ষাকারীরা নিজেই পরীক্ষকের কাছে পরীক্ষা দিয়েছে ভক্তির দ্বারা। তারা সারা জীবন বংশানুক্রমে ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হন। এভাবেই ওড়াকাঁন্দির হরিচাঁদ ঠাকুর সকলের প্রাণের ঠাকুরে পরিণত হন। গোলক কীর্ত্তনীয়া ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায় শারীরিক অসুখ থেকে মুক্ত হন যেমন তেমনি মানসিক ব্যাধিরূপ আত্ম অহংকার মুক্ত হতে পারেন ঠাকুরের কৃপা শক্তি প্রভাবে। হরিচাঁদ ঠাকুরও গোলক কীর্ত্তনীয়ার যে কথোপকথন সেখান থেকে ভক্ত ও ভগবানের এক গভীর হৃদয়স্পর্শী ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে কাব্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

> ‘‘মল্লকাঁদি বাসী কীর্ত্তনীয়া রঘুনাথ।
>
> তস্য জেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রীগোলকনাথ।।
>
> .....
>
> রামায়ণ গান যদি হত কোন খানে।

বাল বৃদ্ধ যুব মত্ত হইত সে গানে।।

রাম রাম বলি যবে ধরিতেন তান।

স্মৃতি শূন্য হত কারু না থাকিত জ্ঞান।।

এইভাবে গান করে জগৎ মাতাল।

এবে শুন যে ভাবেতে হরিবোলা হল।।

বাত ব্যাধি হয়ে ক্রমে অঙ্গ পড়ে গেল।

ধরা শয্যা গত ক্রমে অচল হইল।।

সবে বলে হরি ঠাকুরের কাছে চল।

তাহার কৃপাতে কত রোগ মুক্ত হৈল।।

এদেশে আসেন তিনি রাউৎখামার।

এগ্রামেও এসে থাকে মৃত্যুঞ্জয় ঘর।।

সেই ঠাকুরকে ভক্তি কর মহাশয়।

মরা জীয়াইতে পারে যদি দয়া হয়।"[৫২]

গোলক কীর্ত্তনীয়া আত্মগর্বি ছিল তার পরিচয় পাই আমরা—

"গোলক বলেছে আমি ঠাকুর না মানি।

ওর মত ঠাকুর কত মোট বইতে আনি।।

.....

যত সব মুর্খ ভেড়ে ঠাকুর পেয়েছে।

ঠাকুরালী খাটে না এ গোলকের কাছে।।

শ্রীহরিচাঁদে গুণে বলিহারি যাই।

ছিল ক্ষুদ্র নমঃশূদ্র হয়েছে গোঁসাই

.....

গোলকে তরালে বলি গোলকের নাথ।

দুর্ব্বাক্য আমি যে কত বলেছি তাহারে।

.....

দেখি সে ঠাকুর কি করিতে পারে।।

কর্ম্ম ক্ষেত্রে ভবজীবে ভোগে কর্ম্মফের।

সারিতে না পারে যদি শেষে পাবি টের।।

যদি বলিবারে পারে হৃদয়ের কথা।

তবে তার শ্রীচরণে নামব এ মাথা।।"[৫৩]

গোলক কীর্ত্তনীয়া কেন সকল মানুষই কৌতুহলাক্রান্ত থাকেন। অবিশ্বাস, আত্ম অহংকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। আত্মদর্শনকারী মানুষের স্মরণাগত হলে তিনি মানুষকেও আত্মদর্শন করার মতো সুযোগ দেন। তবেই আত্মসম্বিত ফিরে পান আত্ম অহংকারী মানুষ। আর মহৎ মানুষ যে পরশমণি তা তাঁর সানিধ্য ছাড়া বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে গোলক কীর্ত্তনীয়াও হরিচাঁদ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভের আগে আত্ম অহংকারী থাকলেও পরে তিনি আত্মসমর্পণকারী মানুষে পরিণত হন। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই যারা হরিচাঁদ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আত্মপরিচয় বর্গের সুপরামর্শ শোনেন গোলক কীর্ত্তনীয়া। কবির বর্ণনায়—

.....

"আত্ম পরিজন আর প্রতিবাসী লোকে।

সবে মিলে বলে কয়ে বুঝায় গোলকে।।

এ সময় গৌরব তোমার ভাল নয়।

অহংকার ছাড় এই অন্তিম সময়।।

আত্ম শুদ্ধ করিয়া বলহ হরি হরি।

ঠাকুরের নাম হরি দেয় হরি নাম।

ইহকালে পরকালে পুরে মনষ্কাম।।

নহে দেব দেবী নহে কোন রূপ বার।

দেখিলে প্রত্যয় হবে স্বয়ং অবতার।।"[৫৪]

এরপর গোলকের মন পরিবর্তন হয় ও সকলে মিলে গোলক কীর্ত্তনীয়াকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। গোলোক কীর্ত্তনীয়া ঠাকুর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল তা বলেন। পরে গোলকের সাথে ঠাকুরের ভাবালাপের থেকে বোঝা যায় ঠাকুর কতটা মানবতার পূজারী। ও কতটা মানুষকে নিজে ভালোবেসে ধরা দেন ও সকল রোগী, ভোগী দুঃখী মানুষকে। হরিচাঁদ ঠাকুর সকলকে গোলকের কথা বলেনও গোলকের অন্তরের কথাগুলিও ব্যক্ত করেন।

"ঠাকুর আছেন বসে উত্তরের ঘরে।

গোলকে রাখিল নিয়া পীড়ির উপরে।

.....

ঠাকুর বলেন আমি কিসের মানুষ।

বিদ্যা বুদ্ধি হীন আমি অতি কাপুরুষ।।

রঘু কীর্ত্তুনের বেটা গোলক কীর্ত্তুনে।

আমি কি মানুষ বাপু উহার ওজনে।।

.....

মোর মত লোক ওর নার দাড় বায়।

মোর মত লোক ওর মোট বয়ে খায়।।

.....

কোথা হতে আসিয়াছি ঠাকুর কিসের।

ব্যাধি যদি নাহি সারে শেষে পাব টের।"[৫৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা শোনার পর গোলকের আত্ম জাগরণ ঘটল। তখন সম্বিত ফিরে পেলেও নিজের মনের যে পতিতা বস্থা ঘটেছে আত্ম অহংকারে, সেই কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। গোলক কীর্ত্তনীয়াকে হরণ করার কথা গোলক বলেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরকে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দান করে আত্মসাথে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে তার প্রার্থিত ভক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের করে নিয়ে তাকে আত্মশুদ্ধ করলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভক্ত গোলকের ভাবালাপে দেখা যায় ভক্ত গোলক হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেনও ঠাকুর তাকে গ্রহণ করেন।

".....

শুনিয়া বিস্মিত হৈল গোলকের মন।

উঠিতে পারে না বলে দেহ শ্রীচরণ।।

.....

সুখে মত্ত হইয়া হয়েছি চির দুঃখী।।

যারা মোরে আনিয়াছে তোমার নিকট।

তাহাদের সঙ্গে আমি করিয়াছি হট।।

সবে বলে তুমি নাকি স্বয়ং অবতার।

ত্যক্ত হয়ে তাদের করেছি কটূত্তর।।

.....

তুমি ত করুণানিধি আমি দুরাচার।।

পতিত পাবন নাম ধর দয়াময়।

এমন পতিত আর পাইবা কোথায়।।

কোন যুগে পেয়েছ কি এমন পতিত।

মহা উদ্ধারণ নাম ধর কর হিত।।

.....

ভক্তিহীন জ্ঞানহীন আমি পাপাচারী।

.....

ভূভার হরণ জন্য তব অবতার।

এবার হর হে হরি গোলকের ভাব।।

.....

সদ্যপি ভর্ৎসনা করি তবু তুমি সাই।

জিহ্বা মন বাক্য তুমি গোলক গোঁসাই।।''[৫৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক কীর্ত্তনীয়ার মোট রূপে দুঃখ-যন্ত্রণাকে বয়ে দিয়ে তার সব সংকট থেকে মুক্তি দেন। এবং এ প্রসঙ্গে এও বলেন জগতের মোটও তিনি বয়ে সংকট ঘুচাবেন একথা ব্যক্ত করেন।

.....

''ঠাকুর বলেন বাছা নহে তো কপট।

আমার মত ঠাকুরে বহে তোর মোট।।

জগতের মোট বহি ঘুচাই সংকট।

দেরে মোট উঠাইয়া বহি তোর মোট।।

গোলক বলিছে মোট দিব দয়াময়।

হেন শক্তি দেহ যদি তবে দেওয়া যায়।।

মোট যদি নিতে চাইলে বলিলে শ্রীমুখে।

তবে মোট নিতে হবে এই দায় ঠেকে।।

তুমিত করুণাময় এবে গেল বোঝা।

নিজ শক্তি প্রকাশিয়া তুলে লও বোঝা।

ঠাকুর বলেন ভাল ঠেকাইলি দায়।

নিলাম এ বোঝা গা তুলিয়া বয়।।

গোলকের দেহে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।

গেল রোগ সে গোলক উঠিয়া বসিল।।

.....

প্রভু বলে যা গোলক যা এখন ঘরে।

ভক্তিগুণে বন্দী রহিলাম তোর ঘরে।।

গোলক বলিছে আর নাহি দিব ছাড়ী।

ভক্তি নাই দয়া করে চল মম বাড়ী।।

.....

ঠাকুরে প্রণাম করি গোলক উঠিল।

হরিধ্বনী দিয়া গৃহে হাটিয়া চলিল।।

.....

গোলক হইল ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত।

পাসরিতে নারে গুণ সদা করে ব্যক্ত।।

দিবা বিভাবরী হরিনাম সংকীর্ত্তন।

হরিচাঁদ প্রীতে হরি বলে সর্ব্বজন।।

হরিচাঁদ লয়ে যেত ভক্তগণ সাথে।

মাঝে মাঝে যান সে গোলকের বাড়ীতে।”[৫৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে গোলক কীর্ত্তনীয়া পরপোকার করতে প্রস্তুত হন। কীভাবে পরউপকার করা যাবে সেই শিক্ষা হরিচাঁদ ঠাকুর তার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের দিতেন ও সেই আজ্ঞা

অনুসারে ভক্তগণ পরউপকারে রত হতেন। গোলক কীর্ত্তনীয়াকে ঠাকুর যেভাবে শিক্ষা দেন সেই সমস্ত শিক্ষা নীতি তুলে ধরলাম। প্রথমে গোলক কীর্ত্তনীয়াকে হরিচাঁদ ঠাকুর যা বললেন—

''ওড়াকাঁদি গোলক কীর্ত্তুনে আসে যায়।
ঐকান্তিক ভক্তি হরিঠাকুরের পায়।।
একদা শ্রীহরি বসি পুষ্করিণী তীরে।
গোলক বসিল গিয়া ঠাকুর গোচরে।।
.....
অমূল্য ধনের মূল্য কিছু না পাইলি।।
.....
আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিব শুনি তাই।।
ঠাকুর কহেন বাছা ধর্ম্ম কর্ম্ম সার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ পর উপকার।।
কীর্ত্তনীয়া বলে হে তারক ব্রহ্ম হরি।
আমি কি পরের ভাল করি বারে পারি।।
মহাপ্রভু বলে বাছা বলিরে তোমায়।
কেহ যদি ঠেকে কোন আধি ব্যাধি দায়।।
ওড়াকাঁদি আসিতে যে করে মনন।
এ পর্য্যন্ত আসিতে দিও না বাছাধন।।
আমাকে ভাবিয়া যাহা তোর মনে আসে।
তাহাই বলিয়া দিসে মনের হরিষে।।
তাহাতে লোকের হবে ব্যাধি প্রতিকার।
ইহাতে হইবে তোর পর উপকার।।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই খেতে দিস।
হরিনামে মানসিক করিতে বলিস।।
রোগ মুক্ত হলে সেই মানসার কড়ি।
রোগা ভক্তি কলিতে হয়েছে বড় ব্যক্ত।

রোগমুক্ত হবে সবে হবে হরি ভক্ত।।

.....

নিজে না হইও লোভী অর্থের উপর।

তাহা হলে করা হবে পর উপকার।।"[৫৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে গোলক কীর্ত্তনীয়া পর উপকারে রত হন। এবং দক্ষিণ দেশ গোলক কীর্ত্তনীয়ার দ্বারা 'হরিনাম' গানে মত্ত হন। কবির ভাষায়—

"শুনিয়া গোলক বড় হরষিত হয়ে।

সারিতে লাগিল ব্যাধি হরিনাম দিয়ে।।

অনেক লোকের ব্যাধি হইয়া মোচন।

হরিভক্ত হয়ে করে হরি সংকীর্ত্তন।।

রাউৎখামার আর মল্লকাঁদি গ্রম।

চারিদিকে সব লোকে করে হরিনাম।।

এই রূপে ভক্ত সব হইতে হইতে।

প্রকাশ হইল ধর্ম্ম দক্ষিণ দেশেতে।।

বর্ণি বাসুড়িয়া দলোগুণি আট জুড়ী।

পাটগাতী কলাতলা গ্রাম বড়বাড়ী।"[৫৯]

এই যে ভক্তদের উদ্ধার করেন হরিচাঁদ ঠাকুর রোগ থেকে তারা হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণকারী ভক্তদের দ্বারাই তিনি মানুষের সমাজে পরউপকার করেন। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজে 'হরিনাম' দ্বারা আত্মজ্ঞান দান করেন এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাকে সম্পূর্ণরূপে মানবতায় প্রতিষ্ঠা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর শারীরিক মানসিক উভয়দিকে চিকিৎসা করে পূর্ণ মনষ্যত্ববোধে মানুষকে পূর্ণতা দেন। এমনকি তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ও শিক্ষা দেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরকে খুব ভাল বাসতেন। তিনি ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতম। দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরকে রোগীরা বিরক্ত করে দেখে খুব কষ্ট পেতেন। আর রোগ যদি না থাকে সংসারে তাহলে হরিচাঁদ ঠাকুরকে কোন রোগাভক্ত বিরক্ত করবে না এই অভিপ্রায়ে দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরকে

বলেন সংসারের রোগ নিয়ে তিনি একা ভুক্ত ভোগী হতে চান। হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বৈরাগীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেন ও বলেন যে তোর বাঞ্ছাপূরণ হবে বার বছর পর। দশরথ বৈরাগীকে পরীক্ষাও করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত দশরথের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভক্ত দশরথের কথাতে ব্যক্ত হয় গভীর হৃদয়ার্ত্তির দিক। দশরথ বৈরাগী নিজেই যেচে নেয় রোগ হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারী হয়ে জীবন যাপন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথকে মহাভগবত ভক্ত রূপে পরিচিত হওয়ার শিক্ষা দেন। দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশমত সকল অত্যাচার সহ্য করেও তার জীবনচর্যা থেকে বিচ্যুত হন নি। শেষে ঠাকুর তাকে মহাভাগবত ভক্ত রূপে অ্যাখ্যা দেন। দশরথ হরিচাঁদ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছা প্রকাশ, রোগ ভোগের নির্দেশও তার পালন করার আজ্ঞা করেন। কবির ভাষায়—

দশরথের কথায়—

"সাধুসুত দশরথ উপাধি বৈরাগী।
রাউৎখামার বাসী মহা অনুরাগী।।
প্রভু যবে লীলাখেলা করে এই মতে।
এই সময় দশরথ প্রেমে যায় মেতে।।
প্রভুর সঙ্গেতে ফিরে সেই দশরথ।
হইলেন প্রভু প্রিয় পরমভকত।।
প্রভু স্থানে আসে লোক হয়ে ব্যাধিযুক্ত।
প্রভুর আজ্ঞায় তারা হয় ব্যাধিমুক্ত।।
তাহা দেখি মনে দুঃখী দশরথ ভক্ত।
রোগা ভক্ত প্রভুকে করয় বড় ত্যক্ত।।
মনোদুঃখে দশরথ গিয়া প্রভু স্থানে।
কর জোড়ে নিবে দিল প্রভুর চরণে।।
বহু লোক রোগযুক্ত হয়ে বহু দেশে।
রোগে মুক্তি পাইতে তোমার ঠাই আসে।।
আত্মসুখী রোগাভক্ত ব্যাধি মুক্তে তুষ্ট।
তাহাতে আমার মনে হয় বড় কষ্ট।।

আমার মনের ইচ্ছা যত লোক রোগী।

সবাকার রোগলয়ে আমি একাভোগী।।

ওহে দয়াময় হরি আজ্ঞা কর তাই।

সবাকার রোগ লয়ে একা কষ্ট পাই।।

রোগী না থাকিলে ভবে কেহ আসিবে না।

তোমাকে ওরুপ ত্যক্ত কেহ করিবে না।।

অহৈতুকী ভক্তিমান ভক্ত আছে যারা।

প্রেমের পিপাসু হয়ে আসিবেক তারা।।

সেই সঙ্গে হবে সুখে প্রেম আলাপন।

দয়া করি বল নইলে ত্যাজিব জীবন।''[৬০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কষ্টকে দশরথ বৈরাগী নিজে বহন করতে চাইছেন। যারা মূলত রোগমুক্তির পর হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভক্ত হন। সেই জন্য রোগকে নিজে বহন করতে চান। হরিচাঁদ ঠাকুরকে যারা অহেতুক ভাবেই আত্মসমর্পণ করে ভালোবাসে তাদের সঙ্গে তিনি সুখে থাকতে পারবেন অভিপ্রায়ে ভক্ত দশরথ সেধে রোগ যুক্ত হন। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত দশরথের ইচ্ছা পালন করেছে পরীক্ষার মাধ্যমে। আর ভক্ত দশরথও সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভক্ত মহাভাগবতে পরিণত হয়েছেন।

''প্রভু বলে দশরথ একি কথা কও।

সংসারের রোগকি উঠায়ে নিতে চাও।।

কর্ম্মক্ষেত্রে সংসারেতে কর্ম্মমহাবল।

সকলেই পায় কর্ম্ম অনুযায়ী ফল।।

তবে তোর বাঞ্ছাহেতু দিব তোরে রোগ।

বার বৎসরের পরে হবে তোর ভোগ।।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা হইল সন্তুষ্ট।

বার বছরের পর হল তার কুষ্ট।।

ঠাকুর বলেন বাছা আর কিবা চাও।

সংসার ছাড়িয়া এবে ভিক্ষা করে খাও।।

কতদিনে এই ভাবে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত।

আজ্ঞামতে পরে নিলে অযাচক বৃত্ত।।

.....

বাক বন্ধ করিয়া থাকিবা ছয়মাস।

মরিলেও কিছু নাহি করিও প্রকাশ।।

.....

যে ডোর কপিন কন্থা করিবা ধারণ।

অন্য বস্ত্র কপিন কন্থানা পরিবা কদাচন।।

ছয় মাস গত হলে দিবসে বেড়াইও।

ভাবের ভাবুক হলে তার বাড়ি যেও।।

নিশিতে থাকিয়া তার সঙ্গে বল কথা।

তাহা ভিন্ন অন্য কথা না কহিও কোথা।।''[৬১]

মানুষ যে অন্তরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন আর ঠাকুর মানুষের অন্তরের প্রার্থিত প্রার্থনাকে সর্বদাই পূরণ করেন একথা ভক্ত দশরথকে হরিচাঁদ ঠাকুর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। মানুষ সর্বদাই আত্মসুখ সন্ধান করেন। এই যে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদশরথ কিন্তু নিজের আত্মসুখকে বর্জন করেছে হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভালোবেসে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের থেকে দশরথের চিত্ত ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের সুখ সন্ধানী চিত্ত। এখানে দশরথ বৈরাগী সকলের থেকে অন্যরকম ভক্ত। দশরথ বৈরাগীকে হরিচাঁদ ঠাকুর মহাভাগবত বলে বর্ণনা করেছেন।

ভক্ত দশরথের হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভাবালাপ প্রসঙ্গটি কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''তোর যে ভাবনা আছে বহুদিন হতে।

ভাবিলে ভাবনাসিদ্ধি পারিলে ভাবিতে।।

যে যাহা ভাবনা করে ঠাকুরের স্থান।

অবশ্য অভীষ্ট পূর্ণ করে ভগবান।।

.....

নিঃস্বার্থ ভাবেতে যেই পর উপকারী।

অকামনা শুদ্ধ প্রেম তারে ব্যাখ্যা করি।।

আত্মসুখে কর্ম্ম করে তারে বলে কাম।

পর সুখে কর্ম্ম করে ধরে প্রেমনাম।।

মম কষ্ট ভেবে মম সুখের নিমিত্তে।

তব ইচ্ছা সদা পর উপকার অর্থে।।

.....

ভাগবত তুমি তাহা জানিলাম সত্য।

তোমার প্রেমেতে আমি হইনু বিক্রিত।।

সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বরোগী সর্ব্বভোগী যেই।

মাধুর্য্যের পাত্র মহাভাগবত সেই।।

সর্ব্বত্যাগ করি বাছা পরিলে কৌপিন।

সর্ব্বরোগী সর্ব্বভোগী হলে উদাসীন।।

কি ব্যাখ্যা করিব তোরে নাহি বলাবল।

কি ফল ব্যাখিব তোরে নাহি ফলাফল।।

.....

দশরথ বলে আমি বড়ই জঘন্য।

তব বাক্য সত্য আমি আজ হতে ধন্য।।

অযাচক বৃত্তি ভিক্ষা প্রবৃত্ত হইল।

দেশে দেশে অইভাবে ভ্রমিতে লাগিল।”[৬২]

দশরথ বৈরাগীর সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের যে ঐকান্তিক প্রেমময় সম্পর্ক সে পরিচয় পাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস, সূর্য্য নারায়ণ ও তারকচন্দ্র সরকারের আত্মীক পরিচয়টিও জ্ঞাত হওয়া যায়। অযাচক বৃত্তি অবলম্বনের সময় একদিন দশরথকে পীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, সেই সময় মনে মনে প্রার্থনার কথা বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরকে। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মল্লকাঁদি থেকে কালিনগরে বাস করলে সেই বাড়িতে একদিন ভক্ত দশরথ যান ও তাদের সঙ্গে ভাবালাপ করেন। আর সেই সঙ্গে তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন। ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

.....

"একদিন ঠাকুর বলেন মৃত্যুঞ্জয়।

করগে কালীনগরে বসতি আশ্রয়।।

ভিটা ছাড়ি করে বাড়ী সে কালীনগর।।

.....

দশরথ উপনীত দিবা অবসানে।

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ সূর্য্য নারায়ণ।

তার মধ্যে হইলাম আমি একজন।।

.....

..... কহেন মৃত্যুঞ্জয়।

সেধে সেধে নিলে ব্যাধি হইলে আতুর।

ঠাকুর পরীক্ষা করে সহ্য কতদূর।।"[৬৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ভক্তগণের সাহায্যে ঠাকুর তৎকালে যে সমাজ সংগঠন করেছিলেন তার পরিচয় পাই। দশরথ বিশ্বাসের ভক্ত হবার পর। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোস্বামী দশরথ বিশ্বাস প্রধান ভক্তদের মধ্যে পড়ে। দশরথ বিশ্বাস হরিঠাকুরের কাছে যায় রোগারোগ্য কামনায়। দশরথ বিশ্বাস রোগমুক্ত হনও হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে তিনি বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করেন। দশরথ বিশ্বাস ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভক্ত। ফলে তিনি শাস্ত্রমতানুযায়ী যথাবিধি স্নান, পূজা, তিলক ধারণ, মালা জপ করতেন এবং স্নান আহ্নিক নিয়ম মত পালন করতেন। এবং নিরামিশ আহার করতেন। এহেন বিধি ভক্ত ছিলেন দশরথ বিশ্বাস। এবং এও তিনি মেনে নিতে পারছেন না যে হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং হরি আবির্ভূত বলে। তাই তিনি দেখে তারপর মানতে চাইলেন। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রাদর্শকে একটি পূর্ণ মানবসত্তার আধারকে আমরা পাই। তৎকালীন সময়ে গুরুবাদ ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে সমাজে গুরুদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর এই গুরুদের মনুষ্যত্ব হীনতাকে ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুদের আলাদা গুরুত্ব দেন নি। তিনি যথার্থ ভাবেই সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজের ব্যাভিচার নীতির সবগুলিকে বর্জন করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুদের কোন আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত করেন নি। হরিচাঁদ

ঠাকুর মানুষকে পূর্ণ মানবতা বোধে উন্নীত হওয়ার জন্য যা কিছু কর্মের প্রয়োজন তার সকল কিছু করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর পূর্ণ জ্ঞানালোক সম্পন্ন মানুষ তার পরিচয় আমরা এই দশরথ বিশ্বাসের সঙ্গে তার কথপোকথন থেকে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি। দশরথ বিশ্বাসের বাড়িতে হরিনাম করার জন্য অভিযোগ করেন নায়েব মহাশয়কে গ্রামবাসী মানুষ যারা 'হরিনাম' কারী ভক্ত তথা 'মতুয়া'দের বিরুদ্ধেবাদীরা। নায়েব হরিসংকীর্তনের সময় ভক্ত দশরথের বাড়িতে আসেন। এবং পরে ভক্ত দশরথকে অত্যাচার জরিমানা করেন। নালিশ যায় সাহেব কুঠিতে। ডিক সাহেবের কুঠিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের যান। নিয়ে অত্যাচারের বিচারের জন্য মহিলাদের নিয়ে বিচার সভা ও মহিলা কাছারী করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ থেকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছি। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

দশরথ বিশ্বাসের চরিত্র—

''দশরথ নামে সাধু পদ্মবিলা বাসী।
তত্ত্বজ্ঞানী হরিনামে মত্ত অহর্নিশি।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
করে একাদশী ব্রত তুলসী সেবন।।
তিন সন্ধ্যা মালা জপ তিলক ধারণ।
হরিনাম ছাপা অঙ্গে অতি সুশোভন।।
নিত্য নিত্য প্রাতঃ কৃত্য স্নানাদি অর্পণ।
গুরু পূজা কৃষ্ণ পূজা নৈবিদ্য অর্পণ।
পক্ষে পক্ষে একাদশী শ্রীহরি বাসর।
স্তব পাঠ নাম পাঠ নাহি অবসর।।
চৈতন্য চরিতামৃত পঠে ভাগবত।
সাধু সেবা মহোৎসব করে অবিরত।।
দিবাহারী এক সন্ধ্যা নাহি দ্বিভোজন।
আতপ তণ্ডুল অন্ন লাবড়া ব্যঞ্জন।।
তৈল মৎস ত্যাগী ভক্ষে দিনে একবার।
রাত্রে কিছু ফলাহার কভু অনাহার।।

.....

দৈবে ব্যাধি যুক্ত হল কার্ত্তিক মাসেতে।

জ্বর হয়ে ভুগিলেন কতদিন হতে।''[৬৪]

দশরথের বিশ্বাসের রোগ সংবাদ ও ওড়াকাঁন্দি পৌঁছানো কথা—

''আরক পাচন বটী কত খাইতেছে।

ক্রমশঃ জ্বরের বৃদ্ধি দুর্ব্বল হতেছে।

ভাল বৈদ্য চিকিৎসক কতই আসিল।

বাছিয়া বাছিয়া কত ঔষধ খাইল।।

তবু রোগ শান্তি নাই হইল কাতর।

শক্তি নাই যষ্টিমাত্র চলিতে দোসর।।

প্রচলিত হইয়াছে হরি বলা মত।

কত লোক ওড়াকাঁদি করে যাতায়াত।।

.....

না দেখিলে চক্ষুকর্ণ বিবাদ না ঘুচে।

অবশ্য যাইব দেখিবার ইচ্ছা আছে।।

.....

রহিলেন গিয়া বুদ্ধি মন্তের আশ্রমে।।

ঠাকুরের কথা তথা সকল শুনিল।।

শুনিয়া অন্তরে বড় ভক্তি জনমিল।।

.....

হরি হরি বলি উতরিল ওড়াকাঁদি।

.....

ঠাকুর বলেন বাছা কি নাম তোমার।।

দশরথ বলে আমি বড় দুরাচার।

নাম মোর দশরথ পদ্মবিলা বাস।।''[৬৫]

দশরথ বিশ্বাসকে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজের কথা বলছেন ও তার শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে ক্রিয়া

প্রণালীকে মনে প্রাণে পালন করেছেন সেই বর্ণনা করে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেকে এক অতি তুচ্ছ মানুষ বলে বর্ণনা করছেন। কেননা দশরথ বিশ্বাস হরিচাঁদ ঠাকুরের সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করতেন। দশরথ বিশ্বাস হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসলে সেই কথা ব্যক্ত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের দশরথ বিশ্বাসের কাছেকে নিজের কথা তাচ্ছিল্য ভাবে বলেন—

"প্রভু বলে তুমি তো দশরথ বিশ্বাস।
তুই তো বিশ্বাস আমি বড় অবিশ্বাস।
তন্ত্রে মন্ত্রে শৌচাচারে নাহয় বিশ্বাস।।
কেন বা আসিলি বাছা আমার নিকটে।
তুই শুদ্ধাচারী মোর শৌচ নাই মোটে।।
তিন বেলা সন্ধ্যাকর আর স্নানাহ্নিক।
স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক।।
কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।
মোর ঠাই এলি বাছা কিসের কারণ।
কহ শুনি মনো কথা বুঝি তোর মন।।
প্রকাশিয়া বল শুনি ওরে দশরথ।
শুদ্ধাচারী সাধু তোর কিবা মনোরথ।।
কি জানি কি ওড়াকাঁদি না হয় প্রত্যয়।
কোথাকার হরি এল ওড়াকাঁদি গায়।"[৬৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন সত্যিই মানব দরদি ও মানবতার পূজারী। হরিচাঁদ ঠাকুরের এহেন কথায় শব্দগুলির মমার্থ হল আত্মসংস্কার জন্য সমস্ত বেদ বিধির প্রয়োজন হয় মানুষের। আত্মসংস্কার করার জন্য মানুষের হরিচাঁদ ঠাকুর। সর্বদাই মানুষের উপায় নির্ধারণ করতেন। শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দেশানুসরণ মানুষ করে আত্ম চৈতন্য লাভ করার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু হৃদয় পবিত্র দরকার মানুষের প্রথমে। বহিরাগত শুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয় শুদ্ধির কথাই পাব হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্ত দশরথ বিশ্বাসের ভাবলোপে।

দশরথ বিশ্বাসের আত্মসমর্পণ ও হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসায় দশরথের সকল মানসিক

শারীরিক ব্যাধি মুক্তি। দশরথ বিশ্বাস আত্মসমর্পণ করেন এভাবে—

.....

''শুনি দশরথ পড়ে পদে লেটাইয়ে।

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহে চরণে ধরিয়ে।।

সারে বা না সারে রোগ তাতে নাহি দায়।

দয়া করি হরি মোরে রেখ রাঙ্গা পায়।''[৬৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যাধিমুক্তি দশরথের—

''প্রভু কহে এত তোর সাধন ভজন।

শুদ্ধাচারী বৈরাগীর ব্যাধি কি কারণ।।

প্রভু কহে দশরথ তোমারে জানাই।

শৌচাচার করে তোর হল শুচিবাই।।

স্নান না করিয়া কিছু খাওনা কখন।

স্নান না করিয়া অদ্য করগে ভোজন।।

কল্য ভাত রাঁধিয়া রেখেছে জল দিয়া।

কাঁচা ঝাল দিয়া সেই ভাত খাওগিয়া।।

.....

দশরথে দেহ কাঁচা লঙ্কা পান্থা ভাত।।

জগন্মাতা দিল অন্ন আর কাঁচা লঙ্কা।

দশরথ বলে মোর গেল মৃত্যু শঙ্কা।।

কিছার এ্যহিক জ্বর ভবরোগ গেল।

অন্ন পাত্র ধরি সাধু মস্তকে রাখিল।।

বহুদিন অরুচি না পারে কিছু খেতে।

অদ্য এত রুচি নাহি পারে ধৈর্য্য হতে।।

বড়ই বেড়েছে রুচি বড়ই সুস্বাদ।

সাদু কহে আর বার দেহ মা প্রসাদ।।''[৬৮]

দশরথ বিশ্বাসের সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবালাপ থেকে বোঝা যায় বাহ্য শৌচের দ্বারা

কখনোই ভগবানকে পাওয়া যায় না ভগবানকে পাওয়া যায় আত্ম শুদ্ধ হলে। আর আত্ম শুদ্ধ হতে হলে সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকে আত্ম শুদ্ধ হওয়া যায় ও ভগবানকে পাওয়া যায়। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বিশ্বাসকে গৃহধর্ম পালনের জন্য বিবাহ করার নির্দেশ দেন। তারপর স্নান পূজার জন্য নিয়মের দরকার নেই হরিনাম কর। হরিনাম করে সমাজের উপকার করার জন্য নির্দেশ দেন। সংসার করার জন্য বাসাবাড়ি করতে নির্দেশ দেন। ক্রম অনুযায়ী ঠাকুরের নির্দেশাবলী তুলে ধরলাম আলোচনার জন্য।

হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মদর্শন ছিল বাস্তবতাবাদী। সমাজে সংসার জীবন পালনও ধর্ম পালনের মধ্যেই ভগবানকে পাওয়ার সন্ধান দেন। তাই সমাজ মানুষও জীবনের মূল ভিত্তির বাসভূমি সংসারকে গুরুত্ব দিলেন। দশরথ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর—

.....

"ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে পরেছ কৌপিন।
কৌপিনের মহিমা না জানি এতদিন।।
তিন বেলা স্নান করে কে হয় বৈরাগী।
স্নান করে পানিকৌড়ি সেও কি বৈরাগী।।
বিবেক বৈরাগ্য তাকি বাহ্য শৌচে হয়।
বনে বনে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়।।
স্নান বল কারে শুধু উপরেতে ধোয়া।
আত্ম শুদ্ধ না হলে কি যায় তারে পাওয়া।"[৬৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বিশ্বাসকে আত্মদর্শন করালেন। সে যেন তার কৃত কর্মকে দেখতে পেলেন। দশরথ বিশ্বাস ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবালাপ এর মধ্যে তাকে সংসার ধর্ম পালনের নির্দেশও সমাজের উপকার করার নির্দেশ দেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ—

.....

"আজ হতে তোর আর স্নান পূজা নাই।।
প্রয়োজন নাই আর ডুবাইতে জলে।
ডংকামেরে বেড়া গিয়ে হরি হরি বলে।।
হরিনাম ধ্বনি দিয়া মাতা গিয়া দেশ।।

শোন বাছা দেই তোরে এক উপদেশ
মালাবতী নামে লক্ষ্মকান্তের ভাগিনী।
তারে বিয়া কর গিয়া সে তোর গৃহিনী।।
আমিও বলিয়া দিব ভগিনী যে দিবে।

.....

প্রভু বলে যষ্ঠি আর হবে না ধরিতে।
ধরিয়া ত্রিশূল শিঙ্গা রক্ষা কর শীল।
যৈছে বোর ধান্য হয় যৈছে হয় তিল।।
কোন মন্ত্র লাগিবেনা যৈছে হরিনাম।
বাসা কর গিয়া বাছা পাতলার গ্রাম।।
তাহাতে যে ধান্য তিল পাইবা বৎসর।
সংসার খরচ কার্য্য চলিবেক তোর।।
প্রভুকে প্রণামী সাধু চলিল হাটিয়া।
পুষ্করিণী জলে যষ্ঠি দিলেন ফেলিয়া।।
নিজবাটী আসিয়া কহিল ভ্রাতাগণে।
বিবাহ হৈল শেষে মালাবতী সনে।।"[৭০]

বাড়ি করার পরামর্শ দেন ও সারাবছর সংসার খরচের জন্য খাবার যোগাড় করার কথাও বলে দেন। এভাবে আরো বহু মানুষ আসত যারা পুত্র কামনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসতেন। ঠাকুর তাদের ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দিতেন সময় ধরে। পরে সংসার ব্রত রক্ষায় পুত্র লাভ ঘটত। হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরিনাম' করার জন্য নারীর গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। তিনি সংসার ধর্ম পালনের মধ্যেই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম পালন করার নীতি প্রচলন করেন। নারী ব্যাতিত সংসার জীবন সম্পূর্ণভাবেই অচল। নারীও পুরুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেন। হরিচাঁদ ঠাকুরকে অনেক ভক্তগণ তাদের নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং সেখানে নারী পুরুষ উভয়েই মিলিতভাবে ঠাকুরের পরিচর্যার সহায়ক হতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর উভয়কেই 'হরিনাম' করার অধিকার দেন। আর নারী ও পুরুষ উভয় শারীরিকভাবে ভিন্ন হলেও নারীরা ভক্তি যোগও জ্ঞানযোগে পুরুষের সমকক্ষ হোক এটা তিনি মনে প্রাণে চাইতেন।

সমাজে পুরুষ ও নারী সহাবস্থান করলে শুধু পুরুষ শিক্ষা প্রাপ্ত হলে নারী থাকে বঞ্চিত। আর একটি দিকে জ্ঞানা লোক জ্বললে অপর পক্ষটি থাকে ততটাই অন্ধকার। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের সমকালেই গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষার প্রসার ঘটান সেখানে পুরুষও নারী উভয়ের জন্য তিনি ইস্কুল স্থাপন করেন। তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুর পুরুষের আত্মদর্শনের জন্য যেমন হরিনাম করে চরিত্র পবিত্রতার কথা বলেন তেমনি সেই সময়ের অনেক ভক্ত নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা ছিলেন একনিষ্ঠ সাধিকা নারী। ভক্তির জগতে হয়ত সে নারী রূপে পরিচিত কিন্তু ভগবানের কাছে সে ভক্ত। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে তাদের নারীরাও আসত 'হরিনাম' সংকীর্ত্তন আসরে। এখানে নারীরা শুধুমাত্র গৃহকর্ম নিপুণ তারা স্বামীর যোগ্য সহধর্মীনি হয়ে স্বামীর সঙ্গে গৃহধর্ম পালন করেন। 'দশরথের বাড়িতে নায়েব এর অত্যাচার' অধ্যায়ে দেখা যায় নারীরা 'হরিনাম' সংকীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করেন। এবং সকল নারীই হরিনাম করেন। এই অভিযোগ গ্রামবাসী অনেক লোক নায়েব মহাশয়কে করেন। নায়েব মহাশয়কে গ্রামবাসী যারা হরিনামে তখনও মত্ত হয়নি তারা হরিনামের সময় হরিনামের কার্যাবলীকে দেখাতে ও বিচার করার জন্যে নিয়ে আসেন। মহাসমাদরে নায়েব মহাশয়কে দশরথ অন্যান্য ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের সামনে বসান। সংকীর্ত্তন সময় নায়েব নারীদের ক্রিয়াকর্ম ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দশরথ বিশ্বাসকে ক্রোধান্বিত হয়ে মারেন ও জরিমানা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর দশ টাকা জরিমানার জায়গায় ডবল কুড়ি টাকা দিতে বলেন দশরথ বিশ্বাসকে। সেই টাকাই নায়েবকে দেন। আর মূলত গ্রামবাসীদের অভিযোগ হেতু হরিচাঁদ ঠাকুরকেই মারার জন্য কাছারিতে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দশরথ বিশ্বাস সেই ক্ষেত্রে বাধা দিলে নিজেই সেইপ্রহার সহ্য করেন। ঘটনা পরম্পরাক্রমে কবির ব্যক্ত করা সেই অত্যাচার কাহিনিটিকে আলোচনার জন্য তুলে ধরলাম।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ হরিনামকারী ভক্তদের বিরুদ্ধে এই বলে যে নারীরা সকলে হরিনাম করেন। এমনকি কুলবধূরাও হরি বলে হরিবোলা দলে মিশে যায়—

.....

''মাতিল অনেক লোক প্রেমে উতরোল।

ঘাটে পথে যেতে যেতে শুতে হরি বোল।।

গ্রামের পাষণ্ডী যারা বাধ্য নাহি তায়।

কাছারিতে নায়েবের কাছে গিয়া কয়।।

কি মত এ গ্রামে আনিয়াছে দশরথ।

গ্রাম্য লোক নষ্ট হবে থাকিলে এ মত।।

.....

দিবা নিশি হরিনাম পেয়েছে কি মধু।

রাত্রি ঘুম পাড়া নাই এ কেমন সাধু।।

ওড়াকাঁদি হতে হরি ঠাকুরকে আনে।

সে ঠাকুর যেন কি মোহিনী মন্ত্র জানে।।

বুঝিয়াছি ইহারা নিশ্চয় জানে যাদু।

হরি বলে যায় চলে সতী কুল বধূ।।

এ গ্রামে লেগেছে বাবু বড় হুলস্থূল।

গ্রাম্য নমঃশূদ্রদের গেল জাতি কুল।।

কাশ্যপ মুনির বংশ গোত্রজ কাশ্যপ।

দশরথ হতে সেই মান্য হয় লোপ।।

ইহার বিচার কর আনিয়া কাছারী।

এই কাণ্ড আপনাকে দেখাইতে পারি।।

ঠাকুর আছেন দশরথের ভবনে।

সকল প্রত্যয় হবে দেখিলে নয়নে।।

রাত্রিকালে হুড়াহুড়ি শুনা যায় শব্দ।

ছয় সাতদিন মোরা হয়ে আছি স্তব্ধ।।

নায়েব বলেছে এবে যাও গো সকলে।

আমাকে লইয়া যেও কীর্ত্তনের কালে।”[৭১]

এ হেন ভাবে গ্রামবাসীগণ অনেকে মিলে হরিভক্তদেরও মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই যে কীর্ত্তন করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন সেই কীর্ত্তনের সময়কার পরিবেশটি আলোচনা করে ও নায়েব মহাশয়ের ক্রোধিত রূপের প্রকাশ ও প্রতিকার ব্যবস্থাকে তুলে ধরা হল। কীর্ত্তনের পরিবেশটি এরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন কবি—

"সূর্য্যদেব ডুবে গেল সন্ধ্যাকাল এল।
নাম গান কীর্ত্তনেতে সকলে মাতিল।।
পুরুষ যতেক বসা পীড়ির উপরে।
মহাপ্রভু বসেছেন গৃহের ভিতরে।।
দরজা নিকটে খোল করতাল বাজে।
ঠাকুর আছেন বসি কীর্ত্তনের মাঝে।।
রামাগণ অনেক বসেছে গৃহভরা।
মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি দিতেছে তাহারা।।
কেহ বা প্রভুর অঙ্গে দিতেছে বাতাস।
ঠাকুরের ঠাই বসি পরম উল্লাস।।
নাম গানে সবে প্রেম বন্যা বয়ে যায়।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দেয়।।
গৃহে বসিয়াছে রামাগণ সারি সারি।
প্রভু পার্শ্বে কাঁদিতেছে মালাবতী নারী।।
কোন নারী ঠাকুরের চরণে লোটায়।
কোন নারী পদ ধরি গড়াগড়ি যায়।।
কোন নারী কেঁদেছে হা হরি জগন্নাথ।
শ্রীপদ ধোয়ায় কেহ করি অশ্রুপাত।।"[৭২]

কীর্ত্তন সময় গ্রামীরা নায়েবকে সঙ্গে করে দশরথের বাড়িতে আসেন ও নায়েরকে সমাদরে বসায়। ও নায়েব এর ক্রোধ প্রকাশ ও অত্যাচার বিবরণ—

"হেন কালে গ্রামীরা নায়েবে লয়ে যায়।
বাড়ীর উপরে নিয়া তাহাকে বসায়।।
দুইভাগ করিয়া পাড়ার লোক সবে।
চৌকি পাতি সমাদরে বসায় নায়েবে।
যে স্থান হইতে ঠাকুরকে দেখা যায়।
এমন স্থানেতে নিয়া নায়েবে বসায়।।

রামাগণ বাহ্যজ্ঞান হারা সবে ঘরে।

নায়েব বসিয়া সেই ভাব দৃষ্টি করে।।

অজ্ঞান হইয়া কেহ প্রেমে গদ গদ।

হা নাথ বলিয়া কেহ শিরে ধরে পদ।।

চতুর্দ্দিকে নারী মালা মালাবতী বামে।

মৃদুস্বরে হরি বলে মত্ত হয়ে প্রেমে।।

.....

.....

প্রেমে দ্রবীভূত নয় পাষণ্ড হৃদয়।

বিশেষ গ্রামী লোকের ছিল অনুরোধ।

তাহা দেখি নায়েবের উপজিল ক্রোধ।।

.....

মজাইবি দেশশুদ্ধ করে নিলি শুরু।।

.....

কি বুঝিয়া ছেড়ে দিলি ঘরের রমণী।।

এত মেয়ে লোক কেন দেখি তোর ঘরে।

ঠাকুরে লইয়া কেন এত প্রেম করে।।

ভাল ভাল অই যদি ঠাকুর হইবে।

মেয়েদের সঙ্গে কেন এ রঙ্গ করিবে।।

দশরথ বলে বাবু মোর দোষ কিসে।

যার যার নারী সেই সেই লয়ে আসে।।

.....

প্রভুকে আনিনু আমি হইয়া সন্তোষ।।

ঠাকুর আছেন মত্ত হরিনাম গানে।

পাষাণ গলিত হয় এ নামের গুণে।।

মেয়েরা এসেছে সব নাম আকর্ষণে।।

.....

.....

নায়েব কহিছে ওরে ভণ্ড তপস্বী।

যাহা শুনিয়াছি তাহা দেখিলাম আসি।।

.....

নারী লোক সঙ্গে করে হরিনাম গান।

শীঘ্রভণ্ড তপস্বীরে বাহিরেতে আন।।

.....

নায়েব কহিছে বেটা ভাঙ্গিব ভণ্ডতা।

করেছিস এতদিন আজ যাবি কোথা।।

আন অই ঠাকুরকে কাছারী লইব।

আজ অই ঠাকুরের ধর্ম্ম কি শুনিব।

দশরথ বলে আমি প্রাণে যদি মরি।

সেও ভাল প্রভু কেন যাবেন কাছারী।।

করি মানা ঘরে নাহি যেও কোন জন।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।।

মালাবতী ঘরে থেকে শুনিলেন তাই।

ডেকে বলে এখানে আসিলে রক্ষা নাই।।

দশরথ মস্তকেতে ছিল এক টিকি।

নায়েব ধরিয়া তাই দিল এক ঝাকী।।

চর্ম্মের পাদুকা ছিল নায়েবের পায়।

গোড় বাঁধা লোহাতে কঠিন অতিশয়।।

সেই জুতা খুলে মারে ক্রোধে পরিপূর্ণ।

.....

দশরথ মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িল।

নায়েবের পদ ধরি পিট পেতে দিল।।

দশ জুতা মারিব তোরে রে দশরথ।
যাহাতে না যাস আর ঠাকুরের সাথ।।
এত বলি পৃষ্ঠে মারে দশ জুতা বাড়ি।
জরিমানা ডেকে দশরথে দিল ছাড়ি।।
ঠাকুরে না দিলি যদি ওরে বেটা বোকা।
জরিমানা করিলাম তোরে দশ টাকা।।
শীঘ্র ফেলা টাকা নৈলে আরো মার খাবি।
টাকা যদি নাহি দিস কাছারী যাইবি।
প্রভু বলে মালাবতী শীঘ্র ঘরে যাও।
দশ টাকা চাহে ওরে কুড়ি টাকা দেও।।
তাহা শুনি মালাবতী কুড়ি টাকা এনে।
নায়েব নিকটে টাকা দিলেন তখনে।।''[৭৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর দশ টাকা বেশী দিয়ে নায়েব মহাশয়কে খুশি করলেন। আর নায়েব মহাশয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিলেন যে এমন মধুর হরিনামে মত্ত হওয়ার জন্য। অর্থমূল্য দিয়ে 'হরিনাম' অর্থকে নায়েব মহাশয়ের কাছ থেকে কিনলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের কল্যাণের জন্য এই দশ টাকা বেশি দিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের নায়েব মহাশয়কে যা বললেন তা হল—

''ঘর হতে ঠাকুর কহেন নায়েবেরে।
আর দশ টাকা আমি দিলাম তোমারে।।
কত নিবে কত খাবে প্রজা বেচে রৈলে।
ধনে বংশে মজাইলে যে মার মারিলে।।
বারে বারে ইচ্ছা করো মোরে মারি বারে।
এই মার আমা ছাড়া মারিয়াছ কারে।।
জরিমানা দিলাম যে দশটাকা বেশী।
এখন নায়েব বাবু হয়েছো কি খুসী।।
এমন মধুর নামে পাষণ্ডী হইওনা।
এজন্য দিলাম আমি বেশী জরিমানা।।

এখন আমরা গান করিতে কি পারি।

পরকাল যাতে রহে বলে হরি হরি।।

নায়েব কহিছে এবে আর কার ভয়।

দিবা নিশি হরি হরি বলহ সদায়।।

অমনি বলিয়া সবে প্রভু হরিচাঁদ।

উচ্চৈঃস্বরে সবে করে নাম পদ গান।।

নামে প্রেমে দিসে হারা মাতিয়া উঠিল।

বিষাদে হরিষ হয়ে সুখেতে ভাসিল।।

.....

কোন মেয়ে বলে সবে মঙ্গল কারণ।

কি দিয়ে কি করে হরি বুঝে কোন জন।।

একাকী বিশ্বাস মহাশয় মার খেল।

নির্ব্বিঘ্ন হইল দেশ ভয় দূরে গেল।।

.....

শ্রীহরি নামের গুণ বাড়ে যে প্রহারে।

তাহাতে কি ব্যথা হত আমার অন্তরে।।

হরিনাম বিঘ্ননাশ করে খেয়ে মার।।

হরিচাঁদ হরিচাঁদ হরিচাঁদ বল।

.....

এদিকেতে সংকীর্ত্তন উঠিল মাতিয়ে।।

যামিনী হইল ভোর নাম সংকীর্ত্তনে।।

সবে প্রেমে মত্ত; ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মনে।।

সংকীর্ত্তন হইতেছে কার নাই হুষ।

ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ।।”[৭৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের বুদ্ধি মত্তায় নায়েবের কাছ থেকে ‘হরিভক্তি’কে রক্ষা করলেন। এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে যে তীব্র অভিযোগ ছিল নায়েবের সেই অভিযোগও দশরথ বিশ্বাসকে মারের

জন্য নারীদের হৃদয়ে তীব্র দুঃখ ছিল। আর সেই সঙ্গে মিলিত হয় শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের অঙ্গে মারের চিহ্নাবলী দেখে। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে নারীগণ জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বলেন—

"দশরথ পৃষ্ঠে জুতা মারিল নায়েব।
আমার পৃষ্ঠেতে রাখিয়াছে গুরুদেব।"[৭৫]

একথা ঠাকুরের কাছে জ্ঞাত হলেন নারীগণ ও মালাবতী ঠাকুরের পায় পড়ে এর প্রতিকার জানতে চান তখন ঠাকুর তাদের বলেন—

"প্রভু বলে তবে তোরা আয় সব নারী।
মিলাইব হাইকোর্ট মহিলা কাছারী।"[৭৬]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সক্রিয়তায় উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এক অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত করলেন। যে নারীদের 'হরিনাম' গানে মত্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে মূর্খতাবশত উদ্দেশ্যে হরিচাঁদ ঠাকুরকে মার দেন। কিন্তু দশরথ বিশ্বাস ও মালাবতীর বিরোধীতার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে মারতে না পারলেও প্রতীকী ভাবে দশরথ বিশ্বাসকে মারলেও হরিচাঁদ ঠাকুরের শরীরে সেই আঘাতের চিহ্ন থাকে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর নায়েবকে দশ টাকা জরিমানা বেশী দিয়ে বলেন—

"বারে বারে ইচ্ছা কর মোরে মারিবারে।
এই মার আমা ছাড়া মারিয়াছ কারে।"[৭৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর সেই বিচারের ভার অর্পণ করেন 'হরিনাম' সংকীর্ত্তনকারী সকল মহিলাকে। নারীকে আত্মশক্তির সঙ্গে নারীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্পণ করে নারীদের তিনি পূর্ণ মানবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মহিলাদের কষ্টকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকেই আত্মচৈতন্য ফিরিয়ে দিলেন। আর সমাজে যদি নারীর মর্যাদা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সমাজের কল্যাণ করা অর্ধেক সময়ে হয়ে যাবে। সমাজে অর্ধেক নারীও অর্ধেক পুরুষ বাস করে। হরিচাঁদ ঠাকুর নারীর ভক্তি যোগ ও জ্ঞানযোগ ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শিক্ষার সাথে স্বাধীন বিচার শক্তি প্রদান করেন। তা উনিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে অভিনব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। নারী যে মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনায় 'মহিলা কাছারী এবং বিচার ও হুকুম' এই অধ্যায়ের মাধ্যমেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এবং নারীরও বিচার করার ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা আছে তাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেন।

বিবাদীগণ নায়েবের কাছে নালিশ ও অত্যাচার করেই শান্ত হন নি। সময় মত সাহেবের কাছে নালিশ করেন। এবং সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুরের সঠিক পরিচয় চান ও তাকে দেখতে চান হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত দশরথের পুত্রতুল্য ছাত্র রামতনুর কাছে। রামতনু জোনাসুর কুঠি গিয়ে ডিক সাহেবকে হরিচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধেও হরিচাঁদ ঠাকুরের কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানানোর পর সাহেব রামতনুকে বলেন তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্খা করেন। সাহেবকে রামতনু কথা দেন যে ঠাকুর আসবেন তোমার দর্শনে। রামতনু একথা বাল্য শিক্ষক দশরথ বিশ্বাসকে সবিস্তারে জানান। দশরথ বিশ্বাস ঠাকুরকে জানান ঠাকুর শুনেই কথা দেন যে তাঁকে দেখতে চান তাকেও তিনি দেখবেন। এবং যাবার দিন ঠিক করে দেন। তারপর ঠাকুর তার প্রধান প্রধান ভক্তদের কুঠি যাওয়ার জন্য আজ্ঞা করলে সকলে সম্মিলিত হয়ে আজ্ঞানুসারে দশরথের বাড়িতে আসেন। এভাবে দশরথের বাড়িতে কুঠি যাওয়ার জন্য ভক্ত সমাবেশ হয়। সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য সকলের যাবার উদ্দ্যেগটিও স্মরণীয়। তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকে জানা যায়।

বিবাদীদের সাহেবকে নালিশকরণও সাহেব কর্তৃক কুঠির কর্মচারী রামতনুকে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য ঠাকুরের সন্ধানে দশরথের কাছে পাঠানো। তারপর রামতনু প্রকৃত ঘটনা জেনে কুঠির সাহেবের কাছে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন—

"সাহেব কহিছে আমি দেখিব কেমন আদমি।
যাহ হাম পেয়াদা পাঠাই।
পাষণ্ডীরা গৃহে গেল সাহেব লোক পাঠাল;
উপনীত দশরথ ঠাই।।
পদ্মবিলা গ্রামে বাস, শ্রীরাম তনু বিশ্বাস,
বুদ্ধি মান অতি বিচক্ষণ।
কাছারী কুঠি মোকামে, রাজদ্বারে কিম্বা গ্রামে,
পরগণে মানে সর্ব্বজন।"[৭৮]

রামতনু সমস্ত সত্য ঘটনা জানতে পারেন দশরথ বিশ্বাসের কাছে। এবং সেই ঘটনাবলীকে নিরপেক্ষভাবে কুঠির ডিক সাহেবের কাছে জানান। তারক সরকারে বর্ণনায়—

"রামতনু কুঠি গিয়ে নিরপেক্ষ ভাবলয়ে,

সত্য জানাইল সাহেবেরে।

সহেব কহে বিশ্বাস, আর নাহি অবিশ্বাস;

ঠাকুরে কি দোষ কার্য করে।।

....

.....

শিঘ্র গিয়া কহ তুমি, ঠাকুর দেখিব আমি,

আসুন আমার কামরায়।।

সাহেবে কড়ার দিয়ে রামতনু গৃহে গিয়ে;

গুরুদেব নিকটেতে কয়।

দশরথ পদ ধরে, জানাইল ঠাকুরেরে,

সাহেবেরে দেখা দিতে হয়।।

মহাপ্রভু শুনি তাই, বলে যাব তার ঠাই,

করি বারে রাজ দরশন।

যে দেখিতে চাহে মোরে, আমিও দেখিব তারে,

মন চাহে তার সম্মিলন।।

ঠাকুর করিল দিন বলগিয়া আমি দীন,

কুঠি যাব তিন দিন পরে।"[৭৯]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কুঠি যাত্রার আজ্ঞাও ভক্তগণের সমাবেশ ও যাত্রার উদ্দ্যোগ—

"ঠাকুর কুঠিতে যাবে, দিন ধার্য্য করি তবে,

যে স্থানে যে ভক্তগণ ছিল।

প্রধান প্রধান ভক্ত, নানা গানে অনুরক্ত,

আসিতে সবারে আজ্ঞা দিল।।

ঠাকুর যে দিন মত লইয়া ভক্ত কত,

দশরথ ভবনে আসিল।।

....

.....

যতেক ভক্তগণ হরিনামেতে মগন,

সিংহের প্রতাপে ধায় বেগে।।

গেল দশরথ ঘর সবে হল একত্তর,

ভয়ভীত হল দশরথ।

ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখিয়া হল আতঙ্ক,

লোক হল দুই তিন শত।।"[৮০]

কুঠি যাত্রার জন্য সকলের বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়—এখনকার সময়মত পোষাক পরিচ্ছদের এত প্রকার পোষাক তৎকালীন সময়ে ছিল না। তখনকার প্রধান পোষাক ধুতি ও চাদর পুরুষের জন্য ও মেয়ে ও নারীদের জন্য শাড়ি কাপড়ই ছিল প্রধান পোষাক। আর মতুয়া ভক্তগণও এই পোষাক পরিচ্ছদই পরিধান করেছেন। আধুনিক যুগের আগমন ঘটলে মানুষের জীবনযাত্রার অর্থাৎ কর্মপ্রণালীর নব নব উদ্যোগে মানুষের জীবন কর্ম ব্যস্ত হয় মানুষের রুচিবোধের ভাবানুযায়ী মতুয়া ভক্তগণও তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তৎকালীন সময়ে সাবানের ব্যবহার ছিল না। মানুষ মাটিকে ব্যবহার করত মাথা পরিষ্কার করার কাজে। কেশ ধোয়ার জন্য।

"যাইতে হইবে কুঠি, মাথায় লইব মাটি।

কেশ মুক্ত বেশই প্রধান।"[৮১]

"কুঠিতে নাম সংকীর্ত্তন" অধ্যায়ে ঠাকুর ভক্তগণ নিয়ে জোনাসুর কুঠি গিয়েছেন। ও সেখানে হরিনাম কীর্ত্তন করছেন। কবির বর্ণনায়—

"ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে দয়াল ঠাকুর।

চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনাসুর।

মৃদ্ধৌত মার্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।

অর্ধপথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল।।

.....

ঠাকুরের পিছে চারিখানা খোল বাজে।

অষ্ট জোড়া করতাল বাজে তার মাঝে।।

পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।

মুখ পদ্মে ঝলসিছে সূর্য্যে কিরণ।।

রক্তবর্ণ চক্ষু কাল ফণী মণি ঘেরা

ভ্রুধনু মণি রক্ষে দিতেছে পাহারা।।

ভালে ফোঁটা শশী ছটা হয়েছে সংযোগ।

তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্প বন্ত যোগ।।''[৮২]

রামতনু ডিক সাহেবের কাছে উপস্থিত ছিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন এহেন ঘোর শব্দের কারণ রামতনু হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা জানান এভাবে—

''রামতনু বিশ্বাস কহিছে সাহেবেরে।

ইচ্ছা করিলেন যে ঠাকুরে দেখিবারে।।

সেই প্রভু এসেছেন লয়ে ভক্তগণ।

মহাসংকীর্ত্তন যেন ভীষণ গর্জ্জন।''[৮৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরও ভক্তগণকে অবলোকন করে সাহেব তার অভিজ্ঞতার কথা রামতনুকে বলছেন। আর রাজার শাসননীতি একরকম আর ভগবানের নীতি অন্যরকম। সেখানে রাজা প্রজার সম্পর্ক হয় ভয় ভীতির উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরীয় সম্পর্ক হয় হৃদয়বত্তার অনুরাগে সেখানে ভালোবাসার বন্ধনই একমাত্র সম্পর্ক। তাই ভীতি হীনতা এখানে প্রধান বিষয়। আর ভয়কে জয় করার শক্তি দান করে ঈশ্বরীয় শুভ ভাবনা। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি প্রেমানুগত্য ভক্তের দল তার নিত্যসঙ্গী। আর এই ভক্তরাই সাহেবের কুঠিতে যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে করতে। সেই বর্ণনা পাওয়া যায় তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে—

''সাহেব কহিছে তনু এত ভক্ত যার।

সামান্য মনুষ্য নহে বুঝিলাম সার।।

রাজা রামরত্ন রায় আমি কর্মচারী।

এতলোক একত্রিত করিতে না পারি।

যদি একত্রিত হয় রাজদণ্ড ভয়।

হেতু বিনা এত লোক ভীড় কেন হয়।।

ভক্তবৃন্দ সঙ্গে দেখি চার পাঁচ শত।

হেলে দুলে নাচে গায় যেন মদ মত্ত।।

লোকে অসম্ভব এই অলৌকিক কার্য্য।

ক্ষণ জন্মা লোক ইনি করিলাম ধার্য্য।।"[৮৪]

সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুর কোন জন বুঝতে পারেন নি। রামতনুকে সে জিজ্ঞাসা করলে সাহেবের মাতা সাহেবকে হরিচাঁদ ঠাকুরকে চিনিয়ে দিলেন।

.....

"সাহেবের মাতা বলে শুন বাছা ডিক।

ঠাকুরে দেখিয়া কি করিতে নার ঠিক।।

আজানুলম্বিত ভুজ চৌরাশ কপাল।

উর্ধরেখা করে, চক্ষু কর্ণায়ত লাল।।

চুল ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর ঐজন।

স্বভাবত রূপ যেন ভুবন মোহন।।"[৮৫]

সাহেব, সাহেবের মাতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও ঠাকুর ভক্তের নৃত্যগীত দেখে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যিই এরা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত। তারা সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাদেরকে অন্যায় ভাবে প্রহার নায়েবের উচিত হয় নি। তাই সাহেবের মা সাহেবকে বলেন সাধু হিংসা যেন কখন না করেন।

.....

"বেলা অপরাহ্ন হল যেতে কহ দেশে।

এই সব সাধু দিগে পাষণ্ডীরা দোষে।।

অধিনস্থ মধ্যগাতী তুমি হও রাজা।

পাষণ্ডী প্রজাকে এনে তুমি দেও সাজা।।

অগ্রভাগে ডেকে এনে করহ বারণ।

আর যেন সাধু হিংসা না করে কখন।।

.....

সেলাম করিল যদি সাহেবের মাতা।

পরিবার সহ ডিক নোয়াইল মাথা।।

.....

সাহেবের মাতা কহে শুনহে ঠাকুর।

সুখে যেন থাকে ডিক কুঠি জোনাসুর।।

কুঠি হতে মতো সব হইল বিদায়।

চতুগুণ স্ফূর্ত্তি হল হরিগুণ গায়।''[৮৬]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সাহেব দর্শন প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। কারণ 'হরিনাম' কারী ভক্তগণকে মতো আখ্যা দেন। এরপর হরিনামে মত্তদের প্রধান অপরাধ ছিল নারী পুরুষে একসঙ্গে সমান অধিকার পায় হরিনাম করার এই কারণে। দশরথ বিশ্বাসকে নায়েব অত্যাচার করেন জরিমানা নেন। তারপর সাহেবের কাছেও নালিশ করেন ফলে সত্যাসত্য বিচার করার জন্য সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখতে চান ও সাহেবের ধর্মাচরণকারী মানুষদের দেখে তার হৃদয়ে ভক্তি ভাবনার বিকাশ ঘটে তার পরিবার সহ হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভক্তির দ্বারা সম্মান জানান। এতে সাহেব ও খুশি হন ও হরিভক্তগণও খুশি হন। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তরা জয়লাভ করেন। এবং ডিক সাহেব বা রাজার থেকে কোন রকম অন্যায় থেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী ভক্তরা অব্যাহতি পায়। তারা স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণের সুযোগ পায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত মতেই সার্বিক ভাবে ভক্তগণ চলতে থাকেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যক্তি মানুষের সমস্যার সমাধান করেও সমাজ সংস্কার করেন :

হরিচাঁদ ঠাকুর এমন এক ব্যক্তি যার প্রতিভার শেষ নেই। তিনি মানুষকে কখনোই ঘৃণা করতেন না। আর তিনি সকলকে নিজ নিজ পরিধিতেই ভালো বেসেছেন। কোন সময় তিনি কাউকে জোর করেন নি কোন বিষয়ে। অত্যাচারিত হয়েও অত্যাচারিতের প্রতি দণ্ড দেওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করেননি। এরকম বহু ঘটনা পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শ কর্মাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। চৈতন্যবালার চৈতন্য জ্ঞানের উদয় হয় হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায়। আর নারীরাও রন্ধন কার্য্য করার সহযোগে সমভাবে হরিনামে মত্ত হতেন তার পরিচয় পাওয়া যায়—

''মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাক শালে।

শুনে ধ্বনি সব ধনী ভাসে অশ্রুজলে।।

কিসের রান্না বান্না কিসের হলুদ বাটা।

নয়ন জলে ভেসে যায় হলুদ বাটা পাটা।।

কুল বধূ ধাইতেছে হইয়া আকুল।

বাল্য বৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল।।''[৮৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের ভক্তির পরিচয় পাই এভাবে—

''হরি বোলা সাধুদের ভক্তি অকামনা।

তন্ত্রমন্ত্র নাহি মানে ব্রজ উপাসনা।।

বিশুদ্ধ চরিত্র পেমে হরি হরি বলে।

অন্য তন্ত্রমন্ত্র এরা বাপপদে ঠেলে।''[৮৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে সকল প্রকার মানুষের আগমন ঘটেছিল। মতুয়া নামটিরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেশের অবস্থা সম্পর্কেও হরিনাম প্রচারের কথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''পূর্ব্ববঙ্গে হরিনাম না ছিল প্রচার।

ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে নামের সঞ্চার।।

কেহ রোগে কেহ শোকে ধনের লাগিয়া।

পুত্র হীন পুত্র জন্য মিলিল আসিয়া।।

কেহ যদি হরিনাম কখন বলিত।

চমকিত হয়ে সবে গালাগালি দিত।।

.....

হরিচাঁদ রূপে হরি হল অবতার।।

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে প্রচারিলা নাম।

কিবা দিবা বিভাবরী নাহিক বিরাম।।

হরিবল হরিবল হরিবল হরি।

উচ্চে স্বরে নাম করে ব্যোম ভেদ করি।।

হাসে কাঁদে নাচে গায় হইয়া বিভোলা।

নাম শুনে রূপ দেখে কেহ বা মাতিলা।।

কেহ বলে মতুয়া কেহবা হরি বোলা।

কেহ করে গালাগালি হরি বোলা শালা।।

গালাগালি পরে ক্রমে ঢলাঢলি হয়।

ক্রমে দেশ ডুবে গেল নামের বন্যায়।।

পুত্র পেয়ে হরিবোলা হইল আনন্দ।

ওড়াকাঁদি আসে যায় করে প্রেমানন্দ।''[৮৯]

ভক্তজয়চাঁদ রাণী রাসমণির সদর কাছারীতে চাকরি করতেন। তিনিও হরিভক্ত ছিলেন। হরিভক্তদের মধ্যে মানুষ ভাবনাই বড় হয়। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে গণ্য নয় সে মানুষ। এটাই তার পরিচয় হয়। রসিক সরকার ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। এই রসিক সরকারের সঙ্গে অযোধ্যার রামভরত মিশ্রের পরিচয়ও আগমন ঘটে ওড়াকাঁন্দি ঠাকুরের কাছেও রামভরত হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করে হরিভক্ত হন। তারক সরকার মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও কাঙালী ব্যাপারীকে বাক্য লঙঘনের জন্য তাদের আত্মতত্ত্ব দান করেন। বাক্য মান্য করা উচিত। এই শিক্ষা দেন ঠাকুর। ভক্ত স্বরূপ রায়কে তার আত্মদর্শন করান হরিচাঁদ ঠাকুর। স্বরূপ রায়কে 'হরিনাম' দানে চরিত্র শুদ্ধি ঘটান। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ঘৃণার থেকে বিরত করার শিক্ষা দান করেন। বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর আখ্যানের মধ্যে তিনি ঘৃণা মহাপাপ শিক্ষা দেন। গোলকচন্দ্র রুদ্রকে হরিভক্তির মাধ্যমে তার হৃদয়ে ভক্তি বীজ রোপণ করে তাকে হরি ভক্তে পরিণত করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ ভাবনা ও সমাজ গঠন :

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ হল 'হাতে কাম মুখে নাম'। কর্মশূন্য ধর্মচার প্রলাপ বচনে পরিণত হয়। ধর্ম ও কর্ম সম্মিলনে মতুয়া ধর্মের মূল ভিত গড়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের যোগ্য উত্তরসূরী হলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪৬ সালের ১৩ মার্চ। হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শেই গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সমাজের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হন। হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শই গুরুচাঁদ ঠাকুরের চরিত্র গঠন ও মানস গঠন। হরিচাঁদ ঠাকুরের নিদের্শেই তিনি সংসার জীবন পরিচলানার ও সমাজের উন্নতির কর্ম

প্রণালী শিক্ষা নেন পিতা ও মাতার কাছে। মাতা পিতার ধর্মাদর্শ ও কর্মাদশই তিনি সংসার জীবনে নিজে পালন করেন ও মতুয়া ভক্তদের শিক্ষা দেন। আর তিনি সকল ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর অকৃপণভাবে সমাজ মানুষের জন্য কাজ করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার সময় তৎকালীন ওড়াকাঁন্দিতে ইস্কুল ছিল না। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিচরণ পাগল 'শ্রীগুরুচাঁদের বাল্য লীলা ও বিদ্যাভ্যাস' অধ্যায়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিদেবীর ইচ্ছা হরিচাঁদ ঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন।

"শুনো প্রভু মনভাষ, আমার প্রাণের আশ
বিদ্যা শিক্ষা দিতে গুরুচাঁদে।।"[৯০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চিন্তা কার কাছে থাকবে বালক গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রশ্নের সমাধান শান্তিদেবী করেন। মোল্যাকাঁদির ভক্ত গোলক কীর্ত্তনীয়ার বাড়িতে রাখেন। ঠাকুর বলেন—

"এ গ্রামেতে স্কুল নাই, যেতে হবে অন্য ঠাই।
কার গৃহ মন মত হয়।"
মাতা বলে আমি জানি আছে ভক্তগুণ মণি,
মোল্যাকাঁদি গোলক কীর্ত্তনে।
তার পুত্র গিরিধর সমান বয়স তার।
সেই স্থান লাগে মম মনে।
....
.....
রাখিলেন অতপর, গোলক কীর্ত্তনে ঘরে,
গুরুচাঁদ রহে হর্যান্তরে।
গিরিধর সনে মিশি, একাসনে দিবা নিশি
খেলে আর লেখাপড়া করে।"[৯১]

এভাবে পিতামাতার ইচ্ছায় গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে লেখা পড়া করেন এবং ঠিক এভাবেই স্বীয় পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকেও জয়পুর গ্রামে তারক সরকারের বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখান। পরবর্তীকালে গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে নিজে উদ্যোগী হন স্কুল করার। স্কুল

করলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরকে আদর্শ গৃহধর্ম নীতি শিক্ষা দিয়ে গৃহ ধর্মে প্রবেশ করালেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রথমে ব্যবসা করলেন। নৌকা গঠন করে তাতে কাঁচামাল নিয়ে বন্দরে বিক্রি করেন। এবং অনেক ভক্ত মানুষ গুরুচাঁদ ঠাকুরের সহায়তায় ব্যবসা শিখে তারাও একই ভাবে ব্যবসা করে অর্থ লাভ করেন। এরপর তিনি 'লগ্নী কারবার' করে সকলকে ব্যবসায়ী নীতি শিক্ষার সঙ্গে তিনিও ধনবান হলেন ও গরীব মানুষকে ধনবান করলেন। আর যারা মহাজনের কাছে ঋণী ছিলেন তাদেরও তিনি নিজ কৌশলে মুক্ত করলেন। 'শিক্ষা বিস্তারে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ' এই অধ্যায়ে দেখা যায় গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার আদর্শকে জাতির প্রাণে যেমন সঞ্চার করেন তেমনি নিজে উদ্যোগী হয়ে শিক্ষা বিস্তার কল্পে যে বিশাল কার্য সম্পাদন করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তার শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে অবহিত হব।

> ''গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তদের সহায়তায় ১৯৩১ সাল নাগাদ অনগ্রসর ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে ৫৬৯ টি, সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত বর্ধমান ডিভিশনে ২৩৬টি এবং মূলত কেবল অস্পৃশ্য পতিত নমঃশূদ্র ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত ঢাকা ডিভিশনে ১০৬৭টি (এক হাজার সাতশট্টি) অর্থাৎ সর্বমোট ১৮৮২টি বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ড. সি.এস. মিডের সহায়তায় ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে এই বিদ্যালয়গুলিকে প্রথমত ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার স্কুলে এবং পরে এগুলিকে মিড্‌ল ইংলিশ (এম.ই.) স্কুলে অনুমোদন করিয়ে নেন। পরবর্তীতে অবশ্য এর কোন কোন স্কুল উচ্চ ইংলিশ (উচ্চ মাধ্যমিক) স্কুলেও উন্নীত হয়।''[৯২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর এই বিশাল শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তৎকালীন ভক্তগণের সহযোগিতায় ও তৎকালীন খ্রীষ্টান মিশনারী ড. সি. এস. মীড -এর সহযোগিতার দ্বারা তাঁর পিতার ধর্মাদর্শকেই তিনি যেমন প্রসার করেন তেমনি সেই ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছিল সার্বিক উন্নতির প্রসার। গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল আদর্শকেই কার্য্যে রূপায়িত করতে সক্ষম হন। তিনি সকলকে শিক্ষা সম্পর্কে যে কল্যাণ মূলক কথা

বলেন তা তার পিতার ইচ্ছার পূর্ণতা। আচার্য মহানন্দ হালদার হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল কথাকে তুলে ধরেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'হরিনাম' কার্য্যের দ্বারা মানুষের আদর্শ চরিত্র গঠনের পর হরিচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটান শিক্ষার বিস্তার, সমাজ সংস্কার, জাতির কল্যাণ কার্যাবলীর দ্বারা গুরুচাঁদ ঠাকুর।

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীকে সংক্ষিপ্ত ভাবে এভাবে গ্রহণ করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার—

''রোগ শোক দুঃখ ব্যথা জ্বালা অপহারী।
পরম দয়াল রূপে এসেছে শ্রীহরি।।
তারিতে কাঙ্গাল জনে বুকে দিতে আশা।
অন্ধ প্রাণে দিতে আলো মূক মুখে ভাষা।।
পিছে পড়া নিস্বঃদল বুকে ভরা ব্যথা।
কেহ বুঝে নাই তার মরমের কথা।।
মরা দেহে দিতে প্রাণ জাগাতে সবারে।
প্রাণদাতা হরি এল সফলা নগরে।।
অসীম তত্ত্বেতে ভরা মানব জীবন।
মর্ম্মকথা ঘরে ঘরে করে বিতরণ।।
.....
.....
আশা হারা ছিল যত শুনি সেই বাণী।
আপনা বিলায়ে পুজে চরণ দুখানি।।
বিশ্বজয়ী মন্ত্র যেন সবে পেল বুকে।
পতিত পাবন হরি বলে তাঁরে ডাকে।।''[৯৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুর এই বিশ্বপতির সন্তান। তিনি পিতার মহান আদর্শকে কার্যে পরিণত করেন পিতৃভক্তগণ সহযোগে। বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে ড. মীডের সহায়তায় লাটের সঙ্গে পরিচয় এবং কমিশনার সাহেবের সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় হয়। এই কমিশনার সহায়তা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে এবং সর্বভাবে সহায়ক হন মীড সাহেব। এই রাজ কার্য পরিচালনার সহযোগী

কর্মীবৃন্দ গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার কার্য্যে সহায়ক হন। ফলে শ্রম সাধ্য হলেও সংগঠন ও সংস্কার কর্মের প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি সক্ষম হন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার প্রতিষ্ঠা, প্রথম পাঠশালা হয় ওড়াকাঁন্দিতে। আচার্য মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

"..... রঘুনাথ পণ্ডিত সুজন।
ওড়াকাঁদি স্থিতি কৈল আনন্দিত মন।।
বার'শ সাতাশী সনে অঘ্রাণ মাসেতে।
পাঠশালা হল সৃষ্টি চৌধুরী বাটিতে।।"[৯৪]

এরপর শিক্ষা বিস্তার কল্পে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরলাম।

"গুরুচাঁদ বলে 'শুন ভাই সব যত।
জাতির উন্নতি কিন্তু এই সূত্রপাত।।
যাক জান ধন মান তাতে ক্ষতি নাই।
সব দিয়ে এই দেশে স্কুল রাখা চাই।।
.....
মোর পিতা হরিচাঁদ বলে গেছে মোরে।
বিদ্যা শিক্ষা স্বজাতিকে দিতে ঘরে ঘরে।।
.....
শুন স্বজাতির গণ সবে মনো কথা।
বিদ্যা শূন্য ধন মান সব জানো বৃথা।।
নমঃশূদ্র জাতি যদি বাঁচিবারে চাও।
যাক প্রাণ সেও ভালো বিদ্যা শিখেলও।।
আমি বলি বিদ্যা শূন্য রবে সেই জন।
নমঃশূদ্র বলি তারে বল না কখন।।
বিদ্যাবান যেই জন তাঁরে মান্য দাও।
বিদ্যার ভিত্তিতে সবে সমাজ গড়াও।।
সেইজন বিদ্যাবান পরম পণ্ডিত।
সমাজের পতি তারে মানিবে নিশ্চিত।।

বিদ্যা ছাড়া কথা নাই বিদ্যা কর সার।

বিদ্যাধর্ম্ম বিদ্যাকর্ম্ম, অন্য সব ছার।।

বাঁচ না না বাঁচ প্রাণে বিদ্যাশিক্ষা চাই।

বিদ্যাহীন হলে বড় তার মূল্য নাই।।

বারে বারে বলি তাই স্বাজাতির গণ।

শেখ বিদ্যা রাখ বিদ্যা করে প্রাণ পণ।।"[৯৫]

একটি বৃহৎ স্বজাতি সভায় এই বিদ্যার আলোচনা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। সভার সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। আর সকলের সম্মিলিত প্রতিজ্ঞা হল—

"আজ হতে সবে মোরা অঙ্গীকার করি।

বিদ্যা ঘরে নিব তাতে বাঁচি কিংবা মরি।"[৯৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুর শুধুমাত্র নমঃজাতির উন্নতি চিন্তা করেননি। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের নিয়েই তিনি স্বজাতির উন্নতির কথা বলেন। মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যারা আসতেন সেই সব ভক্তরাই হয়েছিলেন মতুয়া ভক্ত। এই মতুয়া ভক্তদের নিয়েই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠন। এই মতুয়াভক্তগণ কারা ছিলেন সেই পরিচয় পাওয়া যায় মতুয়া ধর্মগ্রন্থ বলে খ্যাত সেই সকল গ্রন্থে। আচার্য মহানন্দ হালদার তার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে 'মতুয়া' উপাধিতে যারা ভূষিত হয়েছিলেন তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের অভিজ্ঞতার কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন। সেই কথাই কর্ম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কর্ম্মদ্যোগী হন—

"বড় কথা বলে কেহ বড় নাহি হয়।

কথা রেখ কাজ কর ছোট বড় যা হয় কর।

কথা বৃথা কাজে জানা যায় পরিচয়।।

ঘরে ঘরে এই কথা বলে গেছে মোর পিতা।

এক সূত্রে ক্রমে গাঁথা হল নমঃশূদ্র।

শুধু নমঃশূদ্র নয় যারা যারা দুঃখী রয়

সবে মিলি এক সাথে কর ধর্ম্ম যুদ্ধ।।

তেলী মালী কুম্ভকার জোলাতাঁতী মালাকার।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আর নবশাখ।

ব্যথিত মুসলমান হল কত আগুয়ান,

হরিচাঁদে পেয়ে তারা বলে 'মোরা এক'।

....

.....

তার ভাবে ভাব ধরা তার প্রেমে মাতোয়ারা।

'মতুয়া' উপাধি কয় সে ভাব দেখিয়া।।

তিরোধান আগে পিতা বলিলেন মোরে কথা,

সেই কথা সার বলি করেছি গ্রহণ।

সে আজ্ঞা বহিয়া শিরে ঘুরি দেশ দেশান্তরে।

সেই বাণী কহি সবে শুন সভাজন।।

যে জাতির ঘরে বিদ্যা নাহি ভরে,

দুভাগ্য জানিবে তারে।

ধন মান বৃথা বিদ্যা নাহি যথা,

লোকে উপহাস করে।।"[৯৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সকল মতুয়া ভক্তগণকে নিয়ে শিক্ষাবিস্তার জন্য যে জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচির সূত্রপাত ঘটান তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে সমাজ সংস্কার কর্মে। ১৮৮১ সালে খুলনা জেলার দত্তডাঙা গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র গায়েনের বাড়িতে এক 'নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণ দেন তিনি এবং শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার উপায় সম্বন্ধে তিনি যা বললেন তা যেমন যুগপোযোগী ও তেমনি মহামূল্যবান। সারা বাংলা থেকে দশ হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃজাতির মানুষের সুপ্ত চেতনার দ্বার উন্মোচন করে তাদের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে এক গৌরবময় যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

"সিংহ শিশু হায় ভুলি পরিচয়

মেষ দলে রহে পড়ি।।

জাগ সিংহ জাগ বরাভয় মাগ

এ বিশ্ব দলিয়া পায়।

এ বিশ্ব সৃজন করেছে যে জন

সেই দিবে পদাশ্রয়।।

জাগাবে তোমারে তাই তব ঘরে।

নিজে হল অবতার।''[৯৮]

সুখ শান্তি বিরাজিত অতীত গৌরব গাথা এক স্বপ্নময় জীবন ছিল এই নমঃজাতির মানুষের। হারিয়ে গিয়েছিল যে দিনগুলি সেই স্মৃতি কথার দ্বারা উদ্‌ঘাটন করে পুনরায় আত্মশক্তি বলে কর্মের ধর্মের দ্বারা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জাগুক এই মহাজাতি এই কথাই তিনি ব্যক্ত করেন।

গ্রাম বাংলার এই কৃষিজীবী মানুষেরা যে এই সোনার বাংলারই মানুষ। এই মানুষদের পিতৃ পুরুষেরা মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে কি সুন্দর শস্য শ্যামল করে গড়ে তুলেছিল এই বাংলাদেশকে। বিস্মৃতির অতলে যে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত স্বপ্নময় সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে ঝাপিয়ে পড়তে হবে জীবন সংগ্রামে। হারিয়ে যাওয়া অতীত অধিকার অর্জন করে পুনরায় পুন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ধর্মে কর্মের তথা সামগ্রিক কল্যাণে। এভাবেই এই নমঃজাতির অতীত ইতিহাসকে উন্মোচন করেন। তিনি আরও বলেন—

''ভূভার হারক পতিত তারক

হরিচাঁদ যেই কুলে।।

জাগো নমঃশূদ্র নহ কেহ ক্ষুদ্র

কুল ধর্ম্মে গরীয়ান।

দেখাও জগতে নমঃশূদ্র হতে

নাহি কেহ বরীয়ান।।

আত্ম পরিচয় মনে নাহি হায়!

তাই এত দূর্গতি ভালে।

পূর্ব্ব বিবরণ করবে স্মরণ

শক্তিতে ওঠরে জ্বলে।।

ধর্ম্ম রক্ষা তরে গহন কান্তারে

যে জাতি সহিল দুঃখ

প্রতাপের সাথে অস্ত্র নিয়ে হাতে

শত্রুনাশে লক্ষ লক্ষ।।

জননীর প্রায় যেই জাতি হায়।

ঘরে ঘরে দেয় অন্ন।

....

.....

ধর্ম্ম কর্ম্মোজ্বল প্রেমেতে উছল।

ঢল ঢল চোখে দৃষ্টি।

'জানে না ছলনা অসত্য বলে না'

এই নমঃশূদ্র কৃষ্টি।।''[৯৯]

যে জাতি বা মানব গোষ্ঠী তার আত্মপরিচয় সম্পর্কে সজ্ঞান নয়, যে জাতি বা সমাজ তার অতীত ইতিহাস জানে না—তারা কখনও তাদের হারিয়ে যাওয়া অতীতের মান, মর্যাদা, অধিকার ইত্যাদি ফিরে পাবার আশায় রুখে দাঁড়াতেও সক্ষম হয় না। আত্মপরিচয় না জানলে নিজেরও নিজেদের পূর্ব স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। নিজেদের স্বরূপ সম্পূর্ণ ভাবে জ্ঞান থাকলে কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে সে অবজ্ঞার পাত্র হয় না। অধিকার নিজেদের কর্মের দ্বারা অর্জন করে নিতে হয়। শৌর্য বীর্য সম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্তশালী একটা মানব জাতিকে কীভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে লোকালয় থেকে দূরে গহন কান্তারে, দুর্গম বনাঞ্চলে বিতাড়িত করে রাজশক্তির দ্বারা, তা সভায় আগত প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধের দ্বারা বাঁচতে হলে অতীতের হারিয়ে যাওয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার আলোকে জীবনাদর্শ গঠন করতে হবে। শিক্ষা রূপ জ্ঞানালোক প্রতিটি মানবের হৃদয় গহ্বরে জ্বালতে হবে। তার জন্য শিক্ষার দরকার। গুরুচাঁদ ঠাকুর সভাজনের উদ্দেশ্যে বলেন—

''তাই বলি ভাই মুক্তি যদি চাই

বিদ্বান হইতে হবে

পেলে বিদ্যধন দুঃখ নিবারণ

চির সুখী হবে ভবে।।"[১০০]

বিখ্যাত লেখক মনিমোহন বৈরাগী তাঁর 'অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরি গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

"পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মগুরু আছেন কি যিনি অন্ত্যজ বাংলার মুক্তিদাতা গুরুচাঁদ ঠাকুরেরমত বলতে পারেন 'বিদ্যাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে; একমাত্র বিদ্যাই মানুষকে চিরসুখী করতে পারে?' কল্পনাশ্রয়ী—অবৈজ্ঞানিক ধর্ম অজ্ঞানীদের মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে ঠিকই; কিন্তু তা মানুষের পেটের ক্ষুধা মিটাতে পারে না।"[১০১]

শিক্ষা হল মানুষের জ্ঞানালোক পূর্ণ মানবতাবোধের বিকাশের অন্যতম সোপান। আর শিক্ষাই মানুষকে মুক্ত করতে পারে। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের সম্পূর্ণতার জন্যও মানুষের মধ্যে মনোবলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের সামনে এক সুন্দর ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই মহান ভবিষ্যত বাণীটি হল—

"বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও

কার দ্বারে চাও ভিক্ষা।

রাজ শক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে

কালে হবে সে পরীক্ষা।।"[১০২]

'Knowledge is a great power' জ্ঞানই হল একটি বড় শক্তি। শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান রূপ আলোক যদি মানুষ পায় তাহলে মানুষ্যের অজ্ঞান চিরতরে বিনাশ হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের গৌরবময় দিনের আগমণ ঘটবে। তাদের ধর্মভয়, রাজভয়, থাকবে না। এমনকি শিক্ষার দ্বারা আলোকিত মানুষই মানুষকে আত্মশক্তিতে শক্তিশালী করতে পারে। এই শিক্ষিত মানুষই রাজশক্তি তথা প্রশাসনিক কার্য্যে নিয়োজিত হন। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষের শাসন পরিচালন ক্ষমতায় নিয়োগের বলে সকল প্রকার দুঃখ দুদর্শা, ব্যথা বেদনার অবসান করে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের কথা বলেছিলেন। তাইতো

মতুয়া সমাজের ত্যাগব্রতী পাগল ও গোঁসাইরা দলে দলে মানুষের আত্মদর্শন করান ধর্ম দর্শন দ্বারা ও মানুষের শিক্ষার দ্বারা দুঃখ বিমোচন করেন। ধর্ম জ্ঞান লাভ ও কর্ম জ্ঞানের জন্য গ্রামের পর গ্রামে, সভা সমিতির দ্বারা মানুষকে সংঘবদ্ধ করে আত্মীক উন্নতি ও মানব সমাজে শিক্ষার উন্নতির কথা বলেন ও কর্মে পরিণত করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথাই তৎকালীন সময়ের সকল মতুয়া ভক্তের কথা। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা নীতিই সকলে একমনে এক প্রাণে গ্রহণ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মানুষ গঠনের আহ্বান—

.....

"জ্বেলে দাও আলো মোহ দূরে ফেল।

আধার ছুটিবে দূরে।।

....

.....

পাঠশালা কর এক সাথে মর

ভাই ভাই হোক চেনা।।

কে আছে কোথায় কি ভাবে কি হয়

দিন কাটে কোন ভাবে?

লহ সমাচার দেশ দেশান্তর

যেখানে যাহারে পাবে।।"[১০৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে যে ধর্মমত দান করেন তা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম। অপরদিকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম হল মানব জীবন গঠনের ধর্ম। আর গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তার দ্বারা মানুষের কর্মময় জীবনে নব ভাবে নব উদ্দোমে কাজ করার শিক্ষা। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ধর্মকর্মের সম্মিলনকারীর ভূমিকা পালন করে মানব সমাজকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তদের সার্বিক কল্যাণকারী হলেও তাঁর কার্যবলীর মধ্যে ধর্ম চেতনায় মানুষকে আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এবং কর্ম প্রণালীর শিক্ষাদান করলেও তাকে পরিপূর্ণ রূপদান করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। কর্ম প্রণালীর মধ্যে প্রধান জাতির উন্নতি করণ প্রক্রিয়া যেখানে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর

আর কর্ম শিক্ষা ক্ষেত্র নির্মাণ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের কর্মের সংস্থান করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই মতুয়া ধর্মকে সামাজিক উন্নতির ধর্ম ও বলা যায়। হরিচাঁদঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্য প্রণালীকে বলা হয় সমাজের মানুষের শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার আদর্শে মানব জীবন গঠনের পূণ্য ক্ষেত্র।

শিক্ষাবিস্তারের গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে নেন সকল মতুয়াভক্ত সেই আদর্শেই স্কুল গড়লেন। সেই পরিচয় পাওয়া যায় আচার্য মহানন্দ হালদারের শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিতের মধ্যে। পাঠশালা গঠন ও স্কুল গঠনের পরিচয়ের বর্ণনা—

''দত্তডাঙ্গা সভা মধ্যে গুরুচাঁদ কয়।
শিক্ষা বিনা এ জাতির নাহিক উপায়।।
সেই বাণী সবে মানি নিল দেশে দেশে।
পাঠশালা করে সবে পরম উল্লাসে।।
ওড়াকাঁন্দি পাঠশালা করে রঘুনাথ।
ক্রমে ক্রমে শিক্ষাদান করে সূত্রপাত।।
নিম্ন প্রাথমিক হতে ক্রমে কালে কালে।
ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় করে কুতূহলে।।
ওড়াকাঁন্দি, ঘৃতকান্দি ঘোনাপাড়া আদি।
গ্রামে গ্রামে স্কুল হল কেহ নহে বাদী।।''[১০৪]

বাংলার যে সমস্ত মানুষ শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল তারা গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার জন্য আসেন ও বিদ্যালয় গঠনের যারা সহায়ক হন তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য মহানন্দ হালদার জানাচ্ছেন এভাবে—

''শিক্ষা আন্দোলন ঘরে প্রভু করে দেশে।
ভকত সুজন যত তার কাছে আসে।।
নমঃশূদ্র তেলী মালী আর কুম্ভকার।
কাপালী মাহিষ্য দাস চামার কামার।।
পোদ আসে তাঁতী আসে আসে মালাকার।
কতই মুসলমান ঠিক নাহি তার।।''[১০৫]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম নমঃশূদ্র কুলে। তিনি যে মানবতা বোধের দ্বারা শিক্ষা বিস্তারে উদ্দ্যোগী হয়েছিলেন সেই নীতিটিকে তিনি সকলকে জানান এভাবে—

"নমঃশূদ্র কুলে জন্ম হয়েছে আমার।
তবু বলি আমি নহি নমঃর একার।।
দলিত পীড়িত যারা দুঃখে কাটে কাল।
ছুঁসনে ছুঁসনে বলে যত জল চল।।
শিক্ষা হারা দীক্ষা হারা ঘরে নাহি ধন।
এই সবে জানি আমি আপনার জন।।
সবাকারে বলি আমি যদি মান মোরে।
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।"[১০৬]

শিক্ষা প্রসঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উন্নত চিন্তা ভাবনা এই শিক্ষালোক প্রাপ্ত শতকেও আমাদের হতবাক করে দেয়। কত বড় মানবদরদী উন্নত মনের মানুষ হলে আর কত গভীর দূরদর্শিতা থাকলে এহেন চিন্তা ভাবনা করতে পারেন—

"বাঁচি কিংবা মরি তাতে দুঃখ নাই।
গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গড়ে যেতে চাই।"[১০৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রগতির পথ নির্দেশ করলেও কৃষক ভক্ত মানুষের আর্থিক সার্বিক উন্নতি তখনও ঘটেনি। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্যবসা শিক্ষা দান করেন। কৃষিকার্য করার জন্য ভক্তদের আর্থিক সহায়তাও করতেন। তবুও জমিদার জোতদারদের আর্থিক শোষণের কবলে পড়ত তৎকালীন মানুষ। এহেন আর্থিক শোষণের সংকটের মধ্যেও গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুগামী ভক্ত মানব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

"খাওবা না খাও দুঃখ তাতে নাই।
ছেলে পিলে শিক্ষা দেও এই আমি চাই।।
বঙ্গদেশে ভরি বার্ত্তা গেল অল্প কালে।
দেশে দেশে স্কুল করে ভকতের দলে।।"[১০৮]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই নির্দেশ তার অনুগামীদের মধ্যে কেবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা স্কুল গড়ার পরিচয়ের বোঝা যায়। ঠাকুরের এই বার্ত্তা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায়। হাজার

হাজার বিদ্যালয় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তারা যেন এক নতুন জীবনের স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। এ এক সোনার দেশে এক হীরের মানুষের স্পর্শে চারিদিক পরশমণির আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে জীবন গঠন করার আহ্বানে সকলে কর্ম প্রেরণার দ্বারা জাগরিত হন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক মর্যাদা দানে তাঁদের ভূমিকা :

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই নারীকে সমাজের পুরুষের মত স্বাবলম্বি হয়ে আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন রূপে গড়ে তোলার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে 'হরিনাম' করার অধিকার দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর নারীকে 'হরিনাম' করার সঙ্গে সমাজে শিক্ষিত সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করে তারা যেন স্বাধীন মানুষ হয়ে সমাজে অবস্থান করতে পারে তার উপযোগী শিক্ষার প্রচলন করলেন।

প্রথমে আলোচনার সুবিধার্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের নারী শিক্ষা ভাবনার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনায় নারীর মর্যাদা পুরুষের মতই গুরুত্বপূর্ণ। হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরিনাম' ধর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীরা স্বভাবত কোমল হৃদয়া, কোমল স্বভাবা কিন্তু নাম মাহাত্ম এমনই যে নারীও চরিত্রতে দৃঢ় কর্মনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ দেবীতীর্থ মণি। লোকে তাকে বলে—

" 'মেয়ের স্বভাব নাই' হয়ে হরি বোলা।
সে কারণে লোকে বলে তীর্থ রামবালা।।"[১০৯]

'তীর্থরামবালা' নামকরণের মধ্যেই রয়েছে নারীর শক্তিমত্তার পরিচয়। এছাড়াও নারীদের আত্মমর্যা ও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর নারীকে তার মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত করার জন্য সর্বদাই সচেতন করতেন। নারীরাও যে ভক্তির আধার তার পরিচয়টিও পাওয়া যায়। নারী ভক্তি যোগে পুরুষের সহাবস্থান করে থাকে তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই কয়টি ছত্রে—

"মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাকশালে।
শুনে ধ্বনি সব ধনী ভাসে অশ্রুজলে।।

কিসের রান্না বান্না কিসের হলুদ বাটা।

নয়ন জলে ভেসে যায় হলুদবাটা পাটা।।

কুলবধূ ধাইতেছে হইয়া আকুল।

বাল্য বৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল।।''[১১০]

মেয়েরা রন্ধন পটিয়শি একথা সর্ব্বজন বিদিত। আর নারীই গৃহ শোভা তার ভক্তি হল নিত্যসঙ্গী। হরিচাঁদ ঠাকুর এই সহজ সুন্দর কথাটিকে দিয়েছেন মর্যাদা। ফলে নারীরা তাদের ভক্তির বিকাশ ঘটানোর যেমন সুযোগ পান তেমনি মানুষ হিসাবে তাদের গুরুত্ব দিলেন পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন। ঠাকুর বলেন ভক্তগণকে—

''পরপতি পর সতী স্পর্শ না করিবে।

না ডাক হরিকে হরি তোমাকে ডাকিবে।।''[১১১]

এখানে পুরুষকে সাবধান করেছেন তেমনি নারীরও চরিত্র সম্পর্কে সমান পবিত্রতা রক্ষা করার কথা বলেছেন। এতে নারীও পুরুষ উভয়কেই তিনি সমমর্যাদার পাশাপাশি এক সঙ্গে 'হরিনাম' গান করলেও কোনরকম মানসিক বিকৃতির হাত থেকে রক্ষাও করেছেন। পুরুষকে সর্বদা 'এক নারী ব্রহ্মচারী' হয়ে জীবনর্নিবাহ করার নির্দেশ দেন। এতে বহুবিবাহ থেকে নারী রক্ষা পাবে। ও নারী যে পুরুষের যোগ্য সহধর্মীনী তার ও মর্যাদা পাবে। হরিচাঁদ ঠাকুর নারীদের বিচার ক্ষমতার অধিকার দেন। তৎকালীন সময়ে বিষয়টি একেবারেই অভিনব হলেও আজকের সময়েও তার গুরুত্বকে আরও গভীর করে তোলে।

পিতার আদর্শ অনুসরণ করে গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্ত নারীদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য শিক্ষায়তন গঠন করে তাদের শিক্ষিত করেন। শিক্ষার জন্য বহু স্কুল গঠন করলেও নারীদের আলাদা মর্যাদা দেওয়ার জন্য ওড়াকাঁন্দিতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে আচার্য মহানন্দ হালদার এভাবে বলেন—

''নারী শিক্ষা তরে প্রভু আপন আলয়।

'শান্তি সত্য ভামা' নামে স্কুল গড়ি দেয়।।''[১১২]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তারে সহযোগী ছিলেন তৎকালীন অগণিত মানুষ এবং যিনি বিশেষ ভাবে সর্বসময় সর্ব্ববস্থায় সহায়তা করেন তিনি সি.এস. মীড সাহেব। তিনিও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সহযোগী হয়ে বিধবা বিবাহ প্রথাকে গুরুত্ব দেন। আর বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকার

ফলে সমাজে নারীদের বাল্যকালেই পিতৃভবন ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে গমন করতে হত আর তাদের জীবন ততটা উপযোগী হওয়ার আগেই অনেক বালিকা বিধবা হতেন। এ কারণে সমাজে বাল্য বিধবাদের একটা প্রভাব ছিল। বিধবাদের দুঃখ নিরসনের জন্য তিনি মানুষের অর্থাৎ ভক্ত মানুষের সহযোগিতায় বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছেন। বিধবা রমণীরাও যাতে সমাজে আত্মমর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে অপরের গলগ্রহ না হয়ে সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের সাহায্যে ড. মীডের স্ত্রী মিসটাক মহাশয়া। একদিকে ড. মীডও মীড পত্নী মিসটাক শিক্ষা বিস্তারে সর্বভাবে উদ্দ্যোগী হয়ে শিক্ষা বিস্তারের কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে আবার বিধবাদের জন্য স্কুল ও তাদের হাতের কাজ শিক্ষার জন্য নারীদের ট্রেনিং দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত ওড়াকাঁন্দি থেকে। এর কর্ম সম্পাদন করেন মিসটাক, মিসটমসনও গুরুচাঁদ ঠাকুর। এই যে শিক্ষাকেন্দ্র তার পরিচয় পাই এভাবে—

> ‘‘নারী শিক্ষা দিতে প্রভু ব্যস্ত সর্ব্বদায়।
> ওড়াকান্দি তাতে হল নারী শিক্ষালয়।।
> মীডের সঙ্গিনী ধনী নাম মিসটাক।
> পরম পবিত্রা দেবী নাহি কোন জাঁক।।
> মিস টমসন হন সাহায্যকারিণী।
> বিধবা আশ্রম গড়ে মিলে দুই ধনী।।’’[১১৩]

বিধবা আশ্রমে শিল্প শিক্ষাদানের জন্য মিসটাক গুরুচাঁদ ঠাকুরের সাহায্য চান। গুরুচাঁদ ঠাকুর মিসটাকের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ দেনও সকল নারীকেই এই নারী ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং দিতে বলেন। মিসটাক গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে নারীদের শিক্ষার প্রচলন করেন। এই সকল তথ্যাবলীর একটি ক্রমানুযায়ী বর্ণনা পাই তা হল—

> ‘‘বিধবা জীবনে তাই দুঃখে নাই অন্ত।
> পতিহারা হলে নারী হয় সর্ব্বশান্ত।।
> .....
> ‘‘মিস্‌টাক এসে বলে প্রভুজীর ঠাই।
> ‘‘বড়কর্ত্তা! এক কার্য্য করিবারে চাই।।

অনাথা বিধবা যত আছে এই দেশে।

তাদের শিখাব শিল্প আমি সবিশেষে।

জীবিকা নির্ব্বাহ তাতে অবশ্য হইবে।

বিধবা জীবনে দুঃখ আর না রহিবে।।

বিধবা আশ্রম তাই করিবারে চাই।

আপনার আজ্ঞা বিনে সাহস না পাই।।''[১১৪]

গুরুচাঁদ ঠাকুর একথা বলে মিসটাককে সম্মতি জানায় এবং বলেন—

''প্রভু বলে ''ধন্য তুমি অবলার মাতা!

তব গুণে পতিহীনা পাবে বটে গতি।

তার মধ্যে এক কথা বলিব সম্প্রতি।।

শুধু পতিহীনা নয় নারী মাত্র সব।

তোমার আশ্রয়ে এনে বাড়াও গৌরব।'' ''[১১৫]

মিসটাক সানন্দে সম্মতি জানান এবং সেই নির্দেশ মত নারী ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রী নেওয়া হল ও প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। কবির ভাষায়—

''মিসটাক বলে ''তাতে কোন বাধা নাই।

সব নারী নিব আমি যতজনে পাই।।

এই ভাবে ওড়াকান্দি নারী বিদ্যালয়।

.....

নারী ট্রেনিং স্কুল আজ হল ওড়াকান্দি।

আদি সূত্রে গুরুচাঁদ করিলেন সন্ধি।।''[১১৬]

এভাবে নারীদের সার্বিক শিক্ষার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর কাজ করেছিলেন। আর নারীদের তিনি আত্মজ্ঞান, আত্মসচেতন, চারিত্রিক দৃঢ়তায় মানব সমাজে আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার জন্য নারীদের বলতেন। নারী চরিত্র কেমন হবে, কেমন হলে সমাজে যে আত্ম মর্যাদার রক্ষা করতে পারবে সে সম্পর্কে নারীদের যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তা হল—

''বীর মাতা হতে হলে ও বীরাঙ্গনা।

বাঘ্র সিংহ দেখে যেন হৃদয় টলে না।।

সতীত্ব তেজেতে ঘেরা যার দেহ মন।

কামুক পশুরে ভয় করে না কখন।।

জননী সাজিয়া সবে কর শুভদৃষ্টি।

তোমারে দেখিয়া বিশ্বে হোক শান্তি বৃষ্টি।।"[১১৭]

নারীকে আত্মশক্তির এই সুমহান জ্ঞানের পরিচয় দান করেন রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর। এছাড়া নারীর যে স্বভাব ধর্ম গৃহকর্মে নিপুণতা তাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি নারীকে অবসর কালে নিজ মনোনিত ধর্ম গ্রন্থপাঠের নির্দেশ দেন। যা নারীকে গৃহকর্ম নিপুণা ও ধর্ম জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হতে বলেছেন—

" 'সুপাক' নারীর পক্ষে অতি বড় গুণ।

গৃহস্থালী সর্ব্বকর্ম্মে সাজিবে নিপুণ।।

অবসর কালে কর ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ।

ঘরদ্বার বিছানাদি রাখ ফিটফাট।।"[১১৮]

ছেলে ও মেয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি তাদেরকে সমানভাবে শিক্ষা দানের জন্য বলেন—

"বালক বালিকা সবে শিক্ষা কর দান।

খাও বা না খাও সবে কর গে বিদ্বান।।"[১১৯]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিষয়ে যে বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন তাঁর পরিচয় মনিমোহন বৈরাগী এভাবে ব্যক্ত করেন—

"..... ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহু পাঠশালা মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল। এবং এই সমস্ত নবগঠিত বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া নারী শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির জন্য তিনি ইতিপূর্বে শ্রীমতি মিডের সহায়তায় ১৯৩৮ সালে ওড়াকান্দিতে একটি নারী শিক্ষা ট্রেনিং স্কুলও গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে নারীদের বিভিন্ন বৃত্তি মূলক শিক্ষা সহ বিধবা নারীদের ধাত্রী বিদ্যার প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। ডা. সি.এস. মীড নিজেই বিধবা মহিলাদের এই প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রশিক্ষণ

শেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের ছুরি, কাঁচি, গ্লাভস ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রও সরবরাহ করা হত। এই রকম একজন দক্ষ ধাত্রী ছিলেন জয়ধ্বনিদেবী ওড়াকান্দির এই নারী ট্রেনিং মিশন স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জয়ধ্বনি দেবী একজন সফল ধাত্রী হয়ে সমাজের অশেষ উপকারও করেন।''[১২০]

শিক্ষা বিস্তারে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর মূল্যায়ন করেছেন সন্দীপ দাশগুপ্ত। সন্দীপ দাশগুপ্ত মহাশয়ের এই মূল্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাই উত্থাপণ করলাম। আনন্দ বাজার পত্রিকার রবিসরীয় ঐতিহাসিক কলামে গত ১৪-০৪-২০০২ তারিখ রবিবার সন্দীপ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—

''ইতিহাসে অধরাদের তালিকায় এমন আরও নাম আছে। ..... তথ্যের দিক থেকে একথাও উড়িয়ে দেওয়া গেল না, গুরুচাঁদ ঠাকুর নামে কার্যত অজ্ঞাত অন্য এক বাঙালির আন্দোলনেই পূর্ববঙ্গে হাজারেরও বেশি স্কুল হয়েছিল। এদের কারও কাজের ব্যাপকতা হয় তো বহুকথিত দু-একজন মহাজনের মত নয়।''[১২১]

এটি অর্থাৎ এই উপরিউক্ত অভিজ্ঞতাটির বাস্তবতা হল মতুয়া ধর্ম এখনও সার্বিক ভাবে আলোচিত হয় নি। তার গুরুত্ব কত গভীর ও ব্যাপকতা লাভ করবে তা বর্তমান ও ভবিষ্যতে মূল্যায়ন হবে।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার কবিরস রাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫, পৃ. ৫৭-৫৮।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৯. পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীহরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞা।

১০. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১১. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১২. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৩. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৪. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৫. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৬. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৭. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৮. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৯. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

২০. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৪০. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, বীণা পাণি প্রেস ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৪২. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৯।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯-১২০।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১।

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪।

৯০. পাগল বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ২৮।

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৯২. বৈরাগী মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১১ মার্চ, রবিবার ২০১২, পৃ. ১২৩।

৯৩. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ১১১।

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

১০১. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার ২০১২, পৃ. ১২০।

১০২. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ১৩০।

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ.

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১০৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০১।

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

১১১. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৬৯।

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৬।

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯।

১২০. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার ২০১২, পৃ. ১৩৩।

১২১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ঐতিহাসিক কলাম, ১৪.০৪.২০০২।

পঞ্চম অধ্যায়

মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমাজ বাস্তবতা

মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে উনিশ শতকের যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়; সেই সময়ের মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকে এবং ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য সম্ভার রচিত হয় তা 'মতুয়া ধর্ম' সাহিত্য নামে খ্যাত। এই সাহিত্য রচিত হয় হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ও হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত সহচরের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন, ও কার্যাবলীকে গ্রন্থ বদ্ধ করেন সমসাময়িক আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয়। মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই সাহিত্যে হরিচাঁদ ঠাকুরকে মানুষ ভগবান হিসাবে সাহিত্যকারেরা বা কবিরা একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। আর তাঁর সহযাত্রীরা ছিলেন সকল কর্মের সহযোগী। এই সাহিত্যের ভগবান কোন দূরাগত লোকের অধিবাসী নন। তিনি একান্তই আপনার জন। তিনি সাহিত্যে রচিত কোন কল্পিত মহামানব নন, তিনি হলেন এই বাস্তব জীবন সমাজের প্রতিনিধি। এই বাস্তব সমাজ বা আধুনিক কালের হরিচাঁদ ঠাকুর ও পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও ক্রিয়া কর্মগুলিই মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু।

হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকালেই অলৌকিক শক্তিধর বালক রূপে পরিচিত হন। যৌবনের প্রথমাবস্থায়ই ভক্তের ভগবানে পরিণত হন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর উপর ভক্তির প্রভাব লক্ষ করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রে এবং শান্তিদেবীর উপর যে দেবদেবী চরিত্রগুলির প্রভাব বর্ণিত হয় তারা হলেন ভারতের তথা আদি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক চরিত্র 'কৃষ্ণবাসুদেব-বিষ্ণু' শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রাঙ্কনের মূলে অবস্থান করছে আর শান্তিদেবীর চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে রুক্মিণী-লক্ষ্মীর অনুসরণে। অর্থাৎ পৌরাণিক চরিত্রের নিরিখে। এই পৌরাণিক চরিত্রগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথমে জেনে নেওয়া প্রয়োজন আলোচনার সুবিধার জন্য। এই পৌরাণিক চরিত্রের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় এগুলি পৌরাণিক কাহিনি তান্ত্রিক কাহিনিগুলি, শিব শক্তিবাদ, এছাড়াও আরও অন্যান্য কাহিনিগুলি বৈদিক সভ্যতার

পূর্বেই এদেশে বর্তমান ছিল। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থের 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন সেখান থেকে পৌরাণিক কাহিনি ও আরও অনেক তথ্য জানার জন্য গ্রহণ করছি। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিছুটা অংশকে আলোচনার সুবিধার জন্য তুলে ধরলাম—

> ''ইংরেজীতে একটি কথা আছে, The old gods never die—
> পুরাতন দেবতারা চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা মরেন না।
> দেশের বা জাতির প্রাচীন ধর্ম একেবারে নির্মুল হইয়া যায় না—
> নূতন ধর্ম বাহির হইতে আসিয়া গৃহীত হইলেও তাহাতে পুরাতনের
> অনেক জিনিসই একটু নামও রূপ বদলাইয়া নিজ মৌরশী পাট্টা
> কায়েম রাখিয়া থাকে। আর্য্যেরা আসিল তাদের হবন বা হোম
> মূলক ধর্মানুষ্ঠান লইয়া। দেশে, অনার্য্যদের মধ্যে পূজা মূলক
> ধর্মানুষ্ঠান ছিল; 'পূজা' আংশিক ভাবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে
> সংস্কৃত-ভাষাময় অনুষ্ঠান লইয়া আর্য্য-অনার্য্যের মিলিত ধর্মে
> (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মে) নিজ স্থান করিয়া লইল। আর্য্যদের
> দেবলোক ও অনার্য্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের দেবলোক, উভয়ের
> মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা মিল দাঁড়াইয়া গেল, আর্য্যানার্য্য অর্থাৎ
> পৌরাণিক দেবলোকের 'সুধর্মা-সভার' অধিবাসীদের সৃষ্টি হইল।
> প্রাচীনের ধারা নবীনের সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া পরিবর্তিত
> আকারে কোথাও বা ক্ষীণভাবে কোথাও বা আরও পরিবর্ধিত
> রূপে, এখনও পর্য্যন্ত প্রবাহিত রহিয়াছে।
>
> প্রাচীন অনার্য্য ভাষা, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,
> কিন্তু এগুলি আর্য্য ভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত
> করিয়া দিয়াছে; এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য
> শব্দ আর্য্য ভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে। ..... এখন
> মোটামুটিভাবে আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈদিক
> আর্য্যধর্মের বাহিরে যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম মিলে, যে

> কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগদর্শন ও যোগের নির্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব-শক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সে সমস্ত জিনিস মুখ্যতঃ অনার্য্য-ধর্ম জগৎ হইতেই গৃহীত।[১]

ধর্মসাহিত্যের মধ্যে যে জন্মান্তরবাদের আলোচনা পাওয়া যায় তাও অনার্য্য সভ্যতার পরিচয় বহন করে থাকে। ধর্ম সাহিত্য থেকে দেখা যায় কোন মহামানব কোন বড় কোন কার্য গ্রহণ করেছে তখনই কোন না কোন ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে পুনরায় এই ধারণা হয় মানুষের। কারণ সভ্যতার প্রায় প্রথম লগ্ন থেকেই এই বিশ্বাস মানুষের মনে গড়ে উঠেছে। এই জন্মান্তর বাদকেও স্বীকার করা হয় ধর্ম সাহিত্যে। একথা হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা কাহিনি তথা জীবনী গ্রন্থেও বেশ সক্রিয়ভাবে দেখানো হয়েছে। এই যে অলৌকিক শক্তির কথা ব্যক্ত হয় তাও মানুষ বিশ্বাস করে থাকে মহাপুরুষ বা ভগবানের চরিত্র মাহাত্মে। কেননা সেই শক্তিধর পুরুষ সমাজের ব্যক্তি মানুষের শক্তির থেকে অনেক শক্তির অধিকারী হন। আমার গবেষণার বিষয় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও ও শান্তিদেবীর চরিত্র সেই পূর্ণ বিকশিত সত্ত্বার পরিচায়ক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তৎ পত্নী সত্য ভামাদেবীর চরিত্র ও সেই ভগবান চরিত্রের পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় দ্বারাই পরিচিত। এছাড়াও হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাব ধারায় আদর্শিত অনেক মহাসাধক মহাসাধিকার পরিচয় আমরা গ্রহণ করব গ্রন্থ আলোচনার মধ্য দিয়ে। মতুয়া ধর্মের মূল আকরগ্রন্থগুলি থেকে আমরা দেখব উনিশ শতকের সমাজ বাস্তবতার বিভিন্ন দিককে। একটি বিষয় না বললেই নয় কোন ধর্ম প্রণেতার আবির্ভাবে সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আলোড়ন শুধু জ্ঞানের দ্বারা, কর্মের দ্বারাই বিকশিত হয় না। এখানে ভক্তির প্রাবল্যও থাকে গভীরভাবে। তাই সেখানে গানের মাধ্যমেও সেই মহাপুরুষের চরিত্র মাহাত্মকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন অনেক ভক্ত সাধকেরা। হরিচাঁদ ঠাকুরকেও এই গানের মাধ্যমে স্তব করেছেন অনেক ভক্তগণ। তাই জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে গানের বইও একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় বহন করে থাকে। হরিচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আজ ২০৫ বছরে রচিত হয়েছে অগণিত সাহিত্য সম্ভারের। তার বিভিন্ন দিক রয়েছে।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনের কার্যাবলীর পরিচয় যে সকল গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় সেই গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মীয় আবেদন ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যেমন

রয়েছে তেমন ভাবে রয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয়। সমাজের সামগ্রিক পরিচয় কতটা এই জীবনী সাহিত্যে রয়েছে তা আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে যেমন এই অধ্যায়ে রয়েছে তেমনি ভাবে মানুষের জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার বিস্তারিত আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া হল যথা—

মতুয়া গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরিচয় সন্ধান।

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা।

উপরিউক্ত দিকগুলিকে একটি একটি করে যথাসাধ্য বিস্তারিত আলোচনা করব মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে থেকে ঘটনাবলী ও হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলী ও তৎকালীন প্রেক্ষাপটের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে। প্রথমেই মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

মতুয়া গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পরিচয় সন্ধান :

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় জ্ঞানঅবতার গৌতম বুদ্ধের প্রসঙ্গকে। আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে যথার্থভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও প্রসারের কথা আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্ম ছিল বাংলায় রাজধর্ম ও ভেদ জ্ঞানহীন সাম্য নীতির ধর্ম। বাংলার রাজা প্রজা সকলেই এই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে কয়েক'শ বছর শাসন কার্য করে চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় রাজার পরিবর্তনের ফলে। পাল রাজাদের পতনের পর সেন রাজারা তাঁদের রাজত্বকালে মানুষের মধ্য থেকে বৌদ্ধধর্মকে পরিত্যাগ করাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু মহাবলবান বৌদ্ধ সাধকগণ বহু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেও ধর্মকে পরিত্যাগ করেন নি। নিজেরাই নগর ত্যাগ করে গ্রামান্তরে চলে যান ধর্ম রক্ষার জন্য। সেই নির্মম ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে মতুয়া ধর্ম গ্রন্থগুলি।

মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্মের স্বরূপটি ধরা পড়েছে এভাবে—

''জ্ঞান অবতার বুদ্ধ নব যুগ আনে।

রাজা প্রজা সবে মাতে অহিংসার গানে।

সবে একাকার হল পেয়ে তার শিক্ষা।

আসমুদ্র হিমাচল নিল তার দীক্ষা।।

দেশে দেশে সাম্য নীতি হল পরচার।

মনে হল বিশ্ববাসী হবে একাকার।।"[২]

পাল রাজাদের পরিবর্তনের পর সেন রাজবংশের নৃপতিদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মকে পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করলেও বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করতে অনাগ্রহীদের কীভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে ও আরও অনেক গ্রন্থের মধ্যে।

"কত হল অত্যাচার কিবা কব সমাচার।

বৌদ্ধ কত বধ্য ভূমে যায়।

যে ছাড়ে বৌদ্ধের ধর্ম্ম যে হয় পরমধন্য।

রাজদ্বারে সম্মান সে পায়।"[৩]

রাজ আজ্ঞায় শাস্তি নিরুপিত হয় বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের। কিন্তু ধর্ম প্রাণ মানুষ সামান্য স্বার্থে ধর্ম ত্যাগ কখনোই করে না প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের কাছে—

"যদি মোরা রাখি ধর্ম্ম মোদের রাখিবে ধর্ম্ম

দেখা যাক কিবা হয় শেষে।।"[৪]

রাজ আজ্ঞানুসারে বৌদ্ধদের মৃত্যুর নির্দেশ দান করেছিলেন তার পরিচয় পাই এভাবে—

" যেখানে যেখানে বৌদ্ধ পাও কারে নাহি ক্ষমা দেও।

মুণ্ডচ্ছেদ করহ সবার।।"[৫]

এরূপ শাস্তির পরিচয় পাই আমরা সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের উপর কীরকম নির্মম পীড়ন কী অমানবিক কার্যকলাপের মাধ্যমে এই জাতি সংঘর্ষ ও শ্রেণি সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার বিবরণ দিলে আজকের যুগের মানুষ শিউরে উঠবে। একথা জানা যায় বেদ ভাষ্যকার সুবিখ্যাত শায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য লিখেছেন—

"কুমারিলের সহায়ভত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংহার

উদ্দেশ্যে এই আদেশ প্রচার করেন যে—

আসে তোরা তুষারাদ্রে বৌদ্ধনং বৃদ্ধবালকান্।

ন হন্তি য সহন্ত ব্যে ভৃত্যানিত্য স্বশান্ন্ পঃ।।

অর্থাৎ রাজা স্বকীয় কার্যকর্তাদিগকে আদেশ করিলেন। একদিকে সেতু বন্ধ রামেশ্বর অপরদিকে হিমালয় পর্বত, ইহার মধ্যে আবাল বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার করো। যাহারা বধ না করে তাহারা বধ্য।"[৬]

এহেন অত্যাচারের দ্বারা জোর পূর্বক বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদের অনেককে ধর্মান্তরিত করে নিলেও অনেক বৌদ্ধরা ধর্ম ত্যাগ না করে রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন রাজ অত্যাচারে তাদের পরিচয় আমরা পরে গ্রহণ করব। ধর্ম ত্যাগ করিয়ে নব ভাবে ধর্ম গ্রন্থ রচনার ইতিহাস ও পাওয়া যায় মতুয়া ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে। এই যে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন সেই সঙ্গে নতুন শাস্ত্র গ্রন্থও যে রচিত হয়েছিল পুরাণো বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থগুলিকে পরিবর্তিত করে সেই পরিচয়ও পাওয়া যায়। আচার্য মহানন্দ হালদার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে নব ধর্ম গ্রন্থ রচনার কথা ও পুরোহিত দিয়ে পূজা করার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন—

....

পরে গড়ে অভিনব ধর্ম্ম।

কিছু কিছু বৌদ্ধ নীতি হিন্দু ধর্ম্মে দিল গাঁথি।

কেহ নাহি বুঝিল সে ধর্ম্ম।।

অভিনব পুরাণাদি লিখে সবে নিরবধি

'বেদ ভাস্য' বলি তারে কহে।

সৃজিল দেবতা কত যার যার মনোমত

সবে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র কেহ নহে।।

তন্ত্র মন্ত্র উপাখ্যান শাস্ত্র মধ্যে পেল স্থান

ব্রাহ্মণ সাজিল পুরোহিত।।"[৭]

ব্রাহ্মণ পূজার পুরোহিত হলেন। আর বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রগুলিও পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু শাস্ত্র হল। রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তন হয় যেমন তেমনি ধর্ম গ্রন্থেরও ঘটে পরিবর্তন। এর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাখ্যায়। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান

ও বৌদ্ধধর্মের প্রস্থানের ঠিক সন্ধিক্ষণে বৌদ্ধদের সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম ইত্যাদির পরিবর্তন করে নিজেদের ইচ্ছে মত তৈরি করে নিয়েছিলেন তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বলেছেন—

> ''বৌদ্ধধর্মের নিদর্শনগুলি ব্রাহ্মণেরা নাম পালটে তাদের নিজস্ব সম্পদ করে নেয়। বৌদ্ধ ধর্মের চিহ্ন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নিমূল করে দেয়। বৌদ্ধ সভ্যতার সকল স্মৃতি ব্রাহ্মণেরা লুপ্ত করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই ব্রাহ্মণেরা পরিবর্তিত করে নিজেদের করে নিয়েছেন।''[৮]

নমঃশূদ্রগণ যে বাংলার একটি বীর জাতি সেই পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার রাজা প্রতাপ আদিত্যের রাজত্ব কালেও। নমঃজাতির মানুষ প্রতাপ আদিত্যের সময়ও সামরিক সৈন্য ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে—

> ''প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ পুণ্য ধাম
> তাঁর কীর্ত্তি গাঁথা সব শুনে।
> বাহান্ন হাজার ঢালী নমঃশূদ্র বংশাবলী,
> ব্যাখ্যা তাঁর করে সর্ব্বজনে।।''[৯]

এরপর প্রতাপ আদিত্যের পরাজয়ে অভিশাপ নামে বাঙালির স্বাধীন বাংলায় এবং বীর সৈন্যদের মধ্যে যারা নমঃজাতির মানুষ ছিল তারা সেনা বৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকার্যে রত হন। সেই তথ্য দিয়েছেন মহানন্দ হালদার—

> ''তাঁর যত ছিল বীর দুদর্শায় নৃপতির।
> যবনের বশ্যতা মানিল।
> সেনা বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে কৃষি আদি কর্ম্ম নিয়ে,
> জীবিকার উপায় করিল।।''[১০]

মতুয়াধর্ম সাহিত্যে ঐতিহাসিক সন্ধানের ফলে জানা যায় যেমন ধর্মের ইতিহাস তেমনি ভাবে বোঝা যায় রাজার পরিবর্তনের পর কীরকম পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করেন পূর্ব রাজার সভাসদগণও ধর্মপ্রাণ প্রজাবর্গ। সেই অনালোকিত ইতিহাসের তথ্য বহন করে চলেছে মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলি। নমঃজাতির মানুষ সেই রাজ পরিবর্তনের সময় অনেক

ধর্ম প্রাণ মানুষের ধর্ম অপরিবর্তিত ছিল। তাদের নির্মম অত্যাচারিত জীবন চিত্রেরও পরিচয় পাই এই সাহিত্যের মধ্যে। গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃজাতির জাতিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন স্বজাতির সভার মাঝে সেই বক্তৃতা থেকে জানা যায় নমঃশূদ্র জাতির পূর্ব্ব পুরুষের কথা। আর সেই পূর্ব্ব পুরুষের কথার মধ্যেই রয়েছে ঐতিহাসিক সত্য পরিচয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই ঐতিহাসিক সত্যকে যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তা হল—

"যা কিছু বলিতে চাই তাতে মোর কিছু নাই
সব বলে পিতা মোর অগতির গতি।
জাতিতত্ত্ব ইতিবৃত্ত নমঃশূদ্র জাতিতত্ত্ব
স্বজাতি সভার মাঝে বলিবারে চাই।।
পূর্ব্ব পুরুষের কথা তাতে ভরা-পবিত্রতা
বংশ পরিচয় গাঁথা শুনুন সবাই।।"[১১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সকল কাজ করেছেন সারা জীবন। আর তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ। তিনি যে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পাই যেমন ধর্ম ক্ষেত্রে তেমনি কর্ম ক্ষেত্রেও সেই অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। তিনি তৎকালীন শাস্ত্রীয় শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। আচার্য মহানন্দ হালদার তার সামগ্রিক দিককে যথার্থ ভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আচার্য মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"জগতের তুলাদণ্ডে দেখিতেছি দণ্ডে দণ্ডে
বারে বারে হানা দেয় অসম বিষম।
চিৎ শক্তি ধরি বুকে সম দিতে পৃথিবীকে
নররূপে ভেঙে দেয় যাহা ব্যতিক্রম।"[১২]

এই যে মানুষে মানুষে বিভেদ, সেই নীতিকে অহিংসার অভয় বাণীতে ভরিয়ে তুললেন জ্ঞানী বুদ্ধ। সেই মহান উদারনীতির সুদূর প্রসারী ভাবধারায় রাজা প্রজা সকলেই সমভাবে ব্রতী হয়ে ধর্মাচার পালন করছিলেন সেই তথ্যকে গুরুচাঁদ ঠাকুর সভায় বলেন। সেই বক্তব্যটি হল—

'একদা ভারত খণ্ডে আসিয়া উত্তরবঙ্গে

রাজার আলয় জন্মে জ্ঞান অবতার।

বুদ্ধনামে পরিচিত করিলেন জীবহিত

ভেদাভেদ ভুলি সবে হল একাকার।।

পেয়ে তত্ত্ব এক বর্গ ভূতলে নামিল স্বর্গ

বিশ্বশক্তি মহামন্ত্র উঠিল ধ্বনিয়া।।

....

.....

জীবে শক্তি পায় বুকে ত্রিতাপ জ্বালার মুখে

অহিংসা পরম সত্য জাগিল হৃদয়ে।

নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এক জাতি এক দেশ

দলে দলে বৌদ্ধ ছুটে সে ধর্ম বিজয়ে।।"[১৩]

শুধুমাত্র ধর্ম দ্বারাই যে মানুষের জীবনের উন্নতি সাধন সম্ভব নয় শিল্প সাহিত্যের ও সমভাবে গুরুত্ব পেলে তবেই জীবনে ধর্ম কর্মের সম্মিলনে পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব। সেই সকল শিল্প, সাহিত্য যে উন্নত ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। সারা ভারত বৌদ্ধ ধর্ম প্লাবিত করে বিভিন্ন দেশে দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। কবির বর্ণনায়—

গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তৃতার বর্ণনা—

"ভারত বিজয় হল তবে ভূভারতে গেল

মানব মনের বাধা গেল যে টুটিয়া

কিবা শিল্প কি সাহিত্য কিবা ধর্ম্ম কিবা তত্ত্ব

শাশ্বত রূপের ছবি উঠিল ফুটিয়া।।"[১৪]

'অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা' গ্রন্থে লেখক মনিমোহন বৈরাগী বৌদ্ধ পালরাজাদের কীর্ত্তি কথা যথার্থভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজারা ছিলেন জাতিতে নমঃ (চণ্ডাল)।

যাদের রাজত্বকাল ছিল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৩০ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত। ..... । চণ্ডাল বংশীয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের

মত পাল রাজত্ব কালেও সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল পাল রাজাদের গৌরবে গৌরবান্বিত। এই সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল সমাজের সকল গোষ্ঠীগুলির সম্মতিতে গঠিত সমানাধিকারের রাষ্ট্র। ধর্ম পাল কর্তৃক মগধে বিক্রম শীলা মহাবিহার এবং বিহারের ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়েই। এই পাল যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা মহাবিহার সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল; যা বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার ছিল এক অন্যতম পীঠ স্থান।"[১৫]

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কীভাবে রাজধর্ম বৌদ্ধদের অত্যাচার করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে রূপান্তরিত করতে শুরু করেন। অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে স্বীকার করলেও অনেক বৌদ্ধ ধর্ম বীরগণ ধর্ম রক্ষা করে গহন কান্তারে চলে গিয়েছিলেন তপস্যার জন্য। তারা সকলেই ধর্মবীর হয়ে ধনবান হয়ে জীবন ধারণ করলেও তাদের হীন বলে প্রতিপন্ন করতে অপ ব্যাখ্যা করেন সমাজের আত্ম অহংবোধ সম্পন্ন মানুষ।

"..... ভারতের পূণ্য ভূমে
বৌদ্ধ ধর্ম্ম নাশ করে সবলে পিষিয়া।।
দলে যত ভারী হয় অত্যাচার বেড়ে যায়
ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ নাম গেল দেশান্তরে।
ধর্ম্মে ভালবাসে যারা কতই সহিল তারা
প্রাণ দায় শেষে যায় কানন প্রান্তরে।।"[১৬]

ধর্মের জন্য মহৎ সকলেই সর্ব্বকালে সর্ব যুগে প্রাণ পণ করে ধর্ম রক্ষা করে নিস্বার্থ হয়ে, তারই নিদর্শন পাওয়া যায় ধর্মের নামে অত্যাচারের সময়। সেই ধর্ম রক্ষাকারীর পরিচয় পাই এভাবে—

"ধর্ম্মতরে মাথা দিল মহৎ সকল।।
তার যত বংশধর দূরে থাকি পরস্পর
নিরালে বসিয়া কিছু পালে রীতি নীতি।
ধনবান বলবান করিবারে হত মান

আখ্যা দিল তা সবারে অপবিত্র জাতি।।

....

.....

ভারতের ইতিহাসে বঙ্গ বা অপর দেশে

হিন্দুরূপী বৌদ্ধ দেখা যায় ঘরে ঘরে।।

তাই দেখি সর্ব্বদেশে যা দিগে অস্পৃশ্য ভাষে

হিন্দুর সকল নীতি নাহি জানে তারা।''[১৭]

হিন্দু রাজার অত্যাচারে যে সকল বৌদ্ধ ধর্ম রক্ষাকারী ধর্মবীরগণ বহু লাঞ্ছনার মধ্যে ও রক্ষা করেছে আপন ধর্মাদর্শ সেই মহাধার্মিক পূর্ব্বপুরুষগণই যে নমঃজাতির পূর্ব্ব পুরুষ আর আমরা সেই বংশধরদের উত্তরসূরী একথা জোর দিয়ে বলেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। এই সত্য ঐতিহাসিক সত্য একথা প্রত্যেক ঐতিহাসিক, সাহিত্য রচয়িতাগণ স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই বক্তব্যগুলি হল—

''বঙ্গদেশে নিষ্ঠাবান ছিল যত মতিমান

ধর্ম্ম ছাড়ি প্রাণ রক্ষা করিতে না চাহে।

ধর্ম্মতরে দূরে যায় কত অত্যাচার সয়

ধর্ম্মতরে বন মধ্যে হীন হয়ে রহে।।

এই ধর্ম্মবীর যারা সেই বংশে জন্মি মোরা

কালের কুটিল চক্রে হয়ে আছি হীন।

বহুদিন গত হয় সবে মহা দুঃখ সয়

এই ঘরে এল তাই হরিভক্তাধীন।।''[১৮]

এই গুরুচাঁদ ঠাকুরের যে বাস্তব সম্মত ধর্ম জ্ঞান তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই পর্বে। ধর্ম পালন করার জন্য যেমন গৃহ ত্যাগের প্রয়োজন নেই তেমনি তীর্থ যাত্রার ও কোন প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই তীর্থপতিকে পাওয়া যায় পবিত্র চরিত্রাদর্শ রক্ষার মাধ্যমে। সেই কথা দৃঢ় করে জানান সকলকে—

''ধর্ম্ম নহে দূরে কোথা ঘর ছেড়ে খোঁজ বৃথা

আপনার ঘরে ধর্ম্ম আছে ঘুমাইয়া।

পবিত্র চরিত্র রেখে সত্য বাক্য বলে মুখে

হরি বলে ধর্ম্ম বাতি লহ জাগাইয়া।।

ঘরে তের দূরে বার ঘরে থেকে ঘর সার।

তীর্থে তীর্থে কিবা কর ফল কিবা তার?

ঘরে আছে কত চোরা তোমাকে করিল সারা

তীর্থে শুধু অর্থ বিত্ত সর্ব্বনাশ হয়।।

ঘরে যদি ঠিক হয় তীর্থ যাবে কিবা দায়

তীর্থপতি জগদিষ্ট রয় তার ঘরে।''[১৯]

এভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর পূর্ব্ব পুরুষের ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করে তাদের অতীত গৌরব গাঁথা স্মরণ করিয়ে তাদের আত্মচৈতন্য দান করে আত্মসম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সার্ব্বিক মহাসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্ব্বজন স্বীকৃত।

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা :

রাষ্ট্র যে ভাবে শাসিত হচ্ছে সেই সময় তার প্রভাব যে মানব সমাজে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশির যুদ্ধের পর মুসলমান নবাবের কাছ থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। ইংরেজ রাজত্ব কালে নীলকর সাহেবের অত্যাচার, জমিদারী প্রথার মধ্য দিয়ে সাধারণ কৃষকদের অসহায়তা দেখা দিলেও উচ্চ বৃত্ত উচ্চ মধ্যবৃত্ত বাঙালি সমাজ যে ইংরেজ শাসনকে সৌভাগ্যময় মনে করেছিল বিভিন্ন কারণে। বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন স্বপন বসু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস'-এ। সেখানে তিনি উনিশ শতকের সচেতন বাঙালির ইংরেজের প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তার নানা দিক সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি যে সুবিধাগুলি আলোচনা করেছেন তার কিছুটা অংশ তুলে ধরলাম—

''উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে সচেতন বাঙালির ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের যুগ বলতে পারি। উচ্চ বৃত্ত ও মধ্যবৃত্ত হিন্দুরা ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান অত্যাচার থেকে তাঁদের মুক্ত করে,

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চিন্তা জগতে নিয়ে যাবার জন্য। এছাড়া ধন প্রাণের কিছুটা নিরাপত্তা; ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্মসূত্রে সম্পদ আহরণের সুযোগের জন্যও তাঁরা ছিলেন ইংরেজের একান্ত অনুগত। জনসাধারণ ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে গণ্য না করলেও, রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দুতরফই এদেশে ইংরেজ আগমনের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।''[২০]

এই হল আত্মসচেতন বাঙালির উন্নতির জন্য রাজ সরকারের প্রতি সচেতন চিন্তার প্রসারের দিক। এই রকম একটি আত্মসচেতন বাঙালি পরিবারের কথা আলোচনা করব যারা নিজ পরিবারের উন্নতির সঙ্গে সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন ইংরেজ সরকারের সহায়তায়। তাদের মধ্যে দু'জন মানুষই অগ্রগণ্য এবং তাদের অনুসারী অগণিত মানুষই এই সময় ছিলেন। তারা হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তখনকার ভক্ত সমাজের উন্নতিই ছিল তাঁদের কাম্য। হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মীয় মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন বলেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল কীভাবে খাঁটি ধর্মের মাধ্যমে সমাজের মানুষের উন্নতি সাধন। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমে 'নাম' ধর্মের মাধ্যমে মানুষের মনকে উন্নত করতে অগ্রসর হন। তিনি 'নাম' ধর্মের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করে মানুষকে আদর্শ গৃহী মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শের ভাবধারাকে বিস্তৃত আলোচনা করছেন আচার্য মহানন্দ হালদার। কিন্তু কয়েকটি ছত্রে তাদের কার্য প্রণালীর তথ্য পরিবেশন করেছেন এভাবে—

''নাম অস্ত্রে করে হরি প্রথম আবাদ।
কৃষক সাজিয়া ভূমি কর্ষে গুরুচাঁদ।।
ধর্ম্ম অস্ত্রে হরিচাঁদ পাপকে কাটিল।
কর্ম্মবলে গুরুচাঁদ পুণ্যকে আনিল।।
পবিত্র চরিত্র বীজ তাহে দিল বুনি।
প্রশস্থ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ফলিল তখনি।।''[২১]

হরিচাঁদ ঠাকুর 'নাম' ধর্ম দ্বারা মানুষকে প্রথমে আত্মচৈতন্য, আত্মজ্ঞানী, আত্মদর্শি করেছেন। চরিত্রাদর্শকে কুসংস্কার মুক্ত করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই আত্মতত্ত্ব সম্পন্ন মানুষকে নিয়েই

কর্মাদর্শকে গঠন করেছেন। যাতে মানুষ জীবনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শের পরিপূর্ণ বিস্তারে মানুষের জীবন পূর্ণতা পায় সেই জন্যই কাজ করেছেন। তাই কবি মহানন্দ হালদার গ্রাম্য উদাহরণের মধ্যে তাদের কার্যাবলীর কথা বলেছেন। 'নাম' অস্ত্রে প্রথম আবাদ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের মনকে, মানুষের দেহকে। আর সেই প্রথম ফসল ফলানো জমিতেই দ্বিতীয় আবাদ করেন কর্মাদর্শের পূর্ণতা রূপে। হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে দায়িত্ব দেন আদর্শ সাজে মানুষকে সাজানোর জন্য। গুরুচাঁদ ঠাকুর সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে সচেতন রেখে সমাজের কল্যাণে কীভাবে তৎকালীন পরিবেশে সার্বিক উন্নতির পথ সুগম করেছেন তারই বিস্তারিত আলোচনা করব। গুরুচাঁদ ঠাকুরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবনাকে ও কার্যাবলীকে মতুয়া গ্রন্থ থেকে আলোচনা করব। হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীকে সুদৃঢ়ভাবে অগ্রসর করান গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষাবিস্তারের অগ্রাধিকারের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সামাজিক উন্নতি যেমন নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নতির উপর, তেমনি আবার অর্থনৈতিক উন্নতিও নির্ভর করে শিক্ষা ও রাজনীতির অগ্রগতির উপর। কারণ শিক্ষা মানুষের বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা আনে বলিষ্ঠ চিন্তার বাস্তব রূপের প্রসারতা। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তৎকালীন সরকারের সহযোগিতায় শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষায়তনের গঠন ও শিক্ষিত যুবকদের সরকারী কার্যে নিয়োগ করেছেন। যা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত।

১৯১০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী একটি ঘটনাকে তুলে ধরছি। গুরুচাঁদ ঠাকুর কীভাবে তৎকালীন শাসকগণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করেছেন তারই সাক্ষর বহন করছে। এছাড়াও রয়েছে আরও বহু ঘটনা যাকে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব।

তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন স্যামুয়েল ন্যাথান সাহেব। যিনি ঢাকা বিভাগের কার্যাধ্যক্ষ। তিনি ঠাকুরের জন্মভিটা ওড়াকান্দি পরিদর্শন করেন ন্যাথান সাহেবের কাছে খবর ছিল নমঃজাতির। খবরের যথাযোগ্য পরিচয় গ্রহণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৈরি হন। কারণ কমিশনার অফিসে খবর ছিল নমঃ হল একটা দাঙ্গাবাজ জাত। গুরুচাঁদ ঠাকুর কমিশনারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ড. মীড সাহেবকে ডাকলেন ও সব কথা বলেন।

ড. মীড সহায়তা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে। তিনি যে ন্যাথান সাহেবের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার কথা বলেন তাতে মীড সম্মতি জানান সপত্নীসহ।

গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভাবে ন্যাথান সাহেবকে অভ্যর্থনা জানান তা থেকে দেশীয় হৃদয়বত্তার পরিচয় মেলে। 'শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ চরিত্র সুধায়' বিচরণ পাগল বর্ণনা করেছেন সুন্দর ভাবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সাহেবকে বরণ করেছেন যে নিয়ম রীতিতে তা হল—

''শ্রীধামেতে উপনীত ক্রমে সর্ব্বজন।
ঠাকুরের ধর্ম্ম কন্যা মিসটাক যিনি।
অগ্রভাগে ঠাকুরের পদ বন্দে তিনি।
হেরিয়ে কমিশনার ঠাকুরে নমিল।
সঙ্গে সঙ্গে গুরুচাঁদ নমস্কার দিল।''[২২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে উদ্দ্যোগী হন সাহেবকে সম্মান জানাতে। ন্যাথান সাহেব রাজচিত সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি হলেও তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের কথা ব্যক্ত করেছেন ও সম্মান দান করেছেন দেশাচার মতে। গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজেই অতিথিকে বরণ করেন এভাবে—

''বাহাদুরে বসালেন ধরি স্বহস্তেতে।
যার যে সম্মান রক্ষা করে হর্ষচিতে।।
রাজ নীতি ব্যবহার আনন্দে করিল।
পুণ বলে অদ্য মম সুপ্রভাত হল।।
গৃহে বসি হল মম রাজ দরশন।
বড়ই সৌভাগ্য মম সার্থক জীবন।।
.....
কি দিয়ে রাখিব আমি সম্মান রাজার।।
হীরা, মণি মানিক্যাদি যোগ্য এ সম্মানে।
অন্যান্য রাজন্য বর্গ যথাযোগ্য দানে।''[২৩]

তিনি যে ভাবে অভ্যর্থনা দান করেন সাহেবকে তাতে কৃষিজীবী পরিবারের জীবন চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ভক্তি ভাবের প্রকাশ ও ঘটেছে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিনয়াবণত বচনে সাহেব প্রীত হন। তার পরিচয় পাই পরবর্তী কার্যের মাধ্যমে। গুরুচাঁদ ঠাকুর যা বলে বরণ

করেন—

"আমাদের কিছু নাই করিতে কল্যাণ।
আইলেতে দূর্ব্বা হয় ক্ষেতে হয় ধান।।
আমরা গরীব প্রজা আছি আপনার।
কৃপা করি নিন এই ক্ষুদ্র উপহার।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
নত শিরে বাহাদুর এগুয়ে দাঁড়ায়।
মহাপ্রভু ধান্য দূর্ব্বা করিলেন দান।
নেহারিয়ে সবাকার চমকিত প্রাণ।।"[২৪]

দেশের কথা ও দেশিয় পরিস্থিতির অবস্থার বর্ণনা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর বর্ণনা করেন স্যামুয়েল ন্যাথান সাহেবের কাছে। সেকথা এভাবে ব্যক্ত করেন বিচরণ পাগল—

"দেশের মঙ্গল হেতু বলে দয়া ময়।
সব কথা বুঝিলেন সেই মহোদয়।।
মৃদু ভাসে কহে কথা সে কমিশনার।
বিশ্ববন্ধু আপনি হে বুঝিলাম সার।।
বুঝিয়েছি আপনার মঙ্গল সাধন।
আপনার স্বীয় বাঞ্ছা হউক পুরণ।।"[২৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞাধিন মানুষ কখনোই আইন বিরুদ্ধ কোন কাজ করেন নি। একথা নাথান সাহেব বোঝেন এবং তিনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান সহযোগী হন পরবর্তী কালে। উন্নতির জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের দাবিকে মেনে নিয়েছিলেন সেই তথ্য মনিমোহন বৈরাগী তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি যা বলছেন তা হল—

"ন্যাথান মেনে নিয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের বলিষ্ঠ দাবিকে।
তাইতো ১৯৩১ সাল নাগাদ ঢাকা ডিভিশনে মূলত নমঃশূদ্র
ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে
১০৬৭ টি বিশেষ বিদ্যালয় গড়া সম্ভব হয়েছিল।"[২৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার প্রস্তাব ন্যাথান সাহেব গ্রহণ করে বলেছিলেন তিনি সরকারী ভাবে

সহযোগীতা করবেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মীড সাহেবকে সহযোগী হয়ে কাজ করতে বলেন কমিশনার। তার পরিচয় পাই 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে। সাহেবের কর্ম কথাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন মহানন্দ হালদার—

"সাহেব বলিল ইহা উত্তম প্রস্তাব।
হাই স্কুল হলে যাবে শিক্ষার অভাব।।
চেষ্টা করি মীড তুমি হাই স্কুল করো।
তুমি চেষ্টা করিলে করিতে ইহা পারো।।
আমি বলি স্কুল যদি হয় এই খানে।
সরকারী দান দিব অতি অল্প দিনে।।
ঠাকুরের সহযোগে কর এই কাজ।
স্কুল পেলে উচ্চ হবে পতিত সমাজ।।"[২৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে ন্যাথান সাহেবের উপস্থিতির সময় বৃহৎ ভক্ত সমাজ ছিল তারা সকলেই ছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত। তাদেরকে নিজেই সাহেবকে দেখিয়ে বলেন, এরা সকলেই নমঃজাতির মানুষ। সাহেবের সামনেই স্কুলের প্রস্তাব করার কথা জানান আর সেই সঙ্গে সকলে বলে—

"সবে বলে দিব টাকা আর দিব ছেলে।"[২৮]

এভাবে স্বজাতির উন্নতির পথ সুগম করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুর সৌহাদ্য পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে আপন করে নেন ও সর্ব্বদাই মীড সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতেন জাতির উন্নতির জন্য। মীড মহাশয় জাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদা রত থাকতেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে। মীড জাতির উন্নতির সোপান হিসাবে বলেন পত্রিকা প্রকাশ করতে যাতে জাতির পূর্বপুরুষের কথাও উন্নত চিন্তার কথা সকলের কাছে পৌঁছে যায়। এভাবে পরিচিত হতে হবে সকল মানুষের কাছে। গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে পত্রিকা প্রকাশের কথা জানা যায়—ড. মীড যা বলেন—

"আপনার জাতি পক্ষে যত কথা আছে।
পত্রিকা মুদ্রিত করি দেহ সবা কাছে।।
এই ভাবে এত জাতির হবে পরিচয়।

পত্রিকার দ্বারা কার্য্য বহুবিধ হয়।।

সুসভ্য সমাজ যত আছে পৃথিবীতে।

সংবাদ পত্রিকা লেখে নিজ নিজ মতে।।

অবশ্য পত্রিকা তুমি করহে প্রকাশ।

বহু উপকার হবে কর এ বিশ্বাস।।"[২৯]

জাতিগত বিদ্বেষ যে সভ্যতার উন্নতির প্রধান বিঘ্নতার পরিচয় পাওয়া যায় ড. মীডের উক্তিতে। ভারতে জনগোষ্ঠী যে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্য জনগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা করে সেই ঘৃণ্য মনোভাব থেকেই অপর জাতিটি পতিত অর্থাৎ উন্নত জীবন চর্যার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখার ফলে মানুষের জীবনাদর্শ ব্যবহৃত হয় সেই কথাই ড. মীড বলেছেন। ড. মীডের সেই উক্তিটি হল—

"মীড বলে বড় কর্ত্তা শুন দিয়া মন।

কি জন্য তোমার জাতি পতিত এমন।।

এই দেশে উচ্চবর্ণ হিন্দু যত আছে।

শুন সবে কিবা বলে রাজশক্তি কাছে।।

তোমার জাতির কথা বলে ঘৃণা ভরে।।

সেই লাগি রাজশক্তি চেনে না তোমারে।।

এই জন্য কর এবে পত্রিকা প্রচার।

তাহলে তোমার জাতি পাবে উপকার।।"[৩০]

ড. মীডের কথা মত পত্রিকা প্রকাশ করলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। সে পরিচয় পাই মহানন্দ হাল দারের বর্ণনায়—

"ঘরে ঘরে বন্ধ রূপে যেত পত্রখানি।

তাতে নাম 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' বাখানি।"[৩১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর জমিদারের অত্যাচার থেকেও মুক্তি দেন। ড. মীড গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার, সমাজসেবার কাজে সহায়ক হন। বাংলা ১৩২৬ সালের মহাঝড় হওয়ার পর দেশের দুস্থ ও মানুষের পাশে দাঁড়ান গুরুচাঁদ ঠাকুর। সেই সময় অনেক সমাজসেবী সংগঠন ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজসেবার পরিচয় পাই মহানন্দ

হালদারের 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে। কবির বর্ণনায়—

''গুরুচাঁদ এ সময় দেশের এ দুর্দ্দশায়
গলিলেন করুণায় আপনার মনে!
অন্নহীন দীন গনে ডাকি আনি নিজ স্থানে
অকাতরে অন্ন দেয় প্রতি জনে জনে।।''[৩২]

উনিশ শতকের রাজনীতির যে পরিচয় প্রথম পর্বে পাওয়া যায় সেখানে সাধারণের কোন গুরুত্ব ছিল না অভিজাত বাঙালিরা নিজেদের দাবি দাওয়াকে সরকারের কাছে জানানোর জন্য নিজেরা সংগঠিত হতেন এই সময়। 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে স্বপন বসু উনিশ শতকের রাজনৈতিক দল গঠনের যে পরিচয় দিয়েছেন তা আমার আলোচনার সুবিধার জন্য তুলে ধরলাম। তিনি বলেছেন—

''উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালিরা নিজেদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা গঠন করে সংগঠিত হতে থাকেন। এই সব সভাগুলিতে জনসাধারণের কোন স্থান ছিল না, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীই সেগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন।''[৩৩]

এই উনিশ শতকের দুই মহামানব হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ধর্ম কর্মের সম্মিলন করে মানুষকে উন্নত জীবনাদর্শের সন্ধান দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও এই সময় সভা গঠন করেন। সভার বিষয় হয় জাতির উন্নতি। শিক্ষার আলোচনা, সরকার চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষিত যুবকেরা গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরামর্শে সরকারের কাছে দরখাস্ত করেন ও সকলে সরকারী চাকরি পায়। গুরুচাঁদ চরিতে তার প্রমাণ রয়েছে—

''চাকুরি না হয় কভু দরখাস্ত বিনা।।
সকলে মীডেরে কহে দিয়াছে দরখাস্ত।
.....
নিজ মনোমত কার্য্য পেল সবজন।।''[৩৪]

অসহযোগ আন্দোলন কালে গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে জাতির উন্নতির সাধন করেছিলেন তা থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে মানব দরদি মানুষ। গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন

দূরদর্শি জ্ঞান সম্পন্ন, তাঁর পরিচয় পাই তাঁর কর্ম ধারাগুলির মধ্যে। স্বরাজের পক্ষে ছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। এদেশের স্বাধীনতা যেমন চাইতেন মনে প্রাণে তেমনি চাইতেন মানুষের মুক্তি। অস্পৃশ্যতা থেকে চিরতরে মুক্তি। তিনি বুঝেছিলেন স্বাধীনতা মানে সমগ্র মানুষের স্বাধীনতা। মুষ্টিমেয় মানুষের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বাধীনতার যে মূল্য তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সহমত পোষণ করতে পারেন নি। কেননা ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য মানুষের আগে ঘৃণা মুক্ত না হলে স্বাধীনতা হবে কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর এই অসহযোগে যোগদানের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পত্র দেন ও তাঁকে আহ্বান করেন তিনি যেন সকল ভক্ত মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে সামিল হন। এই সময় গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর বক্তব্যকে জানান বিস্তারিত ভাবে। আলোচনার মাধ্যমে দেখব তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য। 'খুলনা কনফারেন্স' সভার মাঝে গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভাবাদর্শের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তাতে যেমন ছিল সমাজ বাস্তবতা তেমনি ছিল সামাজিক অবস্থানের পরিচয়। আগে মানুষের উন্নতি প্রয়োজন তারপর ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন সভায়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুত্র শশীভূষণ ঠাকুর 'দেশ' বলতে কি বোঝায় তাই বলেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক মতুয়াভক্ত সকলকে। সকলের মঙ্গল সাধনে তৎপর ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই পিতা হিসাবে মান্য করতেন সকলেই গুরুচাঁদ ঠাকুরকে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রয়াণের পর। অম্বিকাচরণের স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যে দলের সভা হয় ঘৃতকান্দিতে সেখানে অনেক মতুয়া ভক্ত বক্তৃতা শোনেন। ভক্ত সকলে বক্তৃতা শোনার পর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবেন বলে ঠিক করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে। সকলে মিলিত হয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসেন। ঠাকুরের কাছে সকলকে পাঠান দেশ সম্পর্কে জানার জন্য। শশীভূষণ ঠাকুর দেশ সম্পর্কে জ্ঞাত করান ও দেশ জাতির সত্যিকারের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। আচার্য মহানন্দ হালদার তার শ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—

''বড় শক্তিশালী বক্তা অম্বিকাচরণ।

বক্তৃতার গুণে করে হৃদয় হরণ।।

.....

বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে নমঃশূদ্রগণ।

স্বদেশী দলেতে যেতে করিল মনন।।

.....

এ জাতির পিতা তিনি মান্য সবাকার।

একবার অনুমতি লইব তাহার।।

বিশেষ তাঁহার পুত্র শ্রীশশীভূষণ।

এই দেশ মধ্যে তিনি বিদ্যাতে প্রধান।।

তাঁহার মন্ত্রণা মোরা অবশ্য শুনিব।

আজ্ঞা যদি পাই সবে স্বদেশী সাজিব।''[৩৫]

শশীভূষণ ঠাকুর সকলের উদ্দেশ্যে 'দেশ' কথাটির প্রকৃত সত্য জানান এভাবে—

''দেশ নহে মাটি মাত্র 'দেশ' দেশ বাসী।

নরনারী যত সব এক সাথে মিশি।।

নরনারী যদি কভু দুঃখ পেয়ে কান্দে।

'দেশ' কান্দে বলে সবে অতি নিরানন্দে।।

.....

.....

দেশ নহে শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজ।

সেই কথা সবাকারে বুঝাইব আজ।

অশিক্ষিত যারা দেশে তাহারা সংখ্যায়।

শিক্ষিত হইতে বেশি জানিও নিশ্চয়।।

ইহাদের পানে কেহ কভু এত দিন।

চাহে নাই দেখে নাই মনে ভেবে হীন।।

.....

প্রকৃত দেশের প্রাণ বহু দূরে রয়।।''[৩৬]

জাতির উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন সেই সকল কথা বলেন এভাবে—

"ধন মান বিদ্যা শিক্ষা সব কিছু লাগে।।
আমরা কৃষক সবে কৃষি কার্য্য করি।
সম্পদের মধ্যে মোরা ভূমি মাত্র ধরি।।
বিলাস ব্যসন মোরা কিছু নাহি চিনি।
কায়ক্লেশে মাটি চিরে ধান্য শস্য আনি।।
' দেশের পরান' বলি যদি কিছু রয়।
কৃষক দেশের প্রাণ জানিবে নিশ্চয়।।"[৩৭]

কেবলমাত্র আন্দোলনে যোগ দিলেই হবে না তার মমার্থ বুঝে কাজ করতে হবে। একথা শশীভূষণ ঠাকুর সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে এও বলেছেন এদের আত্মজাগরণ তখনই সম্ভব যখন 'দেশমাতা'কে প্রকৃত সত্যের সঙ্গে জানবে বুঝতে পারবেন। তাই তিনি হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতকে সকলের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"আগে বিদ্যা আন ঘরে আন ধন মান।
আচরণে সৎ হও ডাক ভগবান।।
একর্ম্ম করিলে তবে এ জাতি জাগিবে।
'দেশ মাতা' বলে কারে তখন চিনিবে।।"[৩৮]

সকলকে এভাবে শিক্ষা, ব্যবসা, কৃষিকর্ম সব সময় উন্নত চিন্তার মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে বড় হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের অন্ন চিন্তার বা রোজগারের উপায় না থাকায় গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের বিরত করেন তেমনি জাতির প্রকৃত উন্নতি ঘটতে পারে সমপ্রাণে বসবাস করায় হীন ভাবে ঘৃণা ভরে নয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর 'খুলনা কনফারেন্স'র সভায় স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় তিনি কতটা দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। স্বাধীনতা যে কত বড় মহামূল্যবান জিনিস সে উপলব্ধি গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছিল। স্বাধীনতা মানে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলের ঐক্যতা। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে একটি মাত্র ব্যক্তি নন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল ভক্তগণ নিয়েই তার পরিবার। তাই তিনি একাই কোন কাজ করতে পারেন নি সকলকে রেখে। তিনি কোন কাজ করতে গেলে আগে তার সমাজের কথা ভেবেছেন। কেননা তিনি যে পথে চলবেন সেই পথেই চলবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত পরিবার।

তাই তিনি বিচার বিবেচনা করেই কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনাগুলির পরিচয় নেব পর্যায়ক্রমে—

"স্বাধীনতা কথা ভাল নে'য়া ভাল দে'য়া ভাল
ভাল তাতে নাহিক সন্দেহ।।"[৩৯]

এই দেশ সেবা দেশ প্রীতির প্রতি অনুরক্ত হয়েও নিজে সক্রিয় ভাবে নিজের কাজ ত্যাগ করে যোগ দিতে পারেন নি। সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় ধরা পড়েছে—

"দেশ প্রীতি দেশ সেবা কভু ঘৃণা করে কেবা?
তারতম্য রয়েছে বিধানে।।
স্বাধীনতা যদি আসে তা হতে কি শ্রেষ্ঠ আছে?
বুঝি না যে এত অন্ধ নই।
তবে যে নামিনা পথে, বহু বাধা আছে তাতে
এড়াইতে পারি বাধা কই?"[৪০]

তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজেই উদ্দ্যোগী হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নতির প্রচেষ্টার কথা বলেন। তিনি বলেন—

"জাতির উন্নতি লাগি হও সবে স্বার্থত্যাগী
দিবা রাত্রি চিন্তা কর তাই।
জাতি ধর্ম্ম, জাতি মান জাতি মোর ভগবান
জাতি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই।।
কিবা বিদ্যা কিবা ধনে কিবা শিল্পে কি বিজ্ঞানে
রাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে রাজ কাজে।
সবখানে থাকা চাই তা ভিন্ন উপায় নাই
রাজ বেশে সাজ রাজ সাজে।।
নর নারী দুই জনে প্রতি কার্য্যে প্রতিক্ষণে
তালে তালে হও অগ্রসর।
অলসতা দেও ছেড়ে বল সবে বজ্র স্বরে
'আগে চল নাহি অবসর'।।"[৪১]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রখর বাস্তব জ্ঞানের ও দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়েছিলেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতা ব্যক্তিগণ। আর তাঁরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমর্থন পেলে তার অগণিত মানুষ আন্দোলনে যোগদান করলে তাড়াতাড়ি দেশের মঙ্গল স্বাধীনতা হতে পারে। গুরুচাঁদ ঠাকুরকে স্বদেশী আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাদ্যায়। তার উত্তরে ঠাকুর, বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে বলেন সকলকে সমান মর্যাদা দিলে তবেই, এই আন্দোলনে তিনি যাবেন। মানুষে মানুষের যে বৈষম্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তৎকালীন সমাজে ছিল জমিদারের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার প্রাবল্য। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর সকলকে আগে আত্ম উন্নতির কথা বলেছেন ও তিনি সক্রিয়ভাবে স্বজাতির উন্নতির কাজ করেছেন। এই কর্মময় জীবনের মাঝে আসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন। সেই সময় স্বদেশী হতে ইচ্ছুক হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণকে আন্দোলন থেকে বিরত হতে বলেছেন এই সকল কারণে—

"ওরা যাহা বলে আমি সব তাহা বুঝি।
তথাপি ওদের কার্য্যে নাহি হব রাজি।।

.....

এরা যবে ধনী হবে মানি হবে সবে।
দেশ চিনে দেশ সেবা তখনি করিবে।।

.....

কত অত্যাচার করে জমিদার গণ।
কেহ কি তাহাতে বাধা দিয়াছে কখন?
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ।
কেহ কি করেছে তার হৃদয় প্রশস্ত।।

.....

এই হীন দৃষ্টি দেশে কভু চলিবে না।"[৪২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বলেছেন যে আজ যারা পতিত অস্পৃশ্য বলে সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র তারাও জাগবেন ও সকল মানব জাতির সঙ্গে ভাই বলে সম্মান পাবেন। এই আশার বার্তা দান করেছেন ভক্তগণকে। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমে

অস্পৃশ্য বলে কথিত সকলকে ধর্মদান করে স্বাধীনভাবে ধর্ম জীবন পালন করে আত্ম উন্নতির পথ নির্দেশ করেন। আর সেই সকল মানুষই গুরুচাঁদ ঠাকুরেরও প্রিয়জন। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর কখনোই পিতার ভক্তগণকে তাদের কর্ম উন্নতি ছাড়া অন্য পথে যেতে বারণ করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবনাই তাদের জানিয়ে বলেছেন—

"আজ যারা পদ তলে কাঁদিছে পড়িয়া।
হরিচাঁদ পরশেতে উঠিল জাগিয়া।।
অব্যর্থ অমোঘ শক্তি দিয়াছেন তিনি।
জাগিবে জগতে যত পতিত পরাণী।।
সেদিন নাহিক দূরে বছর পঞ্চাশে।
ভাই ভাই হয়ে সবে রহিবে এদেশে।।"[৪৩]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুচাঁদ ঠাকুরকে পত্র দেন নমঃশূদ্র জাতিকে স্বদেশীতে যোগদানের জন্য। গুরুচাঁদ ঠাকুর সকলকে চুপ করে থাকতে বলেন চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত। সকলের উদ্দেশ্যে বলেন—

"অপেক্ষা করিয়া রহ সবে এইক্ষণ।
আত্মোন্নতি করি সবে মিলি সর্ব্বজন।।
স্বদেশীর মূল গুরু ব্যানার্জ্জী সুরেন্দ্র।
চারিদিকে ঘুরে সবে তারে করি কেন্দ্র।।
অম্বিকাচরণে জানি শিষ্য বলি তার।
.....
সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি পত্র দিয়াছেন মোরে।
স্বদেশীতে নমঃশূদ্র মাতাবার তরে।।
ইহার উত্তর আমি দিয়াছি তখন।
আমি বলিয়াছি লেখে শ্রীশশিভূষণ।"[৪৪]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন তাদের প্রতি উচ্চ বর্ণ মানুষের মনোভাব কীরকম। তারা কখনোই অনুন্নত মানুষদের ভাই বলে সম্মানিত করেন না। গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজ বাস্তবতাকে চিঠিতে তুলে ধরেছেন তাঁর কাছে। তিনি যা বলেছিলেন সেই বক্তব্য

হল—

"নিপীড়িত জাতি যত আছে বঙ্গদেশে।
চিরদিন কাটে দিন দরিদ্রের বেশে।।
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে অর্থ ক্ষেত্রে অধিকার নাই।
সব অধিকার নিছে উচ্চবর্ণ ভাই।।
কোন কালে এতদিন উচ্চবর্ণ সবে।
অনুন্নত জনে নাহি দেখে ভ্রাতৃভাবে।।
.....
যদি উচ্চবর্ণ আজি তাহাদের চায়।
এই পথে আছে মাত্র একটি উপায়।।
সরল উদার ভাবে ভাই বলি বুকে।
টানিতে হইবে মনে নহে মুখে মুখে।।
সম্পদ বিপদে সুখ সমভাবে বাঁটি।
ভাই হয়ে ভাই বলে দিতে হবে খাঁটি।।
এই কার্য্য আমি দেখি আগে প্রয়োজন।
নচেৎ হইবে সব ব্যর্থ আন্দোলন।।"[৪৫]

এই পত্র পাওয়ার পর পুনরায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্র দিয়ে জানান যে তিনি ওড়াকান্দিতে আসবেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ভবিষ্যতে ঘটনা এই বলে ভক্ত সকলকে বলেন। আর তিনি সকল ভক্তগণকে যা বলেছেন সেই একতার মহামন্ত্রটি হল—

"দীন দুঃখী যত ভাই আছ এক দেশে।
এক ভাবে চল ফেরো থাক একবেশে।।
জয় যদি হয় কিছু হউক সবার।
পরাজয় হলে ভাগ সবে নিব তার।।
.....
এক করিবারে সবে হরিচাঁদ এল।
তাঁরে ভুলে গেলে কিন্তু সকলি বিফল।।

আমাদের ভাই বন্ধু আর কেহ নাই।

ভাই ভাই সব ভাই হরে এক ঠাঁই।।

.....

.....

এক মনে এক প্রাণে চল এক সাথে।

নিশ্চয় জাগিবে জাতি ভুল নাহি তাতে।।''[৪৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি ধর্মবীর ছিলেন। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমগ্র জীবন ভাবনার মূল কথা ছিল সার্বিক কল্যাণ, সার্বিক উন্নতি। তিনি সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ কল্যাণ করতেন এবং স্বজাতির উন্নতি বিধান করেন ইংরেজ সরকারের সাহায্যে। এছাড়া তিনি যে সর্ব বিষয়ে সর্ব সময় পাশে পেয়েছেন ড. মীড সাহেবকে। তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের মানুষ। খ্রীষ্টান মিশানারীর ধর্ম প্রচারক। তিনি ওড়াকান্দিতে বাস করতেন ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে সব সময় মানুষের কল্যাণে সহযোগীতা করতেন। ড. মীডের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকার ফলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ইংরেজ কমিশনার, ম্যাজিট্রেট, লাট সাহেব সকলের কাছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিচিতি ছিল ধর্মগুরু বড় কর্ত্তা হিসাবে। এবং সকলের মিলিত ভ্রাতৃত্বে জাতির অনেক সাহায্য করেছিলেন। এমনকি দেশীয় মানুষের সঙ্গেও তার মতনৈক্য ঘটলেও তিনি সর্বদাই ধর্ম নীতির সহায়তায় চলতেন। তার নিন্দুকের প্রতি প্রতিহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না তার পরিচয় পাই বিচরণ পাগলের 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে। বিচরণ পাগলের বর্ণনায় গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা নীতির যে আদর্শ পাই তা অতি মূল্যবান সর্ব্বাবস্থায় সর্বকালের মানুষের জন্য। সেই শিক্ষাদর্শকে তুলে ধরলাম। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে শিক্ষা ভক্তগণকে দিয়েছেন কবির বর্ণনায় তা হল—

''যদি কেহ করে নিন্দা নাই প্রতিদান।

নিন্দুকেরে ভালবেসো বন্ধুর সমান।।

নিন্দাকে সাবান করি ধৌত কর মন।

আত্মা শুদ্ধি হবে তবে যেন বাছাধন।।

.....

.....

পিতার সম্পদ রক্ষা কর প্রাণ পণে।

না করিও লোভ কভু অপরের ধনে।।

জ্ঞানিন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনিন্দ্রিয় যত।

সযতনে সবাকারে রেখ বশিভূত।।

না মানিও লোক নিন্দা কর্তব্য পালনে।

আপন কর্তব্য কর পরম যতনে।।

অপরের ছিদ্র নাহি কর অন্বেষণ।

পবিত্র রাখিও সদা দেহ তনু মন।।

তা হইলে আর কভু রবে না ভাবনা।

এক কালে দূরে যাবে ত্রিতাপ যাতনা।।"[৪৭]

সংসার জীবনাদর্শ পালন ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সেই আদর্শ শিক্ষাই দিয়েছেন ভক্তগণকে—

"পুত্র কন্যা সযতনে করিও পালন।

সর্বদা করিও সৎ কথা আলাপন।।

হরি কথা বিনে না বলিও অন্য কথা।

অকারণে কারো প্রাণে নাহি দিও ব্যথা।।

পবিত্র স্বভাবী হয়ে কর হরিনাম।

হরিনাম সংকীর্ত্তনে পাইবে আরাম।।

সত্য ভাষী হয়ে কর জীবন যাপন।

তাহলে সফল হবে মানব জীবন।।"[৪৮]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নিত্য ভাবনা ছিল স্বজাতির উন্নতি বিধান করা। তিনিও এই দরিদ্র মানুষের মধ্যে জন্মেছেন তাই সকলের দুঃখের কথা তিনি ভালোভাবেই জানেন। বিচরণ পাগলের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্ম প্রণালীর পরিচয়—

"দরিদ্র জাতির মাঝে জনম নিয়েছি।

ভালোভাবে সবাকার দুর্দশা জেনেছি।।

.....

.....

.....

কিভাবে করিব এই জাতির কল্যাণ।”[৪৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্ম ভাবনার মাধ্যমে মনের সংস্কার করেন মানুষের। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই মনের সংস্কারকারী মানুষগুলিকে, কর্ম সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের জীবন উন্নত করেন।

১৯১৯ সালের ১লা আগস্ট শুরু হয় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। দেশীয় জিনিস ব্যবহার করতে হবে আর বিদেশী জিনিস বর্জন করতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে বিশ্বাসী ভক্ত মানুষেরা কখনোই গুরুচাঁদের নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। তাই তারা অসহযোগ আন্দোলনেও সামিল হন নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীবীরেন্দ্র শাসমল, অম্বিকাচরণ, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন কেন গুরুচাঁদ ঠাকুর ভক্তগণসহ তাদের আহ্বানে সাড়া দেন নি। আন্দোলনে যোগদান করেননি। মাহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করে চিঠি দেন ও আন্দোলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কবি মহানন্দ হালদার সেই চিঠির বর্ণনা করেছেন এভাবে—

“আপনার গুণকীর্ত্তি বহু শুনিয়াছি।

আপনার গুণ সঙ্গে পরিচিত আছি।।

.....

আলোচনা করিয়াছি গান্ধিজীর সনে।

.....

আপনাকে লিখিতেছি সেই সব ধারা।।

পরাধীন এ ভারতে সবে সহি দুঃখ।

স্বাধীনতা বিনা কভু নাহি হবে সুখ।।

পরাধীন যতেক জাতি আছে ভূমণ্ডলে।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনে জনে, উন্নত সকলে।।

স্বাধীন হইলে দেশ দুঃখ নাহি রবে।

স্বাধীন ভারতে সবে মহাসুখী হবে।।

অসহযোগের পথে আসিবে সুদিন।

দূরে নহে নিকটেতে সেই শুভদিন।।

অনুন্নত জাতি মধ্যে আপনি প্রবীণ।

শ্রেষ্ঠ নেতা বলি মান্য আছে চিরদিন।।

স্বাধীনতা যজ্ঞে তাই করি আমন্ত্রণ।

জাতি নিয়ে এই পথে আসুন এখন।''[৫০]

পত্র পাওয়ার পর গুরুচাঁদ ঠাকুর তার সামাজিক অবস্থান, সম্পর্কে বাস্তব সত্যের জ্ঞানের সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তিনি আন্দোলনে যাওয়ার বাধা যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি ভাবে তাদের আন্দোলনের বিষয় বস্তুর সঙ্গে মিল ছিল না, সেই দিক আলোচনা করেছেন সেই সঙ্গে অনুন্নত মানুষের সামাজিক বৈষম্য কেমন তাও তুলে ধরেছেন। আর সব শেষে তিনি তাঁর অনুন্নত সমাজকে আন্দোলনে যোগদানের জন্য গ্রহণ করতে হলে ভ্রাতৃভাবের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হলে তবেই অগ্রসর হবেন। আর ভারতবর্ষ যে পল্লীর দেশ তার সঠিক ব্যাখ্যা দেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে। সেই পত্রটিকে উল্লেখ করলাম—

''প্রভু কয় 'মহাশয়! করি নিবেদন

পত্র যোগে পাইয়াছি তব আমন্ত্রণ।।

আমন্ত্রণ পেলে বটে মান্য দিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়।।

বহু জীবনের ভার যাবে দেছে বিধি।

অকস্মাৎ কার্য্য তার বড়ই অবিধি।।''[৫১]

তিনি তাঁর সমাজের মানুষের সামাজিক বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতিতে অনুন্নত মানুষদের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশকে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতকে মহাত্মা গান্ধীকে জানাতে বলেন। কবি মহানন্দ হালদারের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

''অবস্থা সকল আমি বলিব খুলিয়া।

দোষ গুণ বলিবেন বিচার করিয়া।।

অনুন্নত বলি যত আছে বঙ্গদেশে।

কোন ভাবে দিন কাটে বেহালের বেশে।।

বিলাসিতা বলি তারা কিছু নাহি জানে।

কোনক্রমে কায় ক্লেশে বাঁচিছে পরাণে।।

বিদ্যা শিক্ষা বেশী কিছু তারা শিখে নাই।

রাজ কার্য্যে অধিকার তাতে নাহি পাই।।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কভু নাহি ছোটে।

স্বাধীনতা কি পদার্থ বোঝেনাক মোটে।।

রাজনীতি সঙ্গে যার যোগাযোগ নাই।

অসহযোগের প্রশ্ন তার কিবা ভাই?''[৫২]

প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য চাই সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজের মানুষের কোন ভেদ জ্ঞান থাকবে না থাকবে মানব প্রেম। প্রকৃত স্বাধীনতা হল নিজেদের মধ্যে সমস্ত রকম বিভেদ দূরীকরণ করা তবে তো দেশে শান্তির হাওয়া বইবে। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজের দূর্বলতাকে দূর করে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা স্বাধীনতা আনার পক্ষ পাতি ছিলেন। তিনি বলেছেন—

''সত্য কথা দেশবন্ধু! করি নিবেদন।

.....

সমাজের অঙ্গে আছে যত দূর্ব্বলতা।

আগে তাহা দূর করা আবশ্যক কথা।।

.....

.....

আর এক মহা দুঃখ ইহাদের মনে।

উচ্চ হিন্দু ইহাদিগে 'অস্পৃশ্য' বাখানে।

কি কব দুঃখের কথা তোমার গোচরে।

দেবতারে ভাগ হিন্দু করেছে মন্দিরে।।

অস্পৃশ্য বলিয়া যারা পাইয়াছে আখ্যা।

মন্দিরে ঢুকিলে তার নাহি থাকে রক্ষা।''[৫৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুর চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন—

"মাতৃ পূজা বেদী তলে সকলে মিশিবে।
যারে দিলে দূরে করে সে কিসে আসিবে?
রাজা করে রাজ সূয় যজ্ঞ আয়োজন।
কাঙ্গালের স্থান সেথা মিলে না কখন।।
রাজা থাকে সিংহাসনে দীন থাকে দূরে।
কোলাকুলি মেশামিলি হবে কি প্রকারে?"[৫৪]

গুরুচাঁদ ঠাকুর চাইতেন প্রকৃত স্বাধীনতা সকলে সমভাবে ভোগ করুক। সমভাবে অসহযোগ আন্দোলনে চলার পক্ষে ছিলেন তিনি। তাই তো সামাজিক অশিক্ষার মুক্তি, অস্পৃশ্যতা মহাপাপ, সেই জ্ঞানালোকের দ্বারা সকলে আলোকিত হলে গড়ে উঠবে সোনার ভারত। তাই তিনি চিঠিতে সেই সম্মিলিত হওয়ার জন্য অনুন্নত জাতির উন্নতি কামনা করেছেন তাঁর কাছে। মহানন্দ হালদার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"এক পথে সকলেরে নিতে যদি মন।
আমার এ বাক্যগুলি করুণ গ্রহণ।।
.....
.....
প্রকৃত দরদ যদি জেগে থাকে মনে।
কূলেতে উঠান সবে হাতে ধরে টেনে।।
'অস্পৃশ্যতা মহাপাপ' করুণ রটনা।
প্রকৃত দরদ দিয়ে জাগান চেতনা।।
শিক্ষা, দীক্ষা অর্থ কিংবা সম্মানাদি দানে।
অনুন্নত জনে দিন সরল পরানে।।
সকলে সরল এরা কুটিলতা নাই।
খাঁটি প্রাণে ইহাদিগে ভাই বলা চাই।।
ভাবিয়া দেখুন মনে দুই কোটী লোক।
.....
.....

মহাত্মা গান্ধীকে তাই জানাই বারতা।

ভাবিয়া দেখেন যেন তিনি মোর কথা।।"[৫৫]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে গুরুচাঁদ ঠাকুর ভারতের প্রাণকেন্দ্রে যেতে নির্দেশ দেন। কারণ পল্লীনির্ভর দেশ এই আমাদের ভারতবর্ষ। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোকের বাসই হল পল্লীগ্রামে। কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি সমাজের বেশিরভাগ মানুষের বসবাসই এই পল্লীগ্রামে। তাই তো অসহযোগ আন্দোলনের সময় পল্লীপ্রাণ কল্যাণকামী গুরুচাঁদ ঠাকুর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রামে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কবি মহানন্দ হালদার এভাবে বর্ণনা করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের মহামূল্যবান ভাবনাকে—

"ভারত পল্লীর দেশ পল্লীতে পরাণ।

শহর ছাড়িয়া সবে পল্লী গ্রামে যান।

পল্লী যদি জাগে তবে জাগিবে ভারত।

অবশ্য সুগম হবে স্বাধীনতা পথ।।"[৫৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের পত্র পাওয়ার পর ওড়াকান্দিতে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন মহাত্মাগান্ধী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা না হলেও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পত্র যোগে যোগাযোগ ছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের। দেশের সামাজিক উন্নতিই ছিল সারাজীবন ধরে কর্মের মূল উদ্দেশ্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের আজকের স্বাধীন ভারতের কৃষকের প্রাণের কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন বহু পূর্বে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, চতুর্থ প্রকাশ, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩৩ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ২৪-২৫।

২. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১১১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

৬. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ৫৫-৫৬।

৭. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৯।

৮. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মে, ১৩৩৬।

৯. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৮।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৫. বৈরাগী, মনিমোহন, অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা, তৃতীয় প্রকাশ, ষাঁড়া গড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩ই মার্চ, ২০১৪, পৃ. ১০২-১০৩।

১৬. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২০. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ২০০০, পৃ. ১৭৯।

২১. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭।

২২. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা, প্রকাশক, আমতলী, বরিশাল, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৬. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাঁড়া গড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ই মার্চ, রবিবার, ২০১২, পৃ. ১৩৫।

২৭. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২২৭।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫।

৩৩. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ২০০০, পৃ. ১৯৩।

৩৪. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৩০-২৩১।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৪৭. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

৫০. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। ঊনবিংশ শতকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় মুষ্টিমেয় বাঙালি মানসে। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজ জীবনে যত কিছু মতনৈক্য, পরস্পর বিরোধী মনোভাব, বিদ্বেষ জাতিভেদ প্রথার তীব্র মনোভাব দেখা দিয়েছিল তার সবটাই ধর্মীয় ভাবধারাকে কেন্দ্র করে। এই সময়ে জমিদারও তাদের প্রতিনিধিদের যে অসহনীয় অত্যাচার কেমন নির্মম আকার ধারণ করেছিল সমাজের সাধারণ প্রজাবর্গের উপর তার অনুসন্ধান করব ঊনবিংশ শতকের নবসাহিত্য ধারা মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্য মূল্যায়ণের এই অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করব সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য। এই ধর্ম সাহিত্যেগুলির মধ্যে মানুষের বাস্তব জীবন কথা কেমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের ভাষা, রচনারীতি, হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর পরিচয়ের সন্ধান করব। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে কীভাবে ধর্মকর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছেন ও গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কীভাবে মানুষের অগ্রগতির চিরকল্যাণময় কর্মের পথিক হয়ে কর্মভার বহন করেছেন। ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত সেই সময়কার পরিবেশ পরিস্থির পরিচয় যেমন তাঁদের জীবনীমূলক ধর্ম সাহিত্যে ধরা পড়েছে তেমনি সাহিত্যের নানা দিক ব্যক্ত হয়েছে এই সাহিত্যগুলির মধ্যে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্ম জীবন ও ধর্ম জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় যে জীবনী সাহিত্য রচনা হয়েছে তাঁর সাহিত্য মূল্য অনুসন্ধান করব মূল আকর গ্রন্থগুলি থেকে। মূল আকর গ্রন্থগুলি হল—

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'—কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার।

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত'—আচার্য মহানন্দ হালদার।

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য'—বিচরণ পাগল।

'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন'—কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার।

'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত'—অশ্বিনীকুমার সরকার।

'শ্রীশ্রীগোপালচাঁদ লীলাসঙ্গীত'—সূর্য্য গোঁসাই।

'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা'—বিচরণ পাগল।

'হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত'—ড. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এছড়াও রয়েছে অগণিত মতুয়া সাহিত্য সম্ভার। আমার গবেষণা কাজের জন্য উপরি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে গ্রহণ করলাম সাহিত্য মূল্য নির্ধারণের জন্য। কেননা এই গ্রন্থগুলিই মূল আকর গ্রন্থ। আরো মতুয়া গ্রন্থগুলিকে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছি সেগুলি পরে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে রাখছি। সহায়ক গ্রন্থগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে লিখছি। বাংলার উনিশ শতকের সামাজিক ধর্মীয় প্রেক্ষাপট জানার জন্য যে গ্রন্থগুলিকে গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি সেগুলি। আর মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মূল আকর গ্রন্থগুলি ছাড়াও আরো অনেকগুলি গ্রন্থকে সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার ব্যবহার করেছি সেগুলিকেও সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় রাখব।

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির সাহিত্য মূল্যায়ন করতে হলে মতুয়া উপাধিতে আখ্যায়িত কাহিনিটির কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে মতুয়া উপাধিটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া'

.....

সবে করে উপহাস ওই বেটা মতো।।

তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।

ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।।''[১]

হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া' ধর্ম প্রচার করেছেন সকলে একথা জানেন। এই আখ্যাটি সমাজের মানুষের দেওয়া। হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামে মত্ত হওয়া মানুষদের আপন করে নিলেন ও মতুয়া আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়া মানুষদের সঙ্গে ভিন্ন সম্প্রদায় হয়ে গেলেন। মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য আলোচনার আগে হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতকের অনেক গ্রন্থ থেকে। 'ভারতের সাধক-সাধিকা' গ্রন্থে সুবোধ চক্রবর্তী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট ও তাঁর ধর্ম ভাবনা আলোচনা করেছেন। সুবোধ চক্রবর্তীর ভাষায় হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব প্রেক্ষাপটটি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

''ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ। ভারতের বুকে ঈশ্বরের নামে,

ধর্মের নামে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ধর্ম্মোন্মাদের দম্ভ ও আস্ফালন। অপরিসীম ঘৃণা ও অবহেলা মানুষে মানুষে রচনা করেছে বিভেদ ও বিসংবাদ। ধর্ম আবদ্ধ হয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের অতি যত্নে রচিত বিগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানে। মানবতা নীতি ও মূল্যবোধ দলিত মথিত।

ব্রাহ্মণবাদের ব্যবচ্ছেদে সমাজে রচিত হয়েছে জাতিভেদের চূড়ান্ত ঘৃণ্য ব্যবস্থা। ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ ও শিক্ষার আলোকে আলোক প্রাপ্ত তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সঞ্চারিত হয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দলিত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ মানুষের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে দেবভূমি ভারতের আকাশ বাতাস।''[২]

সমাজের এহেন বাস্তব পরিস্থিতিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের পদার্পন ঘটে। তিনি সমাজের বাস্তব রূপকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই সমাজের মানুষের উপেক্ষার পাত্র হয়েও মানুষের উন্নতি কর্ম থেকে বিরত হন নি। কর্মন্নোতিই তাঁর সাধনা মানুষই তাঁর ধর্মস্থল কর্মস্থল। মানুষকেই তিনি ভালোবেসেছেন সারাজীবন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সূক্ষ্ম 'সনাতন ধর্মকে মতুয়া আখ্যায় ভূষিত হওয়ার ইতিহাসকে সুবোধ চক্রবর্তী এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''হরিচাঁদের কীর্ত্তনেরও এক অলৌকিক রূপ হরিবল ধ্বনির সঙ্গে চলে উদ্দণ্ড নৃত্য। সেই সঙ্গে গগনভেদী রবে বাজে মৃদঙ্গ করতাল আর জয়ডঙ্কা। উল্লম্ফন হুহুঙ্কার আর হরিবোল ধ্বনির মিশ্র ব্যঞ্জনায় ভক্তগণের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় অপূর্ব ভাবাবেশ। দিনে দিনে এই নামকীর্ত্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

হরিবোল নামে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে দলে দলে মানুষ। সে যেন নাম গানের এক নেশা। সেই নেশায় মাতিয়ে তুলেছেন তাদের ভক্তি ও সাধনার মূর্ত বিগ্রহ নাম প্রেমী হরিচাঁদ।''[৩]

সুবোধ চক্রবর্তী হরিচাঁদ ঠাকুরের 'মতুয়া' আখ্যার ইতিহাস যেমন আলোচনা করেছেন সেই সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের জাতিগত পরিচয়ও দিয়েছেন। আর 'হরিনাম' ভাবনা যে মানুষের জাত্যাভিমান বর্জন করতে সক্ষম; হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম ভাবনা বর্ণনায় তিনি মানুষের মূল্যবোধের পরিচয়ও দিয়েছেন যা শ্রীশ্রীলীলামৃত সহ মতুয়া গ্রন্থে অনেক ভক্তদের পরিচয়ে ব্যক্ত হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনা মানুষের আত্মসংস্কারের দ্বার উন্মক্ত করে এই মহাসত্যকে ব্যক্ত করেছে। সুবোধ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> ''অন্তজঃ শ্রেণীর মানুষ হরিচাঁদ। এরা সমাজের অবহেলিত, অবজ্ঞাত শিক্ষাহীন এক সম্প্রদায়। উচ্চবর্ণের সমাজপতি ও ধর্ম ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের ভাষায় নমঃশূদ্র। হরিচাঁদের অশেষ কৃপায় হরিভক্তি আর হরিনামের আস্বাদন পেয়ে নমঃশূদ্র সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হল। সমাজপতিরা হরিনাম নিয়ে প্রকাশ্যে ডঙ্কা পিটিয়ে মাতোয়ারা হওয়ার ব্যাপারটিকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করেই নাম দিল হরিবোলা মতুয়া দল। ক্রমে সেই নামেই পরিচিত হয়ে উঠল হরিচাঁদের ভক্ত সম্প্রদায়। দিনে দিনে হরিচাঁদ হয়ে উঠলেন এই নমঃশূদ্রের ঠাকুর। হরিভক্তি পরায়ণ জাত্যাভিমানবর্জিত বর্ণশ্রেষ্ঠ কোন কোন ব্রাহ্মণও নামের আকর্ষণে তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে জীবন ধন্য করল। স্বজন ও সমাজের কটাক্ষ নিন্দা উপেক্ষা করে মিশে গেল তারা হরিনাম পাগল মতুয়াদের দলে।''[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ধর্মজগতের উচ্চস্তরে উন্নীত করেছেন। সেকথা হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মধারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনার মূল ভিত্তি হল সমাজ বাস্তবতার সর্ব্বময় উপস্থিতিতে। 'হরিনাম' করার সময় নির্ধারণ করেছেন এভাবে 'হাতে কাম মুখে নাম'। হাতের দ্বারা কর্মকে সম্পন্ন করার সঙ্গে সমভাবে হৃদয়ে অনবরত ভাবে হরিনাম ভাবনাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। তবেই একসঙ্গে ধর্মরক্ষা হবে 'হরিনাম' গানে আর বাস্তবের সমাজের কাজ সম্পন্ন হবে হাতের দ্বারা। এভাবে মানুষকে ধর্ম ও কর্ম ভাবনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। শ্রীনাভাজী তাঁর 'বৃহৎ শ্রীশ্রীভক্তমাল' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের

ধর্মাদর্শের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন যথার্থ ভাবে। শ্রীনাভাজী হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর মূল্যায়নে যা বলেছেন তা হল—"সমাজের উপেক্ষিত ও নির্যাতীত মানুষকে সকল রকম নীচতা থেকে ধর্ম জগতের উচ্চমার্গে উন্নীত করার জন্য তার অবদান তুলনারহিত।"[৫] ধর্মভাবনার কর্মভাবনার বিকাশের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কর্মভার অর্পণ করেছিলেন সেই তথ্যও শ্রীনাভাজী জানাচ্ছেন তাঁর গ্রন্থে এভাবে—"তিনি তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মতুয়া সম্প্রদায়ের পরবর্তী গুরুরূপে নির্বাচিত করে যান।"[৬] হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ও ভক্তগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলায় সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছে তার সাহিত্য মূল্য নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করব। পর্যায়গুলি হল—

সাহিত্য রচনারীতি, ভাষার পরিচয়।

ধর্ম সমন্বয়ী ভাবধারা ও মতুয়া ধর্মের গানের আলোচনা।

মতুয়াভক্তদের সামাজিক জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা।

মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

মানুষের দুঃখের কারণ ও দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা।

সাহিত্য মূল্য আলোচনার পূর্বে মতুয়া ধর্ম সাহিত্য রচয়িতাগণের সময়কাল ও হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সময় অর্থাৎ কর্ম জীবনের সময়কালকে জ্ঞাত হই।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২ - ১৮৭৮) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬ - ১৯৩৭) 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা তারকচন্দ্র সরকার (১৮৫৩-১৯১৪) 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন' রচয়িতা। 'শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত' রচয়িতা অশ্বিনীকুমার সরকার (১৮৭৩ - ১৯২৯) 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' রচয়িতা মহানন্দ হালদার - গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি প্রমথরঞ্জনের সমবয়সি গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী লেখক। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' রচয়িতা বিচরণ পাগল ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী ভক্ত। তিনি 'শ্রীশ্রীহরিগুরুভক্ত চরিত' লেখেন। এই সময় কাল জানার থেকে বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী সাহিত্য ও মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির আকর গ্রন্থগুলির রচয়িতাগণ সকলেই ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী ও তাদের নিত্যসহচর ভক্ত মানুষ। তাই রচনা সাহিত্যগুলিতে যে সাহিত্য গুণ, সমসাময়িক ঘটনাবলীর পরিচয়, কার্যাবলীর বিবরণ পাই তা সাহিত্যের রচয়িতাগণ প্রত্যক্ষ দেখেছেন ও তখনকার ভক্তদের

মুখে শুনেছেন। সেই ঘটনাবলীই তাদের সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কবিবর হরিবর সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ কালে 'অপিচ' বলে যে ভূমিকা লিখেছেন সেইখানে তিনি লেখক ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলির পরিচয় সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল—

> ''কবি রসরাজ মহাশয় মহাপ্রভুর সাময়িক শিষ্যগণের প্রমুখাৎ যে সমস্ত ঘটনাবলী শ্রুত হইয়াছেন, তাহা এবং তিনি নিজে প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া চাক্ষুস যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ঠিক সেইভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের যে ঘটনা সমন্ধে যে স্থানে যে ক্রিয়া হইয়াছে; সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এ বিষয় প্রমাণ করিলে, যতটুকু লেখা হইয়াছে, ততধিক রূপে প্রমাণিত হইবে।''[৭]

সাহিত্য রচনা রীতি ও ভাষার আলোচনা :

গ্রন্থাকার তারকচন্দ্র সরকারকে আদেশ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ ও হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং। এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাকথাকে 'শ্রীহরিচরিত্র সুধা' নাম স্থির করে ওড়াকান্দি পাণ্ডুলিপি সহ যান গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে গুরুচাঁদ ঠাকুর শশীভূষণ ঠাকুরকে নামকরণের জন্য বলেন। কবি রসরাজ তারকচন্দ্রের বর্ণনায়—

> ''হস্তে করি পাণ্ডুলিপি শ্রীশশীভূষণ।
> 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' করে নামকরণ।।
> .....
> .....
> শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি সহ ওড়াকান্দী ধামে।
> শ্রীগুরুচাঁদের পদে তারক প্রণমে।।
> নাম হতিহাস কহে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
> .....
> যে নাম করেছে শশী সেই নাম ভাল।
> 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' নাম মধুর হইল।।''[৮]

গ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ আশীর্বাদ করেন তারকচন্দ্র সরকারকে। তারকচন্দ্র সরকার গ্রন্থ রচনা কাজে ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু দশরথ বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস গোস্বামী গোলক ও হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের আশীর্বাদে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচনা করেন। তারা সকলেই আশীর্বাদ ও রচনার বিষয়বস্তু ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা তারকচন্দ্র সরকারকে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস, গোলক গোস্বামী ও হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে আদেশ করেন সেই অনুযায়ীই তারকচন্দ্র সরকার রচনায় সম্মত হলেও অনেক সময় নিয়েছেন লিখতে। তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থেই এই গ্রন্থ লিখবার আদেশ সম্পর্কে বলেছেন—

"মৃত্যুঞ্জয় দশরথ এই দুই জনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা।।
.....
দুই প্রভু বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর হবে তোর শক্তি।।
.....
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোরে দিনু বর।।
.....
দশরথ বলে বাক্য লঙ্ঘিও না আর।
মৃত্যুঞ্জয় দিল বর আমার সে বর।
আমার রচিত গান আছে তোর সোনা।
তাতে পদ গাঁথা আছে তারক রসনা।।"[৯]

গোস্বামী গোলকচন্দ্র তারকচন্দ্র সরকারকে গ্রন্থ লেখার মূল বিষয়বস্তুর নির্দেশ করেছেন এভাবে—

"পূর্ব্বে ছিল মুনিগণ করতিন ধ্যান।
এবে সেই ধ্যান হয় জ্ঞানেতে বিজ্ঞান।।"[১০]

এই ধ্যান যোগের দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞাত হতেন মুনিগণ তুমিও সেই ধ্যান যোগ অবলম্বন কর সত্যের জ্ঞান লাভের জন্য। জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত সত্য জ্ঞাত হওয়া যায়।

তবেই তো তুমি সেই মহাগ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হবে। অজ্ঞান, অবিদ্যা নাশের উপায়ও বলেছেন গোলকচন্দ্র তারকচন্দ্র সরকারকে। তারকচন্দ্র সরকারকে প্রভুর মহিমা রচনায় এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন—

"শ্রীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।
লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে।।
যা দেখিস যা শুনিস তাহাত লিখিবি।
না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি।।
কোন ঠাই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।
আরোপে দেখিবি হরি চরণার বিন্দ।।
অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে অত্রানন্দ।
হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র।।"[১১]

সমসাময়িক সকল হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণ তারকচন্দ্র সরকারকে ভালো বাসতেন। সকলেই ভালো বাসতেন হরিচাঁদ ঠাকুরকে। সকলের সম্মিলিত শুভ ভাবনার শুভ আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে তারকচন্দ্র সরকারের শিরে। তারকচন্দ্র সরকার ভয় পাওয়ার জন্য গোলকচন্দ্র সরকার সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরী রূপে অবস্থান করতেন । বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য যেন তারকচন্দ্র সরকার চিন্তিত না হয় সে জন্য গোলকচন্দ্র তারকচন্দ্র সরকারকে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বলেছে যে দেশ ভাষা বাংলাতেই পুস্তক রচনা করার জন্য। যাতে দেশের ছোট বড় সকল বয়সের মানুষে বুঝতে পারেন। তারকচন্দ্র সরকার সেই ভাব ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করেছেন। গোলকচন্দ্রের আশীর্বাদ বাক্যটি তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"যে লেখা যে পড়া জান তাহা উখাড়িয়া।
দেশ ভাষা মতে দেও পুস্তক রচিয়া।।
যুবা বুড়া সবে যাতে বুঝিবারে পারে।
সেই মত লিখে দাও আমাদের বরে।।"[১২]

তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন সাধক কবি। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার মতুয়া ধর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ তাঁর জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মহাগ্রন্থ তৎকালীন যুগের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং পণ্ডিত মানুষের

ধর্ম জগতের এক মহামূল্যবান দলিল।

কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার তাঁর এই মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন বাংলা ভাষায়। কবির ভাষা পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে। কবির ভাষায় যে ভাবকে ব্যক্ত করেছেন সেই ভাব কখনো নিরস কঠিন হয়নি। কবি সহজ সুন্দর ভাবে কাব্যিক ভাষায়, কাব্য সুসমায় সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পয়ার ত্রিপদীর ভাষায় এত সাবলীলভাবে তিনি কাহিনি বর্ণনা করে ভাবকে ব্যক্ত করেছেন কখনো কোন অংশে শব্দের অপপ্রয়োগ হয়নি বললেই চলে। কবি কোথাও ভাষায় কোন কুরুচিপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করেন নি। কবির সময় যে সমাজের অবস্থা ছিল বিদ্বেষপূর্ণ তবুও রচনা নৈপুণ্যের জন্য কোথাও তা তীব্র ভাবে ব্যক্ত হয়নি। ধর্ম গ্রন্থের যে ভাষা মার্জিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন কবি। কোথাও কোথাও প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করলেও তা ভাবের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে যে ভাষার ব্যবহার তিনি করেছেন তা হল—

<u>পয়ার</u>

''ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে দয়াল ঠাকুর।
চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনা সুর।।
মৃদ্ধৌত মার্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।
অর্দ্ধপথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল।।
উড়িছে চিকুর যেন ঠিক ব্যোম-কেশ।
চলিল কবরী ছাড়ি বিশে দরবেশ।।
আগে যায় বিশ্বনাথ নাচিয়া নাচিয়া।
তার পিছে নেচে যায় গোবিন্দ মতুয়া।।
মাঝে মাঝে গোবিন্দ মতুয়া দেয় লম্ফ।
জ্ঞান হয় তাহাতে হতেছে ভূমিকম্প।।

.....

পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।
মুখ পদ্মে ঝলসিছে সূর্য্যের কিরণ।।
রক্তবর্ণ চক্ষু কাল ফণী মণি ঘেরা।

ভুরু ধনু মণি রক্ষে দিতেছে পাহারা।।

ভালে ফোঁটা শশী ছটা হয়েছে সংযোগ।

তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্প বন্ত যোগ।।''[১৩]

কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে যে 'ত্রিপদী'র ব্যবহার করেছেন সেই বর্ণনা এখানে তুলে ধরলাম—

'দীর্ঘ-ত্রিপদী'

''বসতি অযোধ্যাধাম শ্রীরাম ভরত নাম,

বিপ্র কুলোদ্ভব মহাশয়।

বৈষ্ণবের শিরোমণি মহাসাধু তপমণি,

সর্ব্ব জীবে সমদয়া রয়।।

....

.....

ঠাকুর বলেন তায়, তোমার ঘর কোথায়,

কোথা হতে এলে মহাশয়।

কহিছে রামভরত জান প্রভু ত্রিজগৎ,

দুঃখী দেখে চেননা আমায়।।

প্রভু হরিচাঁদ কয়, থাক থাক মহাশয়,

যতদিন লয় তব মন।

যাহা ইচ্ছা তাই খাও, যাহা ইচ্ছা তাই লও,

কর সদা শ্রীহরি সাধন।।''[১৪]

আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা যথার্থ ভাবেই সর্বাংশে সত্য। কবিরব মহানন্দ হালদারের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনাটিকে গ্রহণ করলাম—

''শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া ছিলেন নিখিল জীবের কল্যাণের জন্য

সুতরাং তাঁহার আদর্শও লীলা কাহিনি যাহাতে 'যুবা বুড়া' সকলেই

বুঝিতে পারে সেই ভাষা লিখিত হওয়া সর্ব্বতো প্রকারে সুসঙ্গত

ও সুন্দর হইয়াছে। .... বহুস্থলে কবিতার ভাব ও ভাষা ও ছন্দের মুর্চ্ছনায়... কবি এমন এক একটি স্বপ্ন লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে আমাদিগের সংসার তাপ জ্বালা দগ্ধ চিত্তকেও অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এ মর জগত হইতে এক শান্তিময় রাজ্যে লইয়া যায়। এই মহা গ্রন্থের একটি বিশেষ মাধুর্য এই যে গ্রন্থের যে কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে মনে হইবে যেন রৌদ্ধদগ্ধ প্রান্তর হইতে ছায়া শীতল বটের তলে আসিয়া বাঁচিলাম। দেহ মন জুড়াইয়া গেল!! ইহা এমনই শান্ত ও শীতল! এমনই মধুর!!! কেন এমন হয়? ইহার কারণ এই যে ভক্ত কবি তাঁহার সারা প্রাণের ভক্তি রস দিয়া এই মহাগ্রন্থের প্রত্যেকটি অক্ষরকে এমনি ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা স্পর্শ করিলেই এক অদৃশ্য রসশক্তি আমাদিগের মরুহৃদয়কেও সিক্ত করিয়া দেয়! এ যেন শৈত্যের লীলাভূমি দার্জিলিং-এর 'অদৃশ্য' মেঘের বারিবর্ষণ।''[১৫]

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' মহাগ্রন্থের মধ্যে কবি যেমন তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা, ধর্মীয় সংকট, মানুষের কৃষিজীবন চিত্রের নিটোল বর্ণনা করেছেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ সাহিত্যে তৎকালীন মানুষের প্রতি জমিদারের অত্যাচারের বিবরণ ধরা পড়েছে। শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবেই নয় এই সময়ের সমাজ বাস্তবতার চিত্র গ্রন্থটিতে পরিপূর্ণ ভাবেই রয়েছে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলী ও তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রের রূপায়ণ করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয় 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে। গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থের ভাষাও বাংলা। আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয় ছিলেন কর্ম জীবনে অ্যাডভোকেট। ফলে তার কবিত্ব শক্তির সঙ্গে রয়েছে সমাজ বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র। গুরুচাঁদ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবন ও কর্মজীবন বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন নমঃজাতির অতীত অনালোকিত ইতিহাস তেমনি রয়েছে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিদর্শন স্বরূপ দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা। কবি কাব্য ভাষায় পয়ার, ত্রিপদী ছন্দের মাধ্যমে ঘটনাবলীর পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি কবিত্ব শক্তির বিকাশও রয়েছে অসাধারণ। কবি শেখর মহানন্দ হালদার মহাশয়ের

মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরলাম তার প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ। কবি কালের বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''বসন্ত আসিল নিয়ে ফুল রাশি রাশি।
আকাশে হাসিল চন্দ্র মধুময় হাসি।।
মলয় সমীরে যেন জুড়াইল প্রাণ।
শাখে শাখে যত পাখি কণ্ঠে ভরা গান।।
আলোকে উজল ধরা ভরা গন্ধে গন্ধে।
বিশ্ববাসী মত্ত যেন মিলন আনন্দে।।
রে কাল! নিষ্ঠুর তুই বড়ই কঠিন।
আপনার মনে চলে গেলি চিরদিন।।
তোরে নাহি ব্যথা দেয় শিশুর ক্রন্দন।
জননীর দুঃখে তোর ঝরে না নয়ন।।
সতীর বেদনা চোখে নাহি পড়ে তোর।
দুরন্ত ডাকাত তুই আপনাতে ভোর।।
নিয়তি নামিনী তোর নিয়ত সঙ্গিনী।
ভাঙা গড়া নিয়ে খেলে দিবস রজনী।।
ইঙ্গিত করিলে তুই আর রক্ষা নাই।
সোনার বাগান পুড়ে হয় ভস্ম ছাই।।
রে কাল! দংশন তোর কত ভয়ঙ্কর!
পলকে আলোর বুকে দিস অন্ধকার।।
.....
.....
সোনার কমল পড়ে অকালে ঝরিয়া।
চোখের সুমুখে মণি নিসরে হরিয়া।।
তাই বলি কাল তুই কত যে নিষ্ঠুর।
তোর বুকে গাঁথা শুধু বেদনার সুর।।''[১৬]

‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত’ গ্রন্থ থেকে ‘ত্রিপদী’ ছন্দের পরিচয় গ্রহণ করব। এই ছন্দের মধ্যে যে ভক্তি ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি তেমনি আর একটি মহাসত্য লুকিয়ে রয়েছে এই ‘ত্রিপদী’ পদের মধ্যে। যার নাম কবি বিচরণ পাগল। বিচরণ পাগলের রচিত দুইখানি গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণ করব এরপর। বিচারণ পাগল গুরুচাঁদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত সাধক ও শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর নিত্য সঙ্গী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মতুয়া মূল আকর গ্রন্থগুলির লেখক সকল ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক প্রিয় ভক্ত হিসাবে পরিগণিত। এই ‘ত্রিপদী’ ছন্দের কবিতার বর্ণনার মধ্যে সেই সত্য যেমন নিহিত ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি ভক্তের প্রাণের আকুতিও ব্যক্ত হয়েছে। কবি শেখর মহানন্দ হালদারের বর্ণনাটি হল—

“শ্রীযাদব মহাভাগ প্রাণে গাঢ় অনুরাগ
মনে ভাবে বৃথা মোর জীবন ধারণ।
বাঞ্ছাপূর্ণ নাহি হল প্রভু গৃহে নাহি গেল
কোন পাপে এ ঘটিল বুঝি না কারণ।।
বিচরণ পাগলেরে ডেকে নিয়ে একান্তরে
তার দুটি করে ধরে আঁখি জলে ভাসি।
পরাণে দারুণ ব্যথা, যাদব না বুঝিল তা,
মনে প্রাণে তাই ব্যথা হ’ল আর বেশী।।
বলে শোন বিচরণ জানিস ত’মোর মন
.....
....
.....
জনমের মত তাই সকলে ছাড়রে ভাই
দেশ ছেড়ে চলে যাই অচেনা বিদেশে।
গুরু মোর হল বাম পূর্ণ নহে মনস্কাম
বেঁচে কেন রহিলাম বল কার আশে?
এক কথা বলি শোন পাগলারে বিচরণ

জানি তোরে গুরুচাঁদ করে বহু দয়া।

তুই যদি জোর করে মোর ঘরে নিস তাঁরে

বুঝিব আমার পরে আছে তোর মায়া।।”[১৭]

আচার্য মহানন্দ হালদার পয়ার ত্রিপদীতে এই মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও কার্যাবলীর পরিচয় দিয়েছেন ‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত’ গ্রন্থে মহানন্দ হালদার। মহানন্দ হালদারের ‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত’ গ্রন্থের যে সমালোচনা করেছেন প্রকাশক শ্রীকুমুদরঞ্জন মজুমদার তা থেকে আলোচনার সুবিধার্থে কিছু অংশ তুলে ধরলাম। তা হল—

“গ্রন্থখানি আদ্যে প্রান্ত পাঠ করিয়া আমার প্রাণে যে ধারণার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই সর্ব্ব সাধারণ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম এবং আমি আশা করি পাঠকগণ আমার সহিত এ বিষয়ে সানন্দ চিত্তে একমত হইবেন। গ্রন্থকার কবি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কাব্য লক্ষ্মীর পূজাদেবী মূলে এই তাহার প্রথম অর্ঘ্য। মানস-নন্দন-কানন জাত পারিজাত স্তবকে তিনি যে অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই অতুলনীয় হইয়াছে। কোন কোন অধ্যায়ের মধ্যে এমন সুনিপুণভাবে তিনি লেখনী চালাইয়াছেন যাহাতে মনে হয় যেন কোনও ভক্ত পূজারী তাহার ‘প্রাণের দেবতার’ সম্মুখে অশ্রু জলের মধ্য দিয়া আপনার ‘ব্যথার পূজার’ গান গাহিয়া চলিয়াছে!! ইহা এমনি জীবন্ত!! এমনিই মূর্ত্তিমন্ত!! আবার কোন কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে এমনই মনে হইয়াছে যেন সংসার তাপদগ্ধ জীবনকে দূরে ফেলিয়া কোন ছায়া-সুনিবিড় তপোবনে ঋষির মুখে তত্ত্ব কথা শুনিতেছি!! কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে ‘মানুষে মানুষে হিংসা’ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি, পরন্তু কোন অধ্যায়ের নির্দোষ হাস্যরসের মধ্যে প্রভূত আনন্দ লাভ ও করিয়াছি। এই রূপে সর্ব্বনীতির পূর্ণ প্রতীক শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের জীবন আলেখ্যের মধ্যে ভক্ত কবি সর্ব্বরসের

অবতারণা করিয়া পূজার নৈবেদ্যকে ষোড়শোপচারে পূর্ণাঙ্গ
করিয়াছেন। .... শুধু তাহাই নহে বাংলা ভাষায় ও এই প্রকারের
রসযুক্ত সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ খুব কমই রচিত হইয়াছে।''[১৮]

প্রকাশকের গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত সম্পূর্ণভাবেই সত্য। আর যে কোন ব্যক্তি মানুষ এই মহাগ্রন্থ পাঠ করলে বুঝতে পারবেন সাহিত্যের যথার্থ মূল্যকে। কবিবর মহানন্দ হালদার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী যেভাবে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন তা সত্যই মহামূল্যবান। বিচরণ পাগলের দুই মহাগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বলতে হয় এই কবিও পয়ার, ত্রিপদীর ছন্দই ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্য গ্রন্থে।

বিচরণ পাগল ও অশ্বিনী গোঁসাই, গোপাল সাধু ও আরো বহু অগণিত ভক্ত যারা হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শ ধর্মাদর্শের সমসাময়িক ভক্ত কবিগণ হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় মানুষ ছিলেন। বিচরণ পাগলের 'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা' থেকে ভাষার পরিচয় গ্রহণ করার জন্য যে উদাহরণ গ্রহণ করলাম সেখানেই যেমন ভাষা প্রসঙ্গ পাব তেমনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের দুই প্রিয়ভক্ত অশ্বিনী গোঁসাই ও বিচরণ পাগলের কথাও রয়েছে। কবিবর বিচরণের গ্রন্থে রচনা রীতির পয়ারের পরিচয় হল—

''দেশ শুদ্ধ লোকে যেন গণিল হুতাশ।
অশ্বিনীর তরে যেন বাড়ে হা হুতাশ।।
একদিন বিচরণ পাগল যে জন।
গুরুচাঁদ পাশে গিয়ে দেন দরশন।।
প্রভু বলে বিচরণ জান কি সে কথা।
আমার অশ্বিনী নাকি চলে গেছে কোথা।।
কোন দেশে গেল বল কিসের লাগিয়া।
আসিবেন না আর নাকি এদেশে ফিরিয়া।।
ফিরে যদি না আইসে কি হবে উপায়।
অশ্বিনীর তরে মম হৃদি দগ্ধ হয়।।
অতএব বিচরণ চলি যাও ত্বরা।

দেখ গিয়ে কোন দেশে পাও তাঁর ধরা।।

.....

কোন স্থানে সুস্থ নহে থাকে মন প্রাণ।

অনুক্ষণ কাঁদে কোথা প্রভু গুরুচাঁদ।।

বহু কষ্টে উপনীত হইল দেশেতে।

প্রভু পদে প্রণমিল কাঁদিতে কাঁদিতে।

প্রভু বলে ও অশ্বিনী কোথা গিয়েছিলে।

কোন দেশে কহ বাপ কিবা দেখে এলে।।''[১৯]

ত্রিপদীর উদাহরণ কবির বর্ণনায়—

''পরে অপরাহ্ন কালে সব ভক্তগণ মিলে,

চলে প্রভু জয়পুর দিকে।

প্রভুর অপার লীলা মরি কিবা মধুর খেলা,

ভকতের গন সকৌতুকে।।

দৌড়ে গিয়ে শ্রীশৈলেশ শয্যার করে সুবেশ

প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল।

সঙ্গেতে সাধনা চলে, ভাসিতেছে আঁখি জলে

জয়পুরে উদয় হইল।।

রসনার গৃহ মাঝ মহাপ্রভু রসরাজ,

বসিলেন হরিষ হইয়া।

প্রভু পদে প্রণমে আসিয়ে।।''[২০]

বিচরণ পাগল রচিত 'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা' মহাগ্রন্থ। বিচরণ পাগলের এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণের কার্যাবলীর পরিচয় রয়েছে ও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির পরিচয় রয়েছে যা সমাজের সমাজ বাস্তবতার চিত্র। বিচরণ পাগল গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে মানুষকে ধর্ম কর্ম শিক্ষা দান করেছেন সেই সকল বিষয়ই তিনি 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্যে' বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে। এই গ্রন্থেটিতেও পয়ার, ত্রিপদীর ব্যবহার করেছেন। বিচরণ পাগলের দ্বিতীয় গ্রন্থে কবি যে ভাবে ভাষার প্রয়োগ করেছেন তা

হল—

পয়ার

''দয়াময় গুরুচাঁদ জীবের লাগিয়া।

স্বধর্ম শিখায় জীবে করুণা করিয়া।।

.....

.....

পরহিতে কর্ম করা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।

কভু না চাহিবে কিছু তার বিনিময়।।

স্বার্থ শূন্য মহাকর্ম্ম মহতের রীতি।

কামনা বাসনা শূন্য সে উত্তম গতি।।''[২১]

'ত্রিপদী'র উদাহরণ 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্যে' থেকে তুলে ধরছি—

''মাধুর্য্যের ভক্ত যারা, গোপনেই থাকে তারা,

ঐশ্বর্য্যের আবরণ দিয়ে।

সাধারণ লোক হতে রহে সদা গোপনেতে,

আপনার স্বধর্ম লাগিয়ে।।

মুক্তিকামী নহে তারা, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা,

সদা থাকে আত্মগোপনেতে।

সাধারণ লোকে যত, মানে না তাহার তত্ত্ব,

বাহ্যভাবে সদা থাকে মেতে।।

অন্তর্দ্দর্শী হলে পরে, তবে সে চিনিতে পারে,

এই ভবে মানুষ রতন।''[২২]

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্যে' বিচরণ পাগল তত্ত্বকথাকে বেশি বলেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর যেমন ছিলেন সমাজ সংস্করক তেমনি ধর্ম সংস্কারক। তিনি যে পিতার কর্মকে আরো সুদৃঢ়ভাবে জন সমাজে প্রকাশ ঘটান কর্মের মাধ্যমে এই পরিচয় দিয়েছেন বিচরণ পাগল ও সকল লেখকগণ।

ধর্ম সমন্বয়ী ভাবধারা ও গানের আলোচনা :

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে ভক্তি ধর্মের প্রতি উদার মানসিকতার পরিচয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটি ভক্তের ভগবান চিরকালের তাঁর আদি অন্ত নেই, তিনি অসীম অনন্ত, তিনি কালাকালের সীমায় আবদ্ধ নন। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন ভক্তের মাঝে। প্রথমেই কবি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''হরিচাঁদ চরিত্র সুধা প্রেমের ভাণ্ডার।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার।।''[২৩]

'হরি' যার কোন সীমা নেই সেই অসীম অনন্ত করুণাময় ভগবান। তিনি মানবদেহধারী হয়েছেন।

এই বর্ণনার পরেই কবি বর্ণনা করেছেন ভক্তি যোগের গূঢ়ার্থ। অর্থাৎ ভক্তিই হল ভক্তের পরিচয়। যে যাকে ভক্তি করে সে তার ভগবান এই উদার ভক্তিভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

''যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।''[২৪]

কোন মানুষকেই হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ধর্মীয় ভাবনায় বাধা দেন নি। এমনকি সকল হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণও এই আদর্শ পালন করে থাকেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনা প্রবর্তনের আগে সমাজে যে ভক্তি ভাবনা সমাজে প্রচলিত ছিল সেই ভক্তের প্রতি ও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই কবি হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবির বর্ণনায়—

''সকল হরণ করে তারে বলি হরি।
রাম হরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।
.....
হরিচাঁদ আসল হরি পূণানন্দ হরি।।''[২৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন পূর্ণ মানবতাবোধের মূর্ত প্রতীক। তাঁর মানুষের প্রতি ভাবনাও ছিল মৈত্রী ভাবনায় মিলনের প্রতীক। তাই কবির বর্ণনায় ধরা পড়েছে—

''শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
.....

জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।।''[২৬]

সারাজীবন ধরে মানুষের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকেও সেই কল্যাণ কর্মে নিয়োগ করেছেন তিনি নিজেই। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিই প্রধান। তাই ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন ভগবান। একেবারে একান্ত আপনার জন। কোন ভেদাভেদ তিনি করেননি কখনো।

গান মানুষকে মুগ্ধ করে। গান মানুষের প্রাণের সুরের প্রকাশ। ভগবানের কাছে মনের ভাবকে সুরের সহযোগে নিবেদন করেন ভক্ত মানুষেরা। মতুয়া ধর্মেও রয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে রচিত অগণিত গানের সম্ভার। ভক্তিগীতি প্রাণের মনের বিশুদ্ধ ভাবের জাগরণ ঘটায়। ভক্তিগীতির মাধুর্য্যই মানুষকে প্রাণরসে ভরপুর করে তোলে। বাংলা ভাষায় রচিত মতুয়া ধর্মসাহিত্যগুলি বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি মতুয়া সঙ্গীতগুলিও ভক্তিগীতি হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভক্তগণ গানের মাধ্যমে ভক্তির শ্রদ্ধার্ঘ যেমন নিবেদন করেছেন তেমনি ব্যক্ত হয়েছে ভক্তির মহিমা। ভক্তির দ্বারাই মানুষ দেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। সেই কথাই কোথাও ব্যক্ত হয়েছে। মূলত এই ভক্তি গীতির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে ভক্তির, জ্ঞানের সঞ্চারের মধ্যে দিয়ে আত্মচেতনা লাভ করে মানুষ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। অশ্বিনী কুমার সরকার একজন মহাপ্রেমিক ভক্ত সাধক। যার জন্য স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুর কেঁদেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর এই মহাভক্তকে মহারত্ন আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই মহারত্ন অশ্বিনী গোঁসাই 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত' রচনা করেছেন। অশ্বিনী গোঁসাই সম্পর্কে ড. পরমানন্দ হালদার যথার্থই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ''সাধক কবি শ্রীমৎ অশ্বিনী গোঁসাই মতুয়া ধর্মও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড বিস্ময়।... তিনি কীভাবে ঐশ্বরিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে অসংখ্য গীতি মাল্য রচনা করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত' তার জ্বলন্ত নিদর্শন। কীভাবে, কি ভাষায়, কি কবিত্বে এবং কি আধ্যাত্ম সাধনায় তিনি ছিলেন আত্ম সমাহিত এক মহাকবি।''[২৭]

সাধক কবি শ্রীঅশ্বিনী গোঁসাই ভাব জগতের পরিমণ্ডলে অনেক গান রচনা করেছেন

এবং সেগুলি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত। অশ্বিনী গোঁসাই এর রচিত গানগুলি সম্পর্কে আচার্য মহানন্দ হালদার বলেছেন—

"প্রেমতত্ত্ব ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব গাঁথা।
আত্ম তত্ত্ব সমাহিত গানের কবিতা।।"[২৮]

অশ্বিনী গোঁসাই-এর কিছু গানের উল্লেখ করলাম যেগুলির আধ্যাত্মিক সুরই মূল বিষয়। এই ভাবের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হল—

প্রভাতী গীতি

ক. 'প্রাণমতি শুকশারী, পোহাল শর্ব্বরী, শ্রীহরি মঙ্গল গাও হে।
শ্রীহরিমঙ্গল গাও হে' প্রেমানন্দে মাতিয়া রও হে।।

১. হৃদি নিধু বনে, শান্তি মায়ের সনে শ্রীহরিচাঁদকে জাগাও হে।
যুগল মিলন করি, যুগল নয়ন ভরি, হরিরূপ-রসে ডুবে রও হে।।

২. নিশি হল ভোর, রসনা ভ্রমর, গুণ গুণ স্বরে গুণ গাও হে।
হরিপদ পঙ্কজে, সতত থাক মজে, হরি পদ রজে গড়ি দাও হে।।

৩. হরিরূপ আলোকে, মনের পুলকে, নিরানন্দ উলুকে তাড়াও হে।
হইয়া চৈতন্য, এ দেহ কর ধন্য, সাধু সঙ্গ বাতাস লাগাও হে।।

৪. নিশি প্রভাত সময়ে, প্রেমানন্দ হৃদয়, পুলকে পুর্ণিত হও হে।
আলস্য ত্যজিয়া, হরিপদে মজিয়া, হরিচাঁদ প্রভাতী গাও হে।।

৫. হরিপদ পল্লব, দেবের দুর্লভ, কায়মনে স্মরণ লও হে।
শয়নে স্বপনে, জাগরণে বদনে, নামমধু পানে মত্ত হও হে।।

৬. তারক মহানন্দ, গোঁসাই গোলকচন্দ্র, প্রেমধন যাচে জীবে লও হে।
হেন দয়াল ভবে আর কি খুঁজিয়া পাবে, চরণে শরণ লও হে।।

৭. শ্রীগুরুচাঁদ বলে, নিশি প্রভাত কালে, আলস্যে অবশ কেন হও হে।
(অলস) অশ্বিনী অধম, ত্যজিয়া মায়া ঘুম, বসিয়া হরিগুণ গাও হে।।"[২৯]

মতুয়া ভক্তগণ প্রভাতী গীতি হিসাবে অশ্বিনী গোঁসাই এর এই গানটি গেয়ে থাকেন। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সূর্যদয়ের প্রাক্‌কালে এই গানটি মতুয়াভক্ত গায়কগণ প্রাণ মাতানো সুরে যখন করেন তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্ফুরণ ঘটে ভক্ত হৃদয়ে। সমবেত সকল ভক্তগণই

সমবেত কণ্ঠে গুণগুণ স্বরে সুর মেলানোর চেষ্টা করেন। ভোরের এই অবর্ণনীয় মাধুর্য্যের বিকাশের সময় এই ভক্তিগীতি ভক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় যখন তখন ভোরের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

অশ্বিনী গোঁসাই ভাব জগতের অধিবাসী ভাবই তাঁর সঙ্গীতের উপজীব্য। শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের তত্ত্বের সার্থক রূপকার তিনি। তাঁর গানগুলির মধ্যে এই কোলাহলময় অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির এক নব দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। সংসারে বসবাস করেও কীভাবে নিস্পৃহ জীবন যাপন করতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবির অনেক আধ্যাত্মিক গান। কীভাবে নিরবে ভগবানের সাধনা করতে হয় তার নিদর্শন কবির এই গান—

খ. "মনের মানুষ ধরা, মন রে ফেরা মুখের কথা নয়,
তাঁরে ধরবি যদি নিরবধি, (নে) বধিরান্ধ বোবাশ্রয়।।"

১. বধিরান্ধ বোবার স্বভাব ধর, তবে অধর ধরা পড়বে ধরা, তারে ধরার মত ধর।
থাক যুতের ঘরে রূপ নিহারে, তবে মানুষ পাওয়া যায়।।

২. আমিত্ব দূর যখন হবে, তবে হবে সে ভাব, বাহ্য স্বভাব, কিছু না রবে।
এই দশা তোর যখন হবে, দেখবি জগৎ মানুষ ময়।।

৩. মনের মানুষ যদি ধরতে চাও, আত্মস্বার্ত ত্যজে প্রেমে মজে অনুগত হত।
হলে অনুগত, মনের মত, মন মানুষ হবে সদয়।।

৪. প্রেম নগরে হয় তার বসতি, ও সে প্রেমিক বড় ভালোবাসে, প্রেমে যাঁর আর্ত্তি।
ও সে প্রেমিক পেলে করে কোলে, প্রেম শূন্য দেখিলে লুকায়।।

৫. ডেকে বলে তারক রসনা, আমার মনের মানুষ হরিচাঁদ তার কর উপাসনা।
এবার অশ্বিনীর পুরবে বাসনা মহানন্দের করুণায়।।"[৩০]

অশ্বিনী গোঁসাই এর এই গানটিতে মানুষের 'নাম' করার পর মানুষের যে মহাভাবের উদয় হয় সেই বর্ণনা করেছেন। অশ্বিনী গোঁসাই ছিলেন প্রেমিক কবি অর্থাৎ হরি ভক্তির, প্রেমিক মহারত্ন। তাই সেই মহাভাবের বিকাশ ঘটেছে তার গানগুলিতে। সেই রকমই একটি গান হল এটি—

গ. "এ মহাদেশে, তার হরির অভাব কিসে,
ও যার চরিত্র—পবিত্র হৃদয়, সদা প্রেমানন্দে ভাসে।।"

১. জলে হরি, স্থলে হরি, হরি হৃদয় বাসে।।

ওরে অনলে অনিলে হরি, হরি রূপ রসে গেছে মিশে।।

২. যাঁর হরি কথা হৃদয় গাঁথা, তার তুলনা কিসে।

ও সে হরি কথা কইতে কইতে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে।।

৩. হরিনামামৃত অবিরত, পান করে যে বসে।

হয়ে নামে রুচি সর্ব শুচি, নেচে বেড়ায় বেহাল বেশে।।

৪. হয়ে নামে নিপুণ, নিদ্রা মৈথুন, তাড়িয়েছে দূর দেশে।

হয়ে পাগল পারা, মাতোয়ারা, একবার কাঁদে একবার হাসে।।

৫. মহানন্দ পাগলা ছন্দ প্রেম দিয়ে কাম নাশে।

অশ্বিনী তুই রইলি ভুলে, হরি প্রেম ঘটল না তোর কর্ম্মদোর্ষে।।"[৩১]

হরিচাঁদ ঠাকুর আধ্যাত্মিক ভাবের পথিক মানুষকে দিয়েছেন তাঁর চির সাধনার সাধ্য বস্তুকে। আর সামাজিক দুঃখ-কষ্টময় মানুষকে দিয়েছেন ধর্ম কর্মের সমন্বয়ে আদর্শ গৃহধর্ম। আর রোগীকে দিয়েছেন রোগমুক্তি, সাধক প্রেমিক ভক্তকে দিয়েছেন বিশুদ্ধ মানব প্রেমের নির্যাস। সকল সামাজিক মানুষের কল্যাণ কর্ম করেছেন তিনি। অশ্বিনী গোঁসাই-এর এই গানটি ব্যক্ত হয়েছে—

ঘ. "হরিচাঁদ, হেরে জীবন জুড়াল,

ও প্রেম রসে হারে জগৎ মাতালো।"

১. দুঃখী তাপীর জুড়াতে জীবন, ওড়াকান্দী হরিচাঁদ এবার করলেন আগমন।

তোরা দেখসে আসি, জগৎবাসী, হরিচাঁদ উদয় হলো।।

২. নব রসে শ্রীঅঙ্গ মাখা, অধরে সুধাকর ও তার দুনয়ন বাঁকা।

সে যে ব্রজ নাটুর প্রাণ সখা, ভাবেতে বোঝা গেল।।

৩. শান্তি মায়ের হৃদয়েরই ধন, যোগে পায়না যোগীগণ, তারা করে যোগ সাধন।

তারে পাবার লাগি সর্ব্বত্যাগী, হীরামন পাগল হলো।।

৪. কি দিব তার রূপের তুলনা, গগনে চাঁদ মলিন হয়, হেরে রূপের জ্যোৎস্না।

এবার পুরাতে জীবের বাসনা হরিচাঁদ ভবে এল।।

৫. ডেকে বলে তারক রসনা, আমার মনের মানুষ হরিচাঁদ তার কর উপাসনা।

দয়াল মহানন্দের এই বাসনা, অশ্বিনী ধামে চলো।।''[৩২]

মতুয়া ধর্মের মূল বিষয় মানুষের উন্নতি সাধন। 'মানুষেতে নিষ্ঠা' হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অটুট বন্ধন সর্বদা রক্ষা করা হয় মতুয়া ধর্মে। এর বাস্তব সত্য মানবতার আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণভাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মানবতার উদ্বোধন এবং মানুষের ধর্মের উদ্‌যাপনে উদার মনের শুদ্ধশীল স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''এই সার্বজনীন মনের উত্তোরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করতেই মানুষের অভিব্যক্তি উৎকর্ষ। মানুষের আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই বৃহৎ মানুষের সাধনা, এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশে নানা সমাজের নানা মত, অন্তরে আছে এক মানব।''[৩৩]

তাই সত্যের আধারে ব্যক্তি মানুষ নয়, বিশ্বগত মানুষের একাত্ম হয়ে ওঠাই ধর্ম। তাই সর্বকালের ইতিহাসে দেখা যায় প্রেমিকগণের অভিপ্রায় হল সহজ মানুষ হওয়া। বাইরের ভেদাভেদ পরিত্যাগ করে অন্তরের ঐক্যের মধ্যে ফিরে যাওয়া। সেখানে বৈচিত্র থাকলেও কিন্তু বিরোধ নেই, এই অন্তর সত্যের মন্দিরেই জ্বলছে সাধনার নিত্যদীপ। অন্তরের শুদ্ধ আলোক ধারায় পরিশুদ্ধ হয়ে উঠলেই মহামানব সত্ত্বায় উত্তীর্ণ হয়। আর তখনই মানুষ সহজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দর মানুষের কথাই ব্যক্ত করেছেন 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন' গানের বইয়ের গানগুলির মধ্যে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। কবির বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

ঙ. ''তোরা দেখসে এক সোনার মানুষ এসেছে।
মানুষ কোন দেশে ছিল কার কাছে।
.....
.....
সবে বলে হরি হরি, মানুষের জন্য কাঁদতেছে।।
.....
আমার হরিচাঁদ সেই প্রেমের মানুষ, বিশুদ্ধ সহজের মানুষ,

কলির মানুষ করতে মানুষ মানুষের করণ দিতেছে।"[৩৪]

মানুষের মধ্যেই সর্বগুণ নিহিত। মানুষের ধর্মের জন্য তীর্থ পর্যটনের প্রয়োজন নেই। বিশ্বের সব সত্যই মানুষের অন্তরে নিহিত রয়েছে। সেই অন্তরনিহিত জ্ঞানালোকের বিকাশেই পূর্ণতা পায় মানুষ। আর সেই জ্ঞান ভক্তির বিশুদ্ধ ভাবকে অর্জন করার জন্য সেই জ্ঞানালোক প্রাপ্ত মানুষের প্রয়োজন হয়। সেই মানুষের সানিধ্য লাভ করলে মানুষও সেই জ্ঞানের আলোকের সন্ধান পায় ও পূর্ণ মানবতার সন্ধান পায়। সেই জ্ঞানভক্তি রতন পাওয়ার কথাই তারকচন্দ্র বলেছেন এভাবে—

চ. "ধর গে এবার মানুষ রতন।

রতন পাবি যদি করিস যতন।।

গুরুচরণ রত্না করে আছে রতন কর সিঞ্চন।

পাবি কাঁচের পরিবর্তে কাঞ্চন পুরিবে তোর মনের আকিঞ্চন।

জ্বেলে রাগের বাতি দিবা রাতি-আলোকর দেহ নিকেতন,

আসবে আলোক দেখে, গোলক থেকে পুলকে ব্রহ্ম সনাতন।

ধরতে গেলে দেয় না ধরা, ক্ষীরোদবাসী নীরোদ বরণ,

ধরে মানুষের চরণ লগে শরণ গুরুচরণই হরিচরণ।

মহানন্দের বাক্য ধরে মহানন্দে কর সংকীর্ত্তন।

পাবি তারক ব্রহ্ম নামের গুণে হরেরে তুই অক্ষয় প্রেমধন।।"[৩৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছে তা অনন্য সাধারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, আধুনিক ভাবনায় রচিত হচ্ছে গান, কবিতা ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনার আলোকে হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকথা। গানের গুরুত্ব যে অপরিসীম। গান এমন একটি প্রকাশ মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে ভক্তের সকল কথা অকপটে প্রকাশিত হয়। মতুয়া ধর্মেও গানের দিকটি রয়েছে। যেখানে নানা পর্যায়ের গান রয়েছে। উপরে আলোচনার মাধ্যমে সেই গুরুত্বকে তুলে ধরেছি।

মতুয়া ভক্তদের সামাজিক জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা:

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত সম্প্রদায়ের 'মতুয়া' নামে খ্যাতি হওয়ার পর হরিচাঁদ ঠাকুর

খাঁটি 'মতুয়া' হতে গেলে যে শিক্ষা ভক্তগণকে দিয়েছেন তা হল হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা। আদর্শ 'মতুয়া'র পরিচয় দিয়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুর। ধর্ম ও কর্ম সম্মিলনের মাধ্যমেই মতুয়া হওয়ার কথা বলেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। কেমন হবে ভক্ত চরিত্র সেই পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে। হরিচাঁদ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্তের পরিচয় হল—

''সেই মোর শ্রেষ্ঠ ভক্ত' হরিচাঁদ ভনে।।
কর্ম্মেতে প্রধান হবে ধর্ম্মেতে প্রবল।
বাহুতে রাখিবে শক্তি চক্ষে প্রেম জল।।
.....
.....
কোমলে কঠিন হবে অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের মৃদু কণ্ঠে বজ্রের গর্জ্জন।।''[৩৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভাবে মানুষের উন্নতির জন্য অগ্রসর হয়েছেন সেই আদর্শ তিনি পিতার কাছে গ্রহণ করেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই ভাবাদর্শকে বলেছেন—

''বিশ্ববাসী মানবের যাতে শুভ হয়।
সেই ধর্ম্ম নীতি কথা বলেছে সদায়।।
মানব গোষ্ঠীর তাতে সুমঙ্গল হবে।
নর জাতি দিনে দিনে সে ধর্ম্ম জানিবে।।''[৩৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সেই ভাবনার আদর্শ গ্রহণ করেই তিনি প্রথমে কাজ শুরু করেন এভাবে—

''দলিত পীড়িত যত বিদ্যাহীন নর।
মহা দুঃখে কাটে কাল পৃথিবী ভিতর।।
তাদের দুঃখের বোঝা বিদ্যা বুদ্ধি দানে।
দূর করে দিতে আজ্ঞা করে ততক্ষণে।।
অগ্রভাগে বঙ্গবাসী নমঃশূদ্র গণে।
উদ্ধার করিতে বলে আনন্দিত মনে।।
নিপীড়িত জাতি মধ্যে এ জাতি প্রধান।

অগ্রভাগে করি তাই তাদের কল্যাণ।।

নমঃশূদ্র সে আদর্শ করিলে গ্রহণ।

তাদেরে ধরিয়া ধন্য হবে অন্য জন।।"[৩৮]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার ভাবাদর্শকে আরও প্রসারিত করেছেন কর্মের দ্বারা। তিনি জাতি বলতে সকলকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আদর্শ রূপ হিসাবে পরিগণিত। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জাতি সম্পর্কে শিক্ষা হল এই—

"আমি বটে জানি এই জাতির বিচার।।

.....

নর জাতি এক জাতি ভেদ করা বৃথা।।

জাতির উন্নতি যদি করিবারে চাও।

মানবের শুভ যাতে সেই পথে ধাও।"[৩৯]

মানব জাতির কল্যাণ হবে একমাত্র ধর্ম এবং বিদ্যার জ্ঞানা আলোকের মাধ্যমে। গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই বলেছেন—

"ধর্ম্ম আর বিদ্যা বিনা নাহিক উদ্ধার।।

পবিত্র চরিত্র জানি সর্ব্বনীতি সার।

ধর্ম্মে কর্ম্মে সর্ব্বখানে মান সদাচার।।"[৪০]

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বহু মানুষ এক জায়গায় পাশাপাশি সহাবস্থান করে বাস করে। তাই বহু মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হলে সকলের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভাবে বসবাস করার মধ্যেই মানবমৈত্রী স্থাপিত হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তগণকে সামাজিক নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভক্তগণকে—

"সামাজিক নীতি সব শোন ভক্তগণ।

'জাতিভেদ' প্রথা নাহি মানিবে কখন।।"[৪১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শের পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাই পিতার ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই লোকাচারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে গণ্য হলেও ভক্তের জাতি একটাই হয় তা হল মানুষ জাতি। এখানে 'মতুয়া'রা সকলেই একটি ভক্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা সকলেই এক। ড. মীডের স্ত্রী মিসেস মীডকে গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

"জাতি ভাগ মোর ঠাঁই পাবে না কখন।

নরাকারে ভূমণ্ডলে যত জন আছে।

'এক জাতি' বলে মান্য পাবে মোর কাছে।।

আমার পিতার ভক্ত আছে যত জন।

এক জাতি বলে তারা হয়েছে গণন।।

লোকাচারে তারা কেহ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ।

মতুয়ার মধ্যে তাহা নাহি নিরুপণ।।

.....

.....

মতুয়া সকলে এক জাতিভেদ নাই।"[৪২]

হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের মানবতাবোধের পরিচয় থেকে বোঝা যায় মানুষকে ভ্রাতৃ বন্ধনের সঙ্গে সমাজ জীবনে চলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের বৃহৎতর সমাজ সংস্কারের পরিচয় পাই শিক্ষার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মসূচীর সময়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সকল ভক্তগণের উদ্দেশ্যে বলেন—

"সবাকারে বলি আমি যদি মান মোরে।

অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।"[৪৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই সমাজ কল্যাণকারী শুভ বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল ভক্তগণের মধ্যে। তারা সেই কথার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। সেদিন এবং বর্তমানকালেও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ ও কর্মদর্শকে ধর্মকর্মের মধ্যে দিয়ে সর্ব্বদাই পালন করে চলছে পুরুষানুক্রমে। এ ধারা চলবে প্রবহমান কাল ধরে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মানুষের বাস্তব জীবনচিত্রের পরিচয় মতুয়া ধর্ম সাহিত্যে :

হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনার মূল বিষয়ই হল জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে মানুষের জীবনকে পূর্ণাঙ্গভাবে সুখ শান্তিতে ভরপুর করা। মানুষের বাস্তব জীবন চিত্রেরই পরিচয় রয়েছে সর্বত্র। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ভগবানের সমতুল্য করার

গঠন প্রণালী ও কর্ম প্রণালীই শিক্ষা দেন। মানুষই ভগবান হয় তার যোগ্য কর্মানুসারে। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে দশরথ বৈরাগী যে প্রার্থনা করেছিলেন তা ঠাকুরকে ভালোবেসে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথের সেই চাওয়াকে পূর্ণ করেছিল। এবং দশরথের মনোবাঞ্ছা পুরণের পর হরিচাঁদ ঠাকুর যে কথাগুলি বলেছিলেন তার মধ্যেই রয়েছে বাস্তব সত্য। কারণ মানুষ নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্ম করে আর সেই কর্মানুসারেই ফল পায়। আর মানুষের প্রার্থনা পূরণ হয় কর্মের মাধ্যমে। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যে সকল মানুষের যাতায়াত ছিল তারা সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে মনের বাসনা পূরণের আকাঙক্ষা করত হরিচাঁদ ঠাকুর সকলেরই মনোবাসনা পূরণ করতেন অভিপ্রায় অনুসারে। সেই কথাই তিনি দশরথকে বলেন—

"দশরথ বলে যাহা চাই দিলে তাই।
প্রভু বলে আমি তোর বাসনা পুরাই।।
তোর যে ভাবনা আছে বহুদিন হতে।
ভাবিলে ভাব না সিদ্ধি পারিলে ভাবিতে।।
যে যাহা ভাবনা করে ঠাকুরের স্থান।
অবশ্য অভীষ্ট পূর্ণ করে ভগবান।।"[৪৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ভক্ত মানুষেরা যে ভাব নিয়ে গেছেন সেই ভাবের পূর্ণ সমাধান করতেন তিনি। তিনি মানুষের অন্তরবার্তা বুঝে সেই ভাবে তাকে তার সমস্যার উপায় করতেন। আর মানুষের ভাবনার গুরুত্ব দিতেন। সেই ভাবে তিনি সকল মানুষের অগ্রগতির পথকে প্রসারিত করতেন। সেই কথা তিনি দশরথকে বলেন—

"মোর ঠাই যেই ইচ্ছা করে যেইজন।
আমি তাহা জানিতে পারি সকল কারণ।।
যে যাহা প্রার্থনা করে এসে মম ঠাই।
সেই গীত আমি তার সাথে সাথে গাই।।"[৪৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝে তার কাছে প্রকাশিত হতেন। তার অভিপ্রায়ের পূর্ণতার সন্ধান দিয়ে মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেন। এভাবে তিনি ভক্ত মানুষের প্রয়োজন অনুসারে চলতেন। এইভাবে তিনি সকলের হৃদয়ের ধন, প্রাণের ঠাকুর হয়ে সকলের মঙ্গল করতেন। এখানে অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসতেন যারা তারা সকলেই হলেন এই বাস্তব সমাজের

দুঃখ সুখের মানুষ। তাদের তিনি যেমন ভক্তি পথের সন্ধান দিয়েছেন তেমনি সমাজ জীবনকে কর্মময় করার নির্দেশ দিতেন। সেই কর্মাদর্শের সঠিক প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন। তখনকার বাস্তব জীবনচিত্র সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে আকর গ্রন্থগুলিতে। মহৎ মহাসাধক বলে যাদের পরিচিতি ছিলো কর্মগুণে তাদের বাস্তব জীবনের চিত্রকে আলোচনার জন্য তুলে ধরলাম।

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের কালীনগর বসতি।

মহাপ্রভুর হরিচাঁদ ঠাকুরের জোনাসুর কুঠি যাত্রা।

শ্রীধাম ওড়াকান্দির ঘাটলা বন্ধন।

অথ শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরণ।

রাম ভরতের পুনরাগমন।

রুদ্র উদ্ধার।

দেবী জানকী কর্তৃক মহাপ্রভুর ফুলসজ্জা।

সামগ্রিক মানুষের জীবনের কল্যাণ কথার প্রকাশ।

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের কালীনগরে বসতি :

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হরিচাঁদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত সাধক। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের বসতি ছিল মল্লকাঁদি গ্রাম। সেখানকার কৃষি জমিগুলিতে জল জমে অফলা জমিতে পরিণত হয়ে যায় এর ফলে সেখানকার মানুষেরা কৃষিকার্য্য ত্যাগ করে ব্যবসা করে সংসার জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু সাধু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হরিভক্ত ফলে সে কৃষিকার্য্য করেন আর হরিবলে বেড়ান। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তকে বলেন শুধু ভক্তিতে জীবন ধারণ হয় না পরিবারকে রক্ষাও তার স্বকর্তব্য। হরিচাঁদ ঠাকুর বলেন মধুমতি নদীর ওপার গিয়ে কৃষিকাজ করে পুনরায় গৃহধর্মকে রক্ষার জন্য এবং সেই সঙ্গে সংকীর্ত্তন করো হরিনাম তাহলেই ধর্মকর্ম সুসম্পন্ন করতে পারবে। কবিরসরাজের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"হরিচাঁদ বলে শুন ওরে মৃত্যুঞ্জয়।

এদেশে অজন্মা হল কি হবে উপায়।।

সকলে বাণিজ্য করি হইল ব্যাপারী।

তুমি ত বেড়াও শুধু বলে হরি হরি।।

.....

.....

গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম রক্ষা সুবিহিত।

কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহকার্য্য করাই উচিত।।

.....

তুমি যাও মধুমতি নদীর ওপার।

দিনকত থাক গিয়া বাছারে আমার।।

থাক গে চণ্ডীচরণ মল্লিকের বাড়ী।

জমি রাখ ধান্য পাবে কৃষিকার্য্য করি।।

মম অন্তরঙ্গ ভক্ত হবে সে দেশেতে।

তোমারে করিবে ভক্তি একাগ্র মনেতে।।

হরিনাম সংকীর্ত্তন কর দিবা রাত্রি।

তাহা হলে সবে তোমা করিবেক ভক্তি।।"[৪৬]

প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস একা গিয়ে থাকলেন চণ্ডীচরণের বাড়ি পরে মাতা ও স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন সেখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায়।

"মহাপ্রভু আজ্ঞা দিল তাহাদের প্রতি।

সকলে কালীনগরে করগে বসতি।।

অদ্য নিশি গতে কল্য প্রভাত সময়।

শুভক্ষণে কর যাত্রা বুধের উদয়।।।

প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি অমনি চলিল।

আসিয়া কালীনগর বসতি করিল।।"[৪৭]

এভাবে ভক্তি যোগের সঙ্গে কর্মযোগের সম্মিলনে মানুষের দুঃখ দূর করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

মহাপ্রভু হরিচাঁদ ঠাকুরের জোনাসুর কুঠি যাত্রা :

হরিচাঁদ ঠাকুর জোনাসুর নীলকুঠিতে সাহেব দর্শনে যান। সেখানে যাওয়ার জন্য

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত দশরথ বিশ্বাসের গৃহে স্নান ভোজন করার আগে দশরথ বিশ্বাস সকল হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণকে দেখে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে পারিবারিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন তাতে তার আর্থিক দিক ধরা পড়েছে এবং এই মহৎ কাজ কখনোই বাধাপ্রাপ্ত হয় না অর্থনৈতিক কারণে সেই পরিচয় পাই। কবির বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"ভয় ভীত হল দশরথ।

ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখিয়া হল আতঙ্ক,

লোক হল দুই তিনশত।

দশরথ পদ ধরে, বলে প্রভুর গোচরে,

এত ভক্ত কৈল আগমন।

দৈবে লোক বহুজন করাতে স্নান ভোজন,

মম সাধ্য না হবে কখন।।"[৪৮]

হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বিশ্বাসকে বলেন যে, যে হরির চিন্তা করে, হরি তার চিন্তা করে। কার্য ক্ষেত্রে সেই ঘটনাই ঘটেছে। গ্রামের যত নারী সকলে মিলিত হয়ে যার যার বাড়ি থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী চাল, ডাল, তরকারী নিয়ে এসেছে সকল ভক্তগণের সেবার জন্য। এখানে হরিভক্তির পাত্রী যে গৃহবধূগণও তার সুন্দর বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। কবির বর্ণনায়—

"কোন কোন নারীগণে, আশ্চার্য্য মেনেছে মনে,

শুনেছে ঠাকুর যাবে কুঠি।।

শুনেছে বাটী হইতে, দশরথের বাটিতে।

আসিয়াছে মতুয়া সকল।

কেহ এনেছে চাউল কেহ এনেছে ডাউল

কেহ আনে দধি দুগ্ধ ঘোল।।

কুষ্মাণ্ড কদলী আদি, তরকারী নানা বিধি,

থোড় মোচা শাক শিম মূল।

আলু কচুক আলুবু কেহ কেহ আনে লেবু,

কেহ আনে পদ্মবীজ মূল।।

ব্যঞ্জন লাবড়া পাক, সরিষা বাটা শুক্ত শাক,

মেয়েরা রন্ধন করে ঘরে।।"[৪৯]

এভাবে দশরথ বিশ্বাসকে নারীভক্তগণ সাহায্য করেছেন। এতে যেমন সামাজিক বাস্তব জীবন ফুটে উঠেছে তেমনি সকলের মানব মৈত্রীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীধাম ওড়াকান্দির ঘাটলা বন্ধন :

শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে গোলক গোস্বামী থাকতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরকে মনপ্রাণ সপে ভক্তি করতেন গোলক গোস্বামী। হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল গৃহকাজ করতেন গোলক গোস্বামী গুরুকার্য্য হিসাবে। গোলক গোস্বামী বৃদ্ধাবস্তায় একদিন ঠাকুরবাড়ির পুকুরের ঘাটটি ভেঙে গিয়েছিল তাই পুনঃরায় বাধার জন্য ঠাকুর গোলক গোস্বামীকে ডাকলেন ভক্ত গোলক সুন্দর পরিপাটি করে ঘাট বেঁধে দিয়েছিলেন। এরপর হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন পুকুরের শেওলাগুলো পরিস্কার করে দিতে। কিন্তু ভক্ত গোলক যে বৃদ্ধ হয়েছেন তার জন্য শীতের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন না। তাই গোলক গোস্বামী মনে মনে ভাবছিলেন কাজে এত কষ্ট এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ। একথা শান্তিদেবী বুঝতে পেরে হরিচাঁদ ঠাকুরকে বলছেন গোলককে কষ্টের কাজ দিও না। তখন হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা অসাধারণ সহিষ্ণুতার শিক্ষা যা মানুষের একান্তই প্রয়োজনীয়। ঘাট বাঁধার বর্ণনাটি এরকম—

"ঠাকুর ডাকেন ওরে গোলক কোথায়।
ঘাট ভেঙে গেছে বাছা বেঁধে দে ত্বরায়।।
আজ্ঞামাত্র গোলক নামিল গিয়া জলে।
হেলে ছিল খাম্বাগুলি উঠাইল ঠেলে।।
ভাল করি খাম্বা পাতি বাঁশ পাতি দিল।
দৃঢ় করি আরো দুটি খাম্বা লাগাইল।।
দুই ধারে দুই বাঁশ দিলেন আড়নী।
তাহার উপরে বাঁশ পাতি দিল আনি।।
দুই ধারে বাধে ঘাট বিচিত্র বাখানি।
ঠিক যেন দুই থরে ইটের নিছনি।।"[৫০]

ঘাট বাধা হলেই স্নানের জন্য সকলে পুকুরে নামবে। সেখানে জলের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। তাই জল পরিস্কার করার কথাও গোলক গোস্বামীকে বলেন। গোলোক গোস্বামীর কষ্টের বার্তা পান শান্তিদেবী তাই ঠাকুরকে বারণ করেছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন—

"হারিলি কামের ঠাই বলেও হারিলি।
হারিলি শীতের ঠাই কূলে দিলি কালি।।"[৫১]

গোলক গোস্বামী তখন পূর্ব্বের মত শক্তিশালী হয়ে কাজ করেছিলেন এবং ঠাকুরও শান্তিদেবী শেষে গোলক গোস্বামীকে যা বলেছিলেন তা হল—

"মহাপ্রভু বলে হল পুকুর নির্ম্মল।
গোলোকের গুণে জল যেন গঙ্গাজল।।
গোলকে ডাকিয়া বলে দেবী শান্তি মাতা।
মরিতে চাহিলি এ বে শীত গেল কোথা।।
গোলক চরণে পড়ি কহিছে ভারতী।
জনমে জনমে যেন পদে থাকে মতি।।"[৫২]

গোলক গোস্বামীর কাহিনি থেকে বোঝা যায় জগতে যে ধর্মাচরণ করতে চায় তার জীবন ততখানিই কর্মময় হয়।

অথ শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরণ :

গৃহকর্ম নিপুনা নারীর স্বভাব সর্বদা স্বকার্য সাধন ও গৃহকে আদর্শভাবে রক্ষার দায়িত্ব নারীর। লোচন গোস্বামীর সেবা করতে অর্থাৎ অন্নভোজন করাতে স্বামীর ইচ্ছা থাকলেও তার ইচ্ছা নেই লোচন গোস্বামীর জন্য ভোজনের জোগাড় করতে। কেননা লোচন গোস্বামী ছিলেন শারীরিক ভাবে অসুস্থ। সেই জন্য নারী হৃদয়ে ছিল কিছুটা অবজ্ঞা। এছাড়াও তিনি ছিলেন গৃহকর্মেরত। পরে লোচন গোস্বামীর অনুরোধে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করেন। লোচন গোস্বামী ভোজনে বসলে সেই নারী দেখতে পেয়েছিলেন লোচন গোস্বামীর অসাধারণ রূপ। এ থেকে এ বোঝা যায় সমাজের মানুষ নারী কি পুরুষ সকলেই ভালো কাজ করতে চান ভাল দেখতে চান।

রামভরত মিশ্রের পুনরাগমন :

রামভরত মিশ্রের ভাবনায় ধরা পড়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শের পরিচয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে মানুষই বড় কোন জাতি বড় নয়। তাই তার কাছে সকল মানুষই গিয়েছেন প্রাণের টানে। সেখানে মানুষের জীবনার্ত্তিই বড় হয়ে উঠেছে। কবিরসরাজের বর্ণনায়—

> ''প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
>
> হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে।।
>
> ব্রাহ্মণ কায়স্থ সাহা শূদ্র সাধু নয়।
>
> ছত্রিশ বর্ণের লোক হল একত্তর।।''[৫৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম কর্ম করা মানুষের জন্য। তাই সেখানে মানুষই প্রধান। মানুষের উন্নতিই শেষ কথা। তাই এই মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সর্বত্রই মানুষের জীবন কথার প্রকাশ ঘটেছে।

রুদ্র উদ্ধার :

রুদ্র মণ্ডল হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণের নিন্দা করতেন। এমনকি 'হরিবল' বলে মতুয়া ভক্তগণ তার ঘাটের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চুপ করে চলে যেতেন। সেই রুদ্র মণ্ডলের ঘাটে গিয়ে গোলক গোস্বামী সকলকে বলেন আজ যার যত টুকু শক্তি আছে সব শক্তি দিয়ে ভক্তিসহ 'হরিবল' বলবে। গোলক পাগলের অভিপ্রায় হল রুদ্র মণ্ডলকে হরি ভক্ত করা। গোলক পাগলের কথায় ভক্ত সকলে হরিবল বলতে বলতে চলছিলেন এমন সময় রুদ্র মণ্ডল আসেন। লাঠি নিয়ে হরিভক্তগণকে মারার উদ্দেশ্যে। গোলক পাগল গিয়ে রুদ্র মণ্ডলকে দাদা সম্বোধন করে লাঠি নিয়ে সকলকে মারার উদ্দেশ্য যান আর 'হরিবল' বলেন এবং সকলে জোরে জোরে হরিবল বলতে বলতে রুদ্র মণ্ডল হরিভক্তগণের মাঝে পড়েন ও কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করেন। এবং পরে চেতনা লাভ করেন পরে বলেন হরিভক্তগণ সকলে পতিত পাবন। কারণ মানুষের হৃদয়ে প্রেম ভক্তির সঞ্চার করে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে চেতনা দান করেন। গোলক পাগলও সকলকে ভক্তি সহকারে ভোজন করিয়ে তিনিও হরি ভক্ত হন।

দেবী জানকী কর্তৃক মহা প্রভুর ফুলসজ্জা :

দেবী জানকী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের ছোট বোন যিনি ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের এক নিষ্ঠ ভক্ত সাধিকা। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে গৃহে থেকেই ফুলের মালায় সাজিয়েছিলেন সাধনার দ্বারা হরিচাঁদ ঠাকুর সেই ফুল মালায় মনোহর বেশে সেজে ছিলেন সেই ফুল সাজে দেখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের স্ত্রী কাশিশ্বরী এবং মাতা বোন জানকী সকলেই মহাযোগী, মহাভক্তি মতি। যার ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের ফুল সাজ সকলেই যোগ সাধন বলে দেখতে পেয়েছিলেন। জানকীর মাতৃসম ভ্রাতৃবধূ জানকীকে বলেন যে তার কোন চিন্তার কারণ নেই। হরিচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে তাঁর অগ্রজ এখনই এল, ফলে আর অনুমান ভক্তি সেবা বাদ দিয়ে বর্তমান সেবা করতে বলেন। কবির বর্ণনায়—

> ‘‘সত্বরে আসিল যথা যোগে ননদিনী।।
> কহে ডাকি সে জানকী ননদির ঠাঁই।
> ঠাকুর এসেছে তোর আর চিন্তা নাই।।
> কতক্ষণ এই রূপে আরোপে থাকিবা।
> অনুমান ছাড়ি কর বর্তমান সেবা।।’’[৫৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের গৃহ ভক্তিভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। আর সঙ্গে একথা বলা যথার্থ হবে যে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ সকলেই ছিলেন ভক্তিভাবের এক এক জন মূর্ত বিগ্রহ। ফলে মতুয়া ধর্ম সাহিত্যেগুলিতে মানুষের বাস্তব সমাজ চিত্র পাই তাতে দুঃখময় জীবনে রয়েছে ভক্তির পূর্ণ বিকাশ। তাই এই মানুষগুলির আধ্যাত্মিক জগৎ যেমন পূর্ণ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর তেমনি গৃহ জীবনের উন্নতির পথকেও সুগম করেছেন তাদের কর্মাদর্শকে সঠিক ভাবে শিক্ষা দানের মাধ্যমে। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বদাই সকলের মঙ্গলাঙ্খায় কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হতেন। তারা মানুষের শুধুমাত্র আত্মচৈতন্য দানে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেন নি, পূরণ করেছেন জীবনের পেটের ক্ষুধা ও জাগতিক মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষত্বের ক্ষুধাকেও। তাই তাদের ধর্মাদর্শ কখনোই বাস্তব সমাজ জীবনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন নি। করেছেন বাস্তব সমাজ জীবনের দুঃখ দুদর্শার থেকে উত্তরণের রাজপথ নির্মাণ এখানেই মতুয়া ধর্মের স্বাতন্ত্র্য।

সামগ্রিক মানুষের জীবনের কল্যাণ কথার প্রকাশ :

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রত্যেক মানুষের ধর্ম-কর্ম সমন্বয়ে জীবন গঠনের জন্য সর্বদা কাজ করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছেন ব্যথা বেদনায় জর্জরিত মানুষের কুলে। তাদের ব্যথার যেন শেষ ছিল না। কারণ এই নমঃ মানুষগুলির ভক্তির অভাব ছিল না ভগবানে। ছিল তাদের ব্যথাহারীর অভাব। সেই ব্যথাহারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর যতদিন শরীর ধারী ছিলেন ততদিন এই মানুষগুলির কল্যাণ ব্রত সাধন করেছেন, এবং এই কল্যাণ কর্ম যাতে প্রবাহিত হয়ে চলে তাঁর জন্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে তিনি এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেন নিজেই। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে আচার্য মহানন্দ হালদার তাই যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মময় জীবন যাপনের অবস্থানকে। কবির বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

''ব্যথিতের ঘরে এল শ্রীহরি ঠাকুর।
কৃপা করি ব্যথিতের ব্যথা কৈল দূর।।
ব্যথিতের হেন বন্ধু আর কেহ নাই।
প্রাণের ঠাকুর তাই হরিচাঁদ সাঁই।।''[৫৫]

তিনি মানুষের ধর্মদান করেই শান্ত হন নি তিনি মানুষের রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট থেকে সার্বিক ভাবেই মানুষকে মুক্ত করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে ভাবে মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুর এই বাস্তব জীবনে সুখের শান্তির জগতে বসবাস করার সন্ধ্যান দিলেন তা মানুষের ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেন—

''রোগ-শোক-দুঃখ-ব্যথা জ্বালা অপহারী।
পরম দয়াল রূপে এসেছে শ্রীহরি।।''[৫৬]

সকল দুঃখ যিনি হরণ করে মানুষকে আত্মচেতনার, আত্মজ্ঞান দান করে এই সংসার জীবন যাপনে অন্তহীন সুখের জীবনে উন্নীত করেন তিনিই যে 'হরি' সেকথা কবি রসরাজ তারকচন্দ্র বলেছেন—

''সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি।
.....
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।।''[৫৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তারের সময় ভক্তগণ মিলিত ভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে যেভাবে তাদের কথা বর্ণনা করেছেন সেই ভাবের মধ্যেই রয়েছে তাদের মনের ভাবনা। সকলের বিনীত নিবেদন ছিল ঠাকুরের কাছে এই—

"প্রভুর চরণে করি এই নিবেদন।
'মো' সবার থাকে যেন সদা এই মন।।
.....
হরিচাঁদে ঘরে পেয়ে ধন্য হইয়াছি।।
তাঁর ঘরে মহারত্ন গুরুচাঁদ তুমি।
পরম পবিত্র প্রভু তুমি অন্তর্যামী।।
.....
যেই শুভ দিনে এই জাতির ভিতর।
পরম দয়াল হরি হল অবতার।।
সেই দিনে পুনর্জন্ম পেয়েছে এ জাতি।
দিনে দিনে হবে এর অবশ্য উন্নতি।।"[৫৮]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই ছিলেন সংসারী মানুষ। তাই সংসারী মানুষের ব্যথাহারী হয়েই মানুষের জীবন গঠন করবেন এটাই কাম্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম ভাবনা তাই গৃহ জীবনের মধ্যেই পালন করে মহামানব হওয়ার ধর্ম। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম ও 'নামধর্ম' কথাই ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

"সংসারের মাঝে তাই গৃহস্থ সাজিয়া।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ নাম ধর্ম্ম নিয়া।।"[৫৯]

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'নামধর্ম' হল 'হরিবল' নাম করা। মতুয়া ভক্তগণ সকলেই এই 'নাম ধর্ম' পালন করেন। মনিমোহণ বৈরাগী মতুয়া মানুষের এই 'নাম' ভাবনার আলোচান করেছেন। মতুয়াধর্মে ধর্ম ও কর্ম সমন্বয় সাধন করে ভক্তগণকে 'ধর্মকর্ম' এক সঙ্গে রক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। মনিমোহণ বৈরাগী মতুয়াদের ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা হল—

"মতুয়া ধর্মে—ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে ধর্ম

শেষ হয় 'নাম' (বিজ্ঞান) নামক সমাধিতে (Meditation); তার পর আসে প্রেমরূপী বৃহত্তর কর্মবাদ। তাই সমাধি পুষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ গোষ্ঠী হিসাবে মনযোগ দেবেন জনকল্যাণ এটিই এর কাম্য। আর এখানেই হল এর বৌদ্ধিকতা। মতুয়া মন্ত্রে আছে এর ইঙ্গিত। যা নাম (বিজ্ঞান) এবং প্রেম ধর্মের বাইরের যাবতীয় কাজকে বাজে কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। তাইতো এই ধর্ম এবং কর্মযোগ সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ হল—

"জীবে দয়া, নামে রুচি, মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্ঠা।।"

অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়া, নামের (বিজ্ঞানের) প্রতি রুচি এবং মানুষের প্রতি নিষ্ঠা এটাই হল মতুয়া 'হরিবোল' মন্ত্রের তাৎপর্য।

অতঃপর মতুয়াদের নাম (বিজ্ঞান) নামক সমাধি থেকে ফিরতে হয় গৃহ ধর্মেও গৃহকর্মে। তবে এটা হল ধর্মের উচুস্তর, অর্থাৎ কর্মবাদ যার কাজ হবে জীবে দয়াও বহুজন হিতায় প্রেমের বন্ধনে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করা। তাই মতুয়াধর্মে গার্হস্থ্য আশ্রমের ভিতর দিয়েই বিচার হয়, কে সাধু আর কেই বা অসাধু।

"গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।"[৬০]

সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা রূপি মানুষের মানবিক গুণাবলীর যদি বিকাশ ঘটানো যায়, তবেই সংকীর্ণ মানসিকতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি ধর্মের আশ্রয়ে মানুষ নিজে যেমন সুন্দর, পৃথিবীকেও আরো সুন্দরও মনোরম করে গড়ে তুলতে পারেন। তেমনি আবার অন্যকেও সুন্দর হতে সাহায্য করতে পারেন। এটাই যদি সকল মানুষের মনোবৃত্তি হয় তাহলে সকলেই সমবেত ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন।

মানুষের দুঃখের কারণ ও দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা :

আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন লাভ করতে পারলে মানুষের জীবন পূর্ণতা পায়। অসীম

অনন্ত ব্রহ্ম মানব দেহেই অবস্থান করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অসীম অনন্ত আত্মা রয়েছে। জ্ঞান ভক্তির দ্বারা অসীমের সন্ধান পেতে মুনিগণ ধ্যান করতেন। ধ্যান যোগের মাধ্যমে আপন আত্মার সঙ্গে অনন্তের যোগাযোগ স্থাপন হয়। আত্মদর্শন করে আত্মানুভূতি লাভ করলে মানুষের পূর্ণতার সঙ্গে জীবন হয় শক্তি ভক্তি জ্ঞানের। সৌন্দর্যের মিলনে পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন মানবাদর্শের বিকাশ ঘটে। যে পূর্ণতা ঘটেছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনে। তিনি ছিলেন সেই অসীম আত্মদর্শনকারী মানুষ।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর আপন অনন্ত অসীম মানবাত্মার মাঝে নিজের স্বরূপ যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তেমনি তিনি সকল মানুষের জন্য আত্মদর্শনের পথকেও উন্মুক্ত করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মদর্শন প্রসঙ্গে কবিরসরাজ বলেছেন—

''অনন্ত 'আপন' মাঝে প্রভু ডুবে রয়।
আপন স্বরূপ প্রভু দেখিবারে পায়।।
মহান পুরুষ রূপে আপনার আত্মা।
প্রভুর সন্মুখে আসি কহিলেক বার্তা।।
''নামধারী দেহ রূপে তুমি হরিচাঁদ।
জীব শিক্ষা লাগি নরজগতের নাথ।।
তুমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম উভয়ে অভিন্ন।
দেহ আত্মা মোরা দোঁহে মূলে নহি ভিন্ন।।''[৬১]

দেহের মধ্যেই সেই অসীম আত্মার বাসস্থান। তাই দেহ ও আত্মা মিলিতভাবে থাকে। আত্মদর্শন করলে সকল সংকীর্ণতার বিলোপ ঘটে এক অখণ্ড সত্ত্বায় উন্নিত হয় মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুর সেই অসীম অনন্ত সত্ত্বার বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষকে যে সহজ উপায় প্রদান করলেন। তা হল 'নামধর্ম'। তাই তিনি মানুষকে সর্বদা পবিত্র জীবনযাপন করার কথা বলেছেন। পবিত্র চরিত্রধারী হয়ে 'নামধর্ম' পালন করলে মানুষের সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। তাই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য 'নামধর্ম' দিয়েছেন। তিনি মানুষের কল্যাণের পথ এভাবে উন্মুক্ত করলেন 'নামধর্ম' দ্বারা—

''তুলিয়া নামের ঢেউ প্রেম প্লাবনেতে।
ধূয়ে মুছে নিব সব নাম প্রবাহেতে।।''[৬২]

মনিমোহন বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম ভাবনার জ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনাটি হল—

> ‘‘ঠাকুর হরিচাঁদই সর্বপ্রথম ‘সংঘ সমাধির’ (Mass Meditation) দিকে মনযোগ দেন এবং আবিষ্কার করেন ‘হরিবোল’ মহামন্ত্র যার মাধ্যমে ‘সংঘ সমাধিতে’ (Mass Meditation) পৌঁছান যায়। অর্থাৎ সমগ্র ব্যবস্থাটাই হল এখানে যৌগিক (Compund) প্রক্রিয়া। শুরুতেই এখানে ব্যষ্টি পৌঁছায় ‘নাম’ (বিজ্ঞান) নামক সংঘ সমাধিতে এবং সমাধিপুষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমষ্টিগতভাবে আবার ফিরে আসে গৃহ কর্মে।’’[৬৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুর শশীভূষণ ঠাকুরকে মানুষের দুঃখের কারণও দুঃখ থেকে উত্তরণ ঘটে কীভাবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানুষের শরীর হয় পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা গঠিত। এই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যেই থাকে ব্রহ্মশক্তি। পঞ্চতত্ত্ব ও আত্মার মিলন হলেই আত্মশক্তি সম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়। পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ মহাভূত হল আধার যা দেহ নামে পরিচিত। চিৎশক্তি হল আত্মা। দেহের মধ্যে এই আত্মা বা চিৎশক্তি থাকে বলেই মানুষের চলাফেরা সম্ভব হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের গঠন ও মানুষের কর্ম সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা হল—

> ‘‘এবে শুন কেবা কান্দে কিসের মায়ায়।
> ব্রহ্মের বিকারে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড যে হয়।।
> অবিকারী চিৎশক্তি ব্রহ্ম যা নাম।
> গুণাতীত সত্ত্বা সেই বি কুণ্ঠ নিষ্কাম।।
> ব্রহ্মের বিকার ভাগ হল পঞ্চ ক্রমে।
> ক্ষিতি অপঃ তেজঃ মরুদ্বোম্ পঞ্চ নামে।।
> অবিনাশী ব্রহ্মশক্তি নশ্বর বিকার।
> .....
> .....
> পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে যত সকলি নশ্বর।
> পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে ঘুরে ব্রহ্ম পরাৎপর।।

ব্রহ্ম ধরে 'আত্মা' নাম তত্ত্বে দেহ কয়।

উভয়ে মিলন হলে জীব সৃষ্টি হয়।।

ভূত'ত আধার মাত্র দেহ নাম ধরে।

চিৎশক্তি আত্মা আছে তাই চলে ফিরে।।''[৬৪]

মানুষের মধ্যে যে চিৎশক্তি রয়েছে আত্মা নামে তাকে জানতে হয় মানুষের সাধনার দ্বারা। মানুষ তার তত্ত্ব জানলে জীবনের দুঃখের শেষ হয়। মানুষ আত্মদর্শন না করলে জীবনে শুধু ভোগ তৃষ্ণায় রত হয়। এই ভোগ তৃষ্ণা থেকে উত্তরণ করে জীবন ধারণ করলে মানুষের জাগতিক দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে। ও সুখের আনন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় মানুষ। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

''নিজ ভোগ জানি কর্ম্ম করিলে জীবাত্মা।

সেই কর্ম্মে ফলে ভোগ রুষ্ট পরমাত্মা।।

.....

.....

আত্মসুখ ভোগ ভুলি জীবে সাধে কর্ম্ম।

ফলহীন কর্ম্ম তাহা মহাজন ধর্ম্ম।।

পরমাত্মা প্রীতি হেতু যেই কর্ম্ম হয়।

ফলহীন কর্ম্মবলি জানিবে নিশ্চয়।।''[৬৫]

ফলহীন কর্ম করতে হলে লাগে ভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা। আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণই ভক্তি সহযোগে এই কর্ম সাধণ করতে সক্ষম হয়। এবং যে মানুষ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হয়েছেন তার সঙ্গে এই জীবাত্মা বা দেহ ও আত্মার মিলন হয়। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

''ফল শূন্য কর্ম্মে লাগে পূর্ণ নির্ভরতা।

তাঁর ইচ্ছা ক্রমে চলে, বলে তাঁর কথা।।

নিষ্কাম কর্ম্মেতে যবে জীবাত্মা চলয়।

পরমাত্মা সনে তার হয় পরিণয়।।

এই পরিণয় ফলে ফলে মোক্ষ ফল।।''[৬৬]

৬৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বের আগে সনাতনী ধর্মভাবনার উন্মেষ ঘটে। এই সনাতনী ভারতীয়দের যে

সনাতনধর্মী ধর্মভাবনা ছিল তা পঞ্চভৌতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষিতি অপঃ তেজঃ মরুৎ ব্যোম নামক পঞ্চমহাভূতের ধর্ম ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের নির্দশন। এই ভূতের দর্শন বা সনাতনী দর্শনের সাম্প্রতিক 'বর্তমান' পত্রিকায় আলোচনা বের হয়। ১৯৮৫ সালের ১৪ই অক্টোবর 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—

> ''সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতিগত বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা চক্রে মন্তব্য করা হয় যে, আর্যদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করার প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে সিন্ধু উপত্যকায় অতি উন্নত মানের এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্ষিতি অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতের তত্ত্ব আর্য-সভ্যতা বহির্ভূত প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার ধারকদেরই আবিষ্কার।''[৬৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সনাতনী ভূতের ধর্মকেই পুনরায় 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' নামে প্রচার করেন। যাকে মতুয়া ধর্ম নামে ভক্তগণ আখ্যায়িত করেন। তাই মতুয়া ধর্ম হল সনাতনী ভূতের ধর্মের প্রকাশ, সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' বা 'মতুয়া ধর্ম' নামে।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭।

২. চক্রবর্তী, সুবোধ, ভারতের সাধক সাধিকা, প্রথম প্রকাশ, কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, বৈশাখ, ১৪০০ সন, পৃ. ৭৯৪-৭৯৫।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৮।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৮।

৫. শ্রীনাভাজী রচিত, বৃহৎ শ্রীশ্রীভক্ত মাল গ্রন্থ, মে, বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী, ১৬৭ ওল্ড

চিনাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০৯, পৃ. ৭৩০।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩০।

৭. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ভূমিকাংশ থেকে গৃহিত।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫-২০৭।

১৫. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, নবম সংস্করণ, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৯, পৃ. ভূমিকাংশ থেকে গৃহিত।

১৬. হালদার আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪।

১৮. পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত ভূমিকাংশ।

১৯. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র, সুধা প্রকাশক, আমতলী, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

২৩. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

২৭. সরকার, শ্রীঅশ্বিনীকুমার, শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত, দ্বাবিংশতিতম সংস্করণ, বারুণী মহামেলা, ঠাকুরনগর। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, ২০১০, ভূমিকা থেকে নেওয়া।

২৮. পূর্বোক্ত, ভূমিকা থেকে নেওয়া।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ১২তম খণ্ড, মানুষের ধর্ম, জন্মশতবার্ষিক ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৫৬৮-৫৬৯।

৩৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ঠাকুরনগর, ১৪১১ সাল, ২০০৫, পৃ. ২৫-২৬।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৩৬. হালদার আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৩৬।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭০।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০-২০১।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

৪৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

৫৫. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বীণাপানি প্রেস, ঠাকুর নগর, ১৯৯৮, পৃ. ১১০।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৫৭. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

৫৮. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বীণাপানি প্রেস, ঠাকুর নগর, ১৯৯৮, পৃ. ১০৯।

৫৯. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৮।

৬০. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাঁড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার, ২০১২, পৃ. ২৭।

৬১. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৬।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

৬৩. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাঁড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার, ২০১২, পৃ. ২৬-২৭।

৬৪. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বীণাপানি প্রেস, ঠাকুর নগর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৬৭. বর্তমান পত্রিকা, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত।

উপসংহার

সিদ্ধান্ত ভাবনা :

ঊনবিংশ শতক হল ধর্মজাগরণের সময়। এই সময় ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার করেন সমাজ সংস্কারকগণ। ধর্মজাগরণ ঘটেছিল মূলত অতীত ভারত সংস্কৃতির মধ্যে; যে জীবন দর্শন ছিল তার সংস্কার করেই সমাজ সংস্কারকগণ, ধর্মসংস্কারকগণ পুরোনো ঐতিহ্যের আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা মানব সমাজের ধর্মজাগরণ ঘটালেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থ ভাবে প্রয়োজনীয় হল অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয়ের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। তিনি বলেছেন— "আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গ্রীক লাতিনের বদলে ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাও হয়েছিল অতীতে ফিরে যাবার রিভাইভ্যাসিষ্ট তাগিদে নয়, জীবনের নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের জন্য।"[১] হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্থে বাংলাদেশের মাটিতে আবির্ভূত হন। তিনিও সমাজ সংস্কার ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হন। সংস্কারকামী হতে গিয়ে সকলেই অতীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন আধুনিক জ্ঞানালোকের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুরও অতীতের ঐতিহ্যের পুনরুত্থান ঘটান আধুনিক যুগে। তার ধর্ম ভাবনা হল 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' ভাবনার বিকাশ। যা মতুয়া ধর্ম নামে খ্যাত। হরিচাঁদ ঠাকুর যে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মাদর্শকে সংস্কার করেন তা আসলে সনাতন ধর্মাদর্শের মার্জিত রূপ। যে সনাতন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল প্রাকঐতিহাসিক কালে। সেই পুরানো দর্শনেরই ধর্মজাগরণ ঘটালেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তগণকে নিয়ে নামসংকীর্ত্তন করতেন সেই সমাজ বাস্তবতাও ছিল দ্বন্দ্ব মুখরিত সমাজ। সেই সমাজ প্রেক্ষাপটেও কর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত না হয়ে আরো দৃঢ় ভাবে কর্ম প্রচেষ্টার বিস্তার ঘটালেন। সেই সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবদর্শকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে দেশ থেকে দেশান্তরে ধর্মবার্তাকে ছড়িয়ে ছিয়েছেন যারা তাদের নাম উল্লেখ করা গেলেও যারা অলিখিত ভক্ত মানুষ ছিলেন তাদের ভূমিকাও ছিল ব্যাপক। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ ও সমাজ গঠনের কর্মাদর্শকে পাথেয় করে মানুষের জাগতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মকর্মাদর্শের দ্বারা আদর্শিত হয়ে তৎকালীন সময়ে যে সকল সমাজ কল্যাণকামী ভক্তগণ সমাজ সেবায়

নিজেদের আত্ম নিয়োগ করেছিলেন তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের যে প্রসার তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় হয়েছিল তার প্রসারতা থাকলেও দেশ বিভাগ জনিত কারণে সেই প্রসারতা মহাসমুদ্রের মত বিস্তার লাভ করল।

১৮১২ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের থেকে মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের নব প্রতিষ্ঠা হয়ে যে ধর্ম ধারার প্রসার ঘটেছে সমাজে তার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে একথা বলতে হয় যে হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের সমাজ জীবনে নবভাবে আত্মচৈতন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠা দিয়ে সমাজকে পূর্ণমানবতা বোধে জাগ্রত করেছেন। 'বাংলার নবজাগরণে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরও 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর' প্রবন্ধে ভবানী শংকর রায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাস্তব সমাজের সত্যিকারের ধর্ম-কর্মদর্শের মূল্যায়ন। তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরলাম—

> ''পৃথিবীতে কখনো এমন অনেক মহামানবের আবির্ভাব ঘটে, যাদের আবির্ভাবে পৃথিবীর গতিধারা মানব কল্যাণে ধাবিত হয়। এই কল্যাণের দ্বারা সূচিত হয় নব জাগরণ। উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত। এই নবজাগরণের দ্বারা সৃষ্টি হয় এক নতুন সমাজ, এক নতুন সংস্কৃতি, তার আলোক প্রভা ছড়িয়ে পড়ে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। এরকমই এক যুগ পুরুষ হলেন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর। ... শ্রীশ্রীহরিচাঁদের এই গার্হস্থ্য দর্শনকে পাথেয় করে জাগতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিলেন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের উত্তর সাধক তৎপুত্র শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর।''[২]

মতুয়া ভক্তদের পরিসংখ্যানগত আলোচনা করেছেন 'মতুয়া দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক সন্তোষকুমার বারুই ২০০৫ সালে। সংখ্যা ছিল চার কোটির উর্ধ্বে। মতুয়া ধর্মের উৎপত্তি বিকাশ ঘটেছে ধর্ম জাগরণের সময়। কিন্তু এর গভীরতার মূল শিকড় গ্রথিত রয়েছে প্রাক্-আর্যকালের সনাতন ধর্মভাবনার মধ্যে। আজকের মতুয়া ধর্মের বিস্তার রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন তেমনি ভাবে বলা যায় মতুয়া ধর্মাদর্শের আদর্শ পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারে। ভবানী শংকর রায়ের উক্তিটিতে মতুয়া ধর্মের মানব সমাজে প্রভাবের বিস্তার পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—''আজ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়া মতুয়াদের সেই আত্মজাগরণের আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্মমর্যাদা লাভের সেই মতুয়া ধর্মান্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে আসমুদ্র হিমাচল থেকে কন্যা কুমারিকা আন্দামান

থেকে আন্নাসাগর সমগ্র বিশ্বের দরবারে।"[৩] মতুয়া ধর্মের প্রভাব বুঝতে পারা যায় সারা ভারতের সর্বজনীন ভক্তগণের শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর শান্তিদেবীর মন্দিরের একটি অসম্পূর্ণ তালিকার মাধ্যমে। আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে মতুয়া ধর্ম যে প্রথম ভক্তির দ্বারাই প্রসারতা পেয়েছে এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের দ্বারা ভক্তি ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানকর্মের সংযোজন হয়। বর্তমান সময়ে মতুয়া ধর্মের কার্যাবলী হয় ধর্ম কর্মাদর্শের সমন্বয়ের দ্বারা। যার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

তথ্যসূত্র :

১. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ইতালীর র‍্যনেশাঁস বাঙালির সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৯৯৪, পৃ.

২. মণ্ডল, প্রবণব, সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের মুখপত্র, মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, ২০১৫, ঠাকুরবাড়ি, ঠাকুরনগর, পৃ. ৩০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

পরিশিষ্ট

সারা ভারতে সর্বজনীন হরি-মন্দির

সাল	প্রধান উদ্যোক্তা
পশ্চিমবঙ্গ	
১. ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি,	প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান উদ্দ্যোক্তা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২. গুঠিয়ার শরিফ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা	মণি গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
৩. কালনা, গঙ্গাঘাট, নদীয়া	মণি গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
৪. কল্যাণী, নদীয়া	মণি গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
৫. অসুরাগড়, উত্তর দিনাজপুর	মণি গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের বৃন্দবৃন্দ।
৬. গলগলিয়া, দার্জিলিং	মণি গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
৭. শিলিগুড়ি, ঠাকুরনগর, জলপাইগুড়ি	বিরেন গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
৮. ইসলামপুর গেন্নাবাড়ি, উত্তর দিনাজপুর	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
৯. সূর্য্যপুর (বরিশাল পাড়া), উত্তর চব্বিশ পরগণা	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ।
১০. টুঙ্গিদিঘি, উত্তর দিনাজপুর	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১১. গৌরাঙ্গনগর, কলকাতা-৫৯	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ।
১২. পাকুয়া, মালদা	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৩. রসাখোয়া, উত্তর দিনাজপুর	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪. গাজোল, মালদা	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৫. কোচবিহার	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৬. দোমহনা, জলপাইগুড়ি	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৭. জনকুড়িয়া, বাঁকুড়া	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ও বিরেন গোঁসাই।

১৮. শ্রীকৃষ্ণপুর, নৈহাটি	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৯. বৃন্দাবন, মথুরা	বিনোদানন্দ গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২০. উদয়পুর, বর্ধমান	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২১. সনেকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা	নিত্যানন্দ গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ।
২২. হাসান, উত্তর দিনাজপুর	কোমল পাগল ও ভক্তবৃন্দ।
২৩. কালনা, নদীয়া	বিরেন গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২৪. খড়গপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	আচার্য কেশবচন্দ্র সরকার ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২৫. বারোদুয়ারী, উত্তর দিনাজপুর	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২৬. রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর	বিরেন গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২৭. পলতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
২৮. গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।

মহরাষ্ট্র

২৯. বিবেকানন্দপুর (মূলচেরা), ১৯৬৯	হরিমোহন রায়, সনাতন গোঁসাই, সুধীর গোঁসাই
৩০. কৃষ্ণনগর (চামরসি), ১৯৭১	মতুয়া সেবা সংঘ
৩১. চন্দ্রপুর বাঙালি, ১৯৮১	ডা. লক্ষ্মণ বর, চিত্ত বর, সুধীর গোঁসাই, ভরত মল্লিক
৩২. কৃষ্ণনগর (চন্দ্রপুর), ১৯৯০	সংঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, গোপাল মণ্ডল
৩৩. বিকাশ পল্লী, ১৯৯৪	বিমল মণ্ডল ও অন্যান্য
৩৪. ক্ষুদিরাম পল্লী (মূলচেরা), ২০০৩	বিমল বালা, অর্জুন বিশ্বাস
৩৫. ৭নং কাঞ্চনপুর (গড়চিরোলী), ১৯৭৫	মহেন্দ্র খরাতি

৩৬. শ্রীরামপুর (মূলচেরা), ১৯৮১ সুবল গাঙ্গুলি

৩৭. গৌরনগর (গন্দিয়া), ২০০৯ ভক্তবৃন্দ

৩৮. ২১৬ মথুরানগর (মূলচেরা) ২০০০ মঙ্গল গোঁসাই

৩৯. ১৭নং দুর্গাপুর (চামরসি), ১৯৮৪ সুধীর গোঁসাই

৪০. ৬নং আড়পল্লী (গড়চিরোলি), ১৯৯২ গোলোক গোঁসাই

৪১. কর্কাপল্লী (চামরসি) প্রবোধ গোঁসাই

৪২. ২১২ কপুর আলি (মূলচেরা) ধীরেন গোঁসাই

৪৩. আস্টিধাম (গড়চিরোলি) সংঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ও মমতা ঠাকুর

৪৪. সুবাসগ্রাম ৩ নম্বর (গড়চিরোলি), ১৯৮০ ধীরেন মণ্ডল, ভীম মণ্ডল

৪৫. গান্ধীনগর (গড়চিরোলি), ২০০৩ মহানন্দ বালা

৪৬. বাহাদুরপুর (গড়চিরোলি) ভক্তবৃন্দ

৪৭. নরেন্দ্রপুর ১ নং (গড়চিরোলি) মহিলা সংগঠন

৪৮. শঙ্করনগর (গড়চিরোলি) ভক্তবৃন্দ

৪৯. গোবিন্দপুর (মূলচেরা) ভক্তবৃন্দ

৫০. পুরনো হাট (গড়চিরোলি) ভগবানবুড়ি

৫১. নাগপুর শহর, ২০১০ ডা. অজিত মল্লিক, সবিতা বিশ্বাস, জগদীশ সিকদার, ডা. সুবোধ বিশ্বাস, সন্তু বিশ্বাস, খোকন বিশ্বাস

উড়িষ্যা

৫২. এম.ভি. ৩৬ (মালকানগিরি), ১৯৬৭ নলিনী চৌধুরী

৫৩. এম.ভি. ৪৯/৫০ (মালকানগিরি), ১৯৭৩ নকুল ঠাকুর, শিবপদ গাইন

৫৪. পাখানজোড় দ্বারা উদঘাটন—মহানন্দ হালদার
উদ্যোক্তা—সরসী রঞ্জন ঠাকুর,
পুলিন ব্রহ্ম, দেবেন মিস্ত্রি

৫৫. পটেরু (মালকানগিরি), ১৯৮৮ হরিচাঁদ সেবা সংঘ, সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে

(স্কুল ছাত্রাবাস সহ)	বিজয়চন্দ্র পাড়ি, শ্রীদামকান্তি বিশ্বাস
৫৬. এম.ভি. ৮৪ (মালকানগিরি), ১৯৮৯	জগা গোসাঁই
৫৭. এম.ভি. ৯০ (ঐ), ১৯৮৯	হরি গোসাঁই
৫৮. এম.ভি. ১৪ (ঐ), ১৯৮৬	দুর্যোধন ঠাকুর, যোগেন বালা
৫৯. এম.ভি. ৩০ (ঐ), ১৯৯০	মণীন্দ্র গোসাঁই
৬০. এম.ভি. ৭৩ (ঐ), ১৯৮৬	সুশীল বিশ্বাস
৬১. নবরংপুর (উমরকোট), ১৯৯৫	বিজয়চন্দ্র পাঁড়ি, রবীন ঠাকুর
৬২. ইউ.ভি. ৫৩ (ঐ), ১৯৯৫	রবীন ঠাকুর
৬৩. রায়ঘর (উমরকোট), ১৯৯৮	ভক্তবৃন্দ
৬৪. কৃষ্ণনগর (ঐ), ১৯৯৯	সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে
৬৫. গোবরধনপুর (খুরদা), ১৯৮৯	সুধীর ঢালী
৬৬. বালিপাটপুর (ঐ), ২০০০	গোসাই নৃপেন ঢালী
৬৭. রামনগর (কেন্দ্রাপাড়া), ১৯৯৯	মতুয়া মহাসংঘ
৬৮. ডি.পি. ক্যাম্প (ঐ), ২০০০	ভক্তবৃন্দ

আন্দামান

৬৯. সি.পি. ঘাট (পোর্টব্লেয়ার), ১৯৯২	মাখন মণ্ডল, বাবু গাইন, গোবিন্দ গোসাঁই
৭০. ৩নং হ্যাভলক বাজার	শৈলেন মিস্ত্রী, বিষ্ণু মিস্ত্রী, মালাকারবাবু
৭১. ডিগলিপুর, বালিঘাট	ভক্তবৃন্দ
৭২. হরিনগর, ১৯৭৪	গুরুপদ বিশ্বাস, অরুণবাবু
৭৩. কদমতলা (দঃ আন্দামান), ১৯৬৮	গুরুপদ বিশ্বাস, অরুণবাবু
৭৪. লেবুডেরা (উঃ আন্দামান), ১৯৭৬	ভক্তবৃন্দ
৭৫. ডিগলিপুর (ঐ), ১৯৬৮	ভক্তবৃন্দ
৭৬. গুপ্তপাড়া (দঃ আন্দামান), ১৯৬৩	গোকুল বৈরাগী, পূর্ণ বৈরাগী
৭৭. গোলবাড়ী (ঐ)	সুখোই বৈদ্য, কালাচাঁদ বৈদ্য
৭৮. হার্ট বে ১৬ নং (লিটল আন্দামান)	ভক্তবৃন্দ
৭৯. হার্ট বে ২২নং (ঐ)	ভক্তবৃন্দ

৮০. হার্ট বে ২৮নং (ঐ)	ভক্তবৃন্দ

আসাম

৮১. বিজনী (থিরাং) মন্দির ও ছাত্রাবাস)	ডাঃ সুধীর কুমার বাগচী ও ভক্তবৃন্দ
৮২. বড়পেটা (মন্দির ও কয়েকটি বিদ্যালয়)	ডাঃ সুধীর কুমার বাগচী
৮৩. তরুণ গাঁও (কাউলি, বাকসা), ১৯৯২	সন্তোষ ঠাকুর, হরেন বিশ্বাস, রবিন বিশ্বাস
৮৪. বদ্রী (ঐ), ২০০০	ভক্তবৃন্দ
৮৫. হুজাই (নওগাঁও)	ভক্তবৃন্দ

ছত্তিশগড়

৮৬. পাখানজোড়া (কাংকের), ১৯৭০	সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে ও ভক্তবৃন্দ
৮৭. বান্দে (ক্যাংকের), ১৯৮৮	রবীন গোসাঁই, জমিদাতা দিলীপ মণ্ডল, আচার্য বিজয়চন্দ্র পাঁড়ি
৮৮. ৮২ নং বান্দে (ঐ), ২০০০	রবিন গোসাঁই
৮৯. রাধাকৃষ্ণনগর (বলারামপুর), ১৯৮০	ভক্তবৃন্দ
৯০. আজবনগর (সরগুজা)	কিরণ ঠাকুর
৯১. মানা ক্যাম্প (রায়পুর), ১৯৬০	কালাচাঁদ গোসাঁই
৯২. কোর্বাশহর, ১৯৬৫	ভক্তবৃন্দ
৯৩. ভানসি (বয়লা ডিলা), ১৯৯৫	ধীরেন গোসাঁই
৯৪. কিরণডুল (ঐ), ১৯৮৮	বিজয় চন্দ্র পাড়ি, কে.সি. মণ্ডল, মহাদেব মণ্ডল
৯৫. জগদলপুর বাঙালি কলোনী, ১৯৯৫	জগদীশ মণ্ডল, সহদেব মণ্ডল, বিজন গোঁসাঁই, বিজয় চন্দ্র পাঁড়ি
৯৬. লাইনপাড়া, সুকমা, ২০০৯	বিজয় চন্দ্র পাঁড়ি, শ্রীদাম বিশ্বাস, রবীন বালা
৯৭. বোর্গা (কাণ্ডা), ২০০৯	বিজয়চন্দ্র পাঁড়ি, প্রকাশ রায়
৯৮. ধরমজয়গড় (রায়গড়), ২০০৯	নিখিল মণ্ডল, ননী গোপাল মণ্ডল
৯৯. দীনেশপুর (উধমসিংনগর), ১৯৮৪	গোপাল মহারাজ, অশ্বিনী মণ্ডল, জমিদাতা

	বিজয় মণ্ডল, রঞ্জিত মালাকার, সুধন্য গোসাঁই, অন্নদা গোঁসাই ললিত মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন রাহা
১০০. ২নং শক্তি ফার্ম (মন্দির ও স্কুল) ১৯৮৯	ডাঃ সুশীল মল্লিক ও গোপাল মহারাজ
১০১. গুরুগ্রাম (উধম সিং নগর), ১৯৭১	গোপাল মহারাজ
১০২. ভীম গোদা, হরিদ্বার, ১৯৯৫	গোপাল মহারাজ
১০৩. রতন ফার্ম (উধমসিংনগর), ১৯৮৮	সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শরৎ সরকার, জমিদাতা প্রফুল্লবাবু, বিজয় বিশ্বাস, গোপাল মহারাজ
১০৪. অরবিন্দ নগর (উধম সিং নগর) ১৯৭১	গোপাল মহারাজ
১০৫. রুদ্রপুর (ঐ), ১৯৮১	রাজ্যেশ্বর গোস্বামী, চণ্ডী গোঁসাই
১০৬. হরিদ্বার, ১৯৯৫	গোপাল মহারাজ, দক্ষিণাদেবী, বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারী, ললিত ব্রাদার্স (কলকাতা)

<u>উত্তরপ্রদেশ</u>

১০৭. তাণ্ডা কলোনী, পিলভিট	রাজ্যেশ্বর গোসাঁই
১০৮. বৃন্দাবন, মথুরা, ১৯৬৯	গোকুলানন্দ মহারাজ
১০৯. গোবিয়া সবাই (পিলভিট), ২০০০	গোপাল মহারাজ
১১০. মালা কলোনী, ১৯৭১	গোপাল মহারাজ
১১১. হস্তিনাপুর	মনোহর গোসাঁই
১১২. গোয়েল ফার্ম (মানা, পিলভিট), ১৯৯১	ভক্তবৃন্দ ও গোপাল মহারাজ
১১৩. বাঙালি কলোনী (হস্তিনাপুর), ১৯৯৭	গোপাল মহারাজ
১১৪. গোল ফার্ম (পিলভিট), ২০১০	বিপ্লব গোসাঁই
১১৫. কুলিয়া (বেরিলি)	ডাঃ বিজয়পাল
১১৬. কৃষ্ণনগর কলোনী (বহরাইচ), ২০০৯	ভক্তবৃন্দ

১১৭. চাঁদপুর কলোনী, বিজনোর, ২০০৭ গোপাল মহারাজ

দিল্লি

১১৮. জে.জে. কলোনী (পালাম), ১৯৯০ সাধুরাম গোসাঁই

১১৯. গুরগাঁ, ২০০৬ ডাঃ সুশীল মল্লিক ও চাঁদসী ৬য়েল ফেয়ার এ্যাসোঃ

১২০. জয় বিহার (নবাবগড়) ডাঃ নিরঞ্জন রায় ও ডাঃ সুশীল মল্লিক

১২১. খাদর (বদরপুর), ২০০৬ মতুয়া মহাসংঘ

১২২. কালকাজি, ১৯৮৫ বাবুরাম বিশ্বাস

১২৩. সুলতানপুর, ২০০১ মতুয়া মহাসংঘ ও চাঁদসী এ্যাসো;

রাজস্থান

১২৪. নেহরুপুরা (বারান), ১৯৭১ সুশান্ত পাগল ও ভক্তবৃন্দ

১২৫. খুশিয়া নাটাই (ঐ) মণীন্দ্র গোসাঁই

১২৬. দাদাবাড়ি, উড়িয়াবস্তি (কোটা), ২০০৬ বীরেন বালা

১২৭. মেবার গোপাল মহারাজ

কর্ণাটক

১২৮. ৩নং বাঙালি কলোনী (রায়চুর) ধীরেন মণ্ডল, রসিক মণ্ডল

১২৯. ২০১১ (ঐ), ২০০৫ কৃষ্ণ সর্দার, মধু সর্দার

মধ্যপ্রদেশ

১৩০. বাঙালি কলোনী, হাবিবগঞ্জ (ভূপাল), ১৯৯০ ভক্তবৃন্দ

১৩১. চাপনা, বেতুল, ২০১০ নাটুমোহন সরকার, চৈতন্য রায় জমিদাতা- নিখিল মিত্র

১৩২. শীফল পাটি, চোপনা, ২০১১ ভক্তবৃন্দ

১৩৩. বেতুল, ২০৮ গোপাল মহারাজ

বিহার

১৩৪. পরশুনি বাঙালি কলোনী (পঃ চম্পারণ), ১৯৯০	সুধাংশু গোসাঁই

ত্রিপুরা

১৩৫. পশ্চিম সকদী, ১৯৪১	দ্বার উদঘাটন— গোপাল সাধু উদ্যোক্তা—হেমচন্দ্র সরকার, গগন সরকার
১৩৬. টুরগী, ১৯৪১	দ্বার উদঘাটন—গোপাল সাধু উদ্যোক্তা—পণ্ডিত গগন চন্দ্র তালুকদার

বাংলাদেশের সার্বজনীন হরিমন্দিরের তালিকা

১৩৭. ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি, ফরিদপুর	শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৩৮. জয়পুর, ফরিদপুর	কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৩৯. আমতলী, বরিশাল	হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪০. কালীনগর, গোপালগঞ্জ	মৃত্যুঞ্জয় গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪১. মাটিয়ার গাতি, খুলনা	মৃত্যুঞ্জয় গোঁসাই ও হরিচাঁদের ভক্তবৃন্দ।
১৪২. গঙ্গাচর্ণা	শ্রীঅশ্বিনী গোঁসাই ও হরিচাঁদের ভক্তবৃন্দ।
১৪৩. লক্ষ্মী খালি, খুলনা	গোপাল সাধু ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪৪. পিপড়ের ডাঙা, বাগের হাট	নিত্যানন্দ গোঁসাই ও হরিচাঁদের ভক্তবৃন্দ।
১৪৫. দিগঙ্গা, বাগের হাট	মধু গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪৬. জয়খাঁ, বাগের হাট	বিনোদ গোঁসাই, হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪৭. দিগঙ্গা, বাগের হাট	পরাণ গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ।
১৪৮. কাতলি, বাগের হাট	নিবারণ গোঁসাই ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ।

সারা ভারতের সর্বজনীন হরিমন্দিরের একটি তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সারা ভারতে মতুয়া ভক্তগণের পরিচয় গ্রহণ করার জন্য। বাংলাদেশের সর্বজনীন হরিমন্দিরের তালিকার সূচনা করলাম মাত্র। সারা বাংলাদেশের মতুয়া ভক্তগণের পরিচয় গ্রহণের জন্য। সব জায়গায় হরিমন্দিরের সন্ধান করতে পারি নি। যথাসাধ্য চেষ্টায় এরূপ একটি মতুয়া ভক্তগণের হরিমন্দিরের তালিকা দিলাম।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মকর্ম ভাবনার সহায়ক ব্যক্তিগণের জন্ম সাল ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর প্রতিষ্ঠা কালকে উল্লেখ করলাম—

১. ১৮১২ খ্রীঃ ১১ই মার্চ (১২১৮ বঙ্গাব্দ ১৯শে ফাল্গুন) বুধবার, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সাফলাডাঙা গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম।

২. ১৮২০ খ্রীঃ (১২২৬ বঙ্গাব্দ) কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন শান্তিদেবীর (ডাক নাম আদুরী) জন্ম।

৩. ১৮৩০ খ্রীঃ (১২৩৭ বঙ্গাব্দ) মতুয়া খ্যাতি লাভ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ।

৪. ১৮৪৪ খ্রীঃ (১২৫২ বঙ্গাব্দের ১৫ই অগ্রহায়ণ) শ্রীমৎ তারক সরকারের জন্ম হয় যশোর জেলার জয়পুর গ্রামে।

৫. ১৮৪৫ খ্রীঃ (১২৫৩ বঙ্গাব্দ) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৬. ১৮৬৬ খ্রীঃ (১২৭৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের পুত্র শশিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন।

৭. ১৮৬৭ খ্রীঃ (১২৭৫ বঙ্গাব্দ) 'শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ চরিত্র সুধা' গ্রন্থের লেখক শ্রীমৎ বিচরণ পাগল জন্মগ্রহণ করেন।

৮. ১৮৭২ খ্রীঃ (১২৮০ বঙ্গাব্দ) মহারত্ন অশ্বিনী গোসাঁই জন্মগ্রহণ করেন।

৯. ১৮৭৮ খ্রীঃ (১২৮৬ বঙ্গাব্দ) শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর মানব লীলা সম্বরণ করেন।

১০. ১৮৬৭ খ্রীঃ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর ২২টি বাণিজ্য নৌকা গঠন করে নৌকার চালানি ব্যবসা শুরু করেন।

১১. ১৮৭৮ খ্রীঃ (১২৮৬ বঙ্গাব্দ) গোলক পাগল মর্তভূমি ত্যাগ করেন।

১২. ১৮৭৮ খ্রীঃ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে মহাবারুণী মেলা শুভ সূচনা ঘটে।

১৩. ১৮৭৯ খ্রীঃ (১২৮৭ বঙ্গাব্দে) গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে ও ভক্তগণকে নিয়ে প্রথম শিক্ষা নিকেতন হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৪. ১৮৮৯ খ্রীঃ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উন্নীত করেন বিদ্যালয়ে।

১৫. ১৮৮১ খ্রীঃ (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) খুলনা জেলার দত্ত ডাঙ্গায় ঈশ্বর গাইনের বাড়িতে আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সামাজিক সার্বিক কল্যাণের জন্য বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। সামাজিক উন্নতির আলোচনার বিষয় ছিল—মানুষের কৃষির উন্নতি, ব্যবসার উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষায়তন গঠন। সেই সভায় গুরুচাঁদ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন এবং শিক্ষার জন্য সকলের সম্মিল্লিত কর্ম প্রয়াসের ডাক দেন।

১৬. ১৮৯৮ খ্রীঃ (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত রচয়িতা আচার্য মহানন্দ হালদার খুলনা জেলার বেতকাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৭. ১৯০০ খ্রীঃ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) কবিরসরাজ তারকচন্দ্রের 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন' সংগীত গ্রন্থটির প্রকাশিত হয়।

১৮. ১৯০২ খ্রীঃ গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র প্রথমরঞ্জন ঠাকুরের জন্ম হয় ওড়াকান্দিতে।

১৯. ১৯০৪ খ্রীঃ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) শ্রীমৎ গোপাল সাধু কৃপাসিদ্ধ হন।

২০. ১৯০৬ খ্রীঃ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) ডাঃ সি.এস. মীড্ ওড়াকান্দি আসেন।

২১. ১৯০৭ খ্রীঃ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক হন আদিত্যকুমার চৌধুরী ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২২. ১৯০৭ খ্রীঃ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের পুত্র শশিভূষণ ঠাকুর সাব রেজিষ্টারের চাকরি পান।

২৩. ১৯০৮ খ্রীঃ গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় হয়।

২৪. ১৯০৮ খ্রীঃ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর প্রসূতি মা ও শিশু সেবার জন্য মাতৃমঙ্গল চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

২৫। ১৯১০ খ্রীঃ নমঃজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন।

২৬. ১৯১১ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সমাজসেবার জন্য 'মেডেল' প্রদান করেন।

২৭. ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের কাছে মানুষের উন্নয়নের জন্য শিক্ষায়তন গঠনের ও শিক্ষার জন্য দাবি পেশ করেন এবং স্যামুয়েল ন্যাথান সাহেবের সহযোগিতায় ১০৬৭ টি বিদ্যালয় গড়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর।

২৮. ১৯২৬ খ্রীঃ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) নোয়াখালির নমঃশূদ্র সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের নেতৃত্ব করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর।

২৯. ১৯৩১ খ্রীঃ প্রমথরঞ্জন ঠাকুর কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীতে যোগদান করেন।

৩০. ১৯৩২ খ্রীঃ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর 'হরিগুরু চাঁদ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

৩১. ১৯৩৪ খ্রীঃ প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বরিশাল জেলার জব্দকাঠি গ্রামের আনন্দ সরকারের তৃতীয়া কন্যা বীণা পাণি দেবীকে বিবাহ করেন।

৩২. ১৯৩৭ খ্রীঃ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর প্রয়াত হন। এবং কোলকাতার এলবার্ট হলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

৩৩. ১৯৪০ খ্রীঃ প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে 'মতুয়া মহাসংঘ' গঠিত হয়।

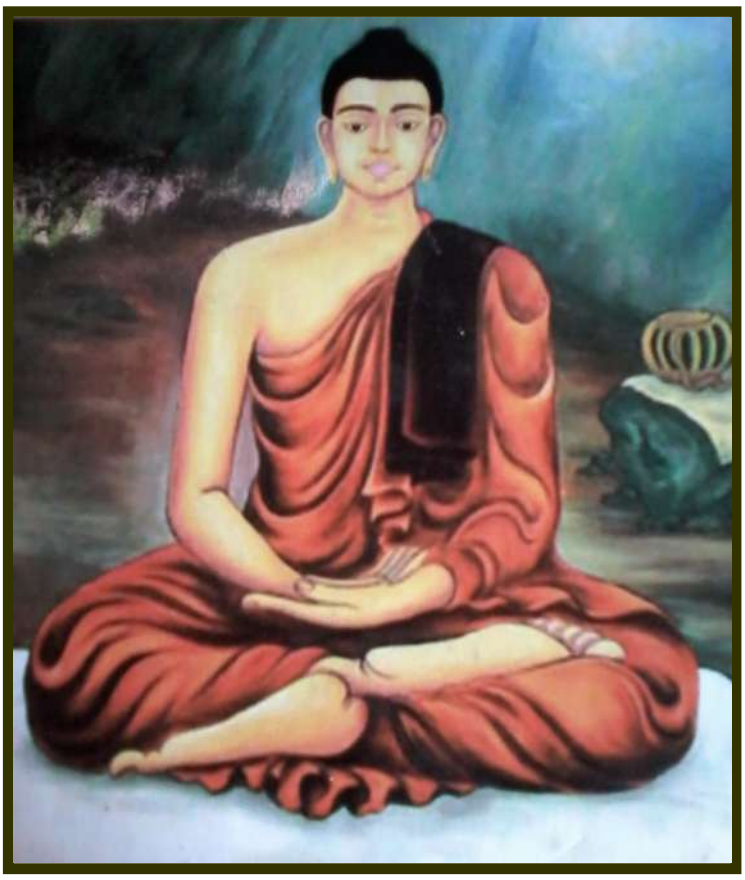

কাশ্যপ মুনি ‘কাশ্যপ মুনির বংশ গোত্রজ কাশ্যপ’

গৌতমবুদ্ধ

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর

মহাবারুণী স্নান (ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা)

বাংলাদেশের ওড়াকান্দির মূল মন্দির

সাফলাডাঙায় শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মবাড়ি

ওড়াকান্দির শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক কামনা সাগরে বারুণীতে স্নান

ওড়াকান্দির ঠাকুর বাড়িতে ভক্তগণের নামকীর্ত্তন

মণিন্দ্র গোঁসাই। ইনি উত্তর দিনাজপুর জেলার অসুরাগড়ে মহাবারুণী পালন করেন

ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়িতে ভক্তগণের শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি মহাবারুণীতে যাত্রা

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর ঘট স্থাপনের চিত্র

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর ও সত্যভামাদেবী

শ্রীমৎ গোপাল সাধু ও সহধর্মীণি কাঞ্চনদেবী

আচার্য শ্রীমহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা

শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর

বড় মা শ্রীমতি বীণাপাণিদেবী

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও জগৎ মাতা শান্তিদেবী

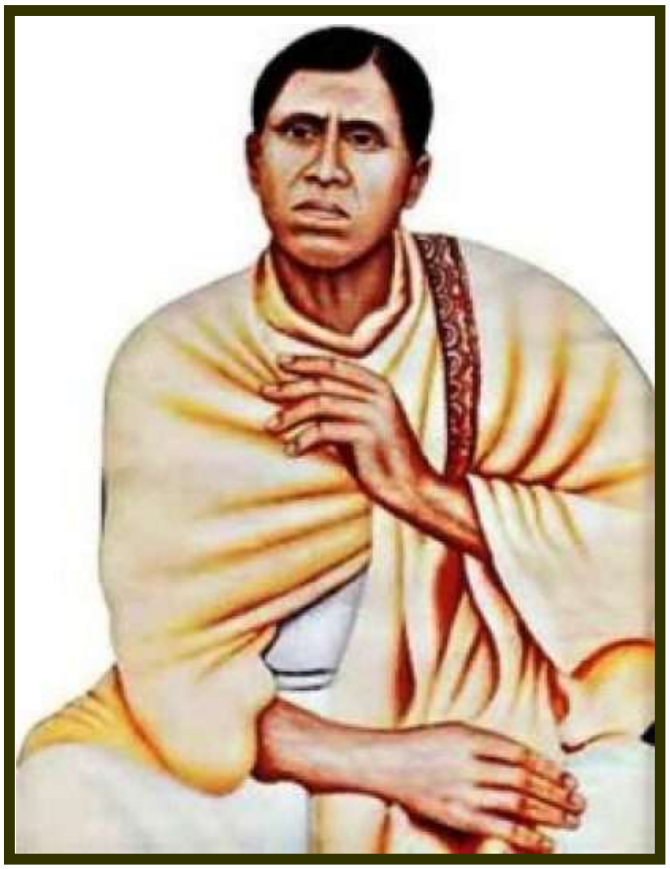

রাজর্ষী শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, মতুয়া সংঘাধিপতি

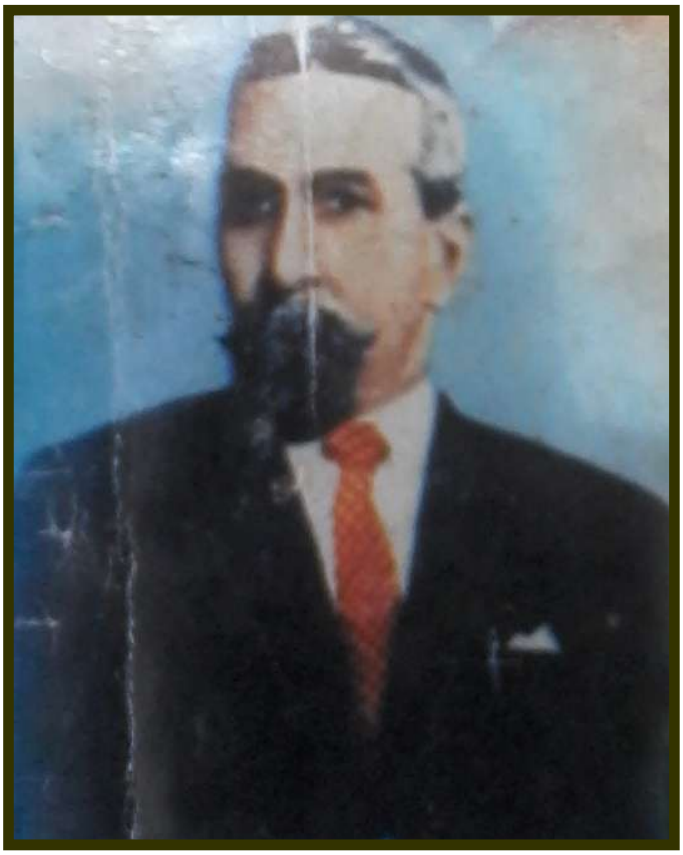

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার কর্মের প্রধান সহায়ক ড. সি. এস. মীড সাহেব

মহারত্ন শ্রীঅশ্বিনীকুমার সরকার, শ্রীশ্রীহরিসংগীত রচয়িতা

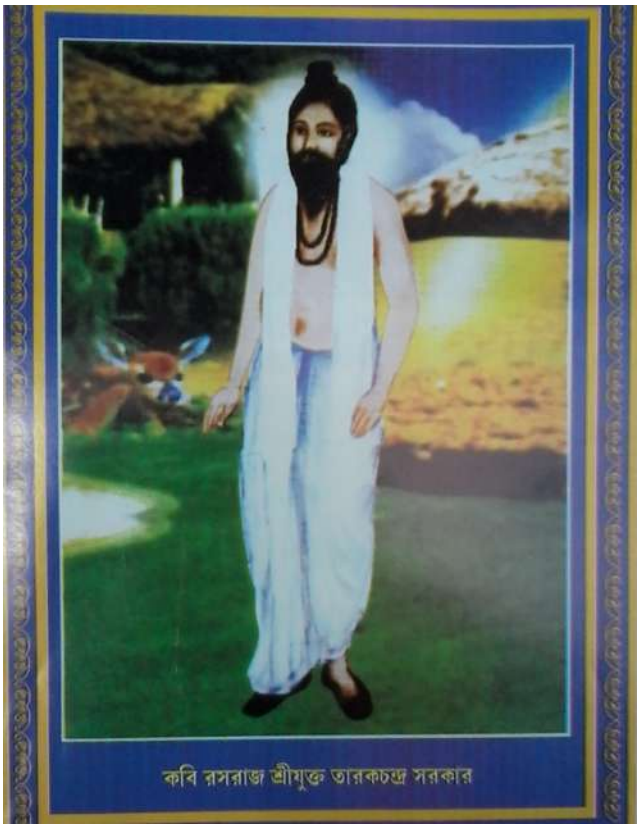

কবিরসরাজ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আকর গ্রন্থ :

১. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

২. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা, আমতলী, বরিশাল, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

৩. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ঠাকুরনগর, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, ২০০৫ সাল,

৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, গোপালগঞ্জ, শ্রীধাম ওড়াকান্দি, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

৫. সরকার, শ্রীঅশ্বিনীকুমার, শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত, দ্বাবিংশতিতম সংস্করণ, বারুণী মহামেলা, ঠাকুরনগর, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, ২০১০,

৬. সাধু ঠাকুর, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ ভক্ত চরিত, প্রথম প্রকাশ, শুভ মহাবারুণী, শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ,

৭. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮।

খ. বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. কথিত, শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, পরিমার্জিত সংস্করণ, শুভম, ৭, শ্যামাচারণ, দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭৩, ২০১১।

২. ঘোষ, বিনয়, বাংলার নবজাগৃতি, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৭২, ১৯৮০।

৩. ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, তৃতীয় প্রকাশ, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, অক্টোবর, ২০০৯।

৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ভারত সংস্কৃতি, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৪০০।

৫. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পাদক), শৈলী চিন্তাচর্চা, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০৩।

৬. চক্রবর্তী, সুবোধ, ভারতের সাধক সাধিকা, প্রথম প্রকাশ, কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, ১৪০০ সন।

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, চতুর্থ প্রকাশ, জানুয়ারি, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৩-এ, রামবিহারী অ্যাভিনেউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ২০০৩।

৮. চৌধুরী, ড. দুলাল (সম্পাদক), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, প্রথম প্রকাশ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা-৭০০০৯৪, ২০০৪।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী ১২ খণ্ড, মানুষের ধর্ম, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮।

১০. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ইতালীর র‍্যনেশাঁস বাঙালির সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৯৯৪।

১১. দাস, বৃন্দাবন, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, কলিকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, জানুয়ারি, ১৯৯৫।

১২. নীতিশ, বিশ্বাস ও হালদার, জগদীশ (সম্পাদক), শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন, বিজয় বুক স্টল, ৮৮ এম.জি. রোড।

১৩. প্রভুপাদ, কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণার বিন্দ, ভক্তি বেদান্ত স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, অষ্টম সংস্করণ, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, কলিকাতা, ২০০০।

১৪. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, পুস্তকবিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০০।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পরিবর্ধিত সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৯-২০১০।

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩,

২০০৬-২০০৭।

১৭. বিরচিত, কৃত্তিবাস পণ্ডিত, সপ্তকাণ্ড, রামায়ণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

১৮. বিশ্বাস, ড. মণীন্দ্রনাথ, গুরুচাঁদের প্রত্যক্ষ শিক্ষা, প্রথম সংস্করণ, চাকদহ, নদীয়া, ২০১১।

১৯. বিশ্বাস, কবি শ্রীপ্রভাসেন্দু, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের পাঁচালী, ওড়াকান্দি, গোপালগঞ্জ, আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

২০. বিশ্বাস, ড. মণীন্দ্রনাথ, হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর ধর্ম ভাবনা, প্রথম সংস্করণ, হরিগুরুচাঁদ মিশন, চাকদহ, নদীয়া, ২০১৬।

২১. বিশ্বাস, ড. মণীন্দ্রনাথ, মতুয়াগীতি, প্রথম প্রকাশ, চাকদহ, নদীয়া, ২০১৩।

২২. বিশ্বাস, ড. মণীন্দ্রনাথ, হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত, প্রথম প্রকাশ, লালপুর, চাকদহ, নদীয়া, জানুয়ারি, ২০১১।

২৩. বৈরাগী, মনিমোহন, অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরাও তাদের ধর্ম ভাবনা, তৃতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩ই মার্চ, ২০১৪।

২৪. বৈরাগী, মনিমোহন, অনালোকিত ইতিহাসের উত্থান-পতনে কাশ্যপ মুনির বংশধর 'নমঃজাতি', প্রথম প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ৮ই অক্টোবর বুধবার, ২০১৪।

২৫. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়াধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ই মার্চ রবিবার, ২০১২।

২৬. বৈরাগী, মনিমোহন, এক অভিন্ন অবৈদিক সনাতানী দর্শন বৌদ্ধ ও মতুয়া দর্শন, তৃতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, বুধবার, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩।

২৭. বৈরাগী, মনিমোহন, বৌদ্ধ ও মতুয়া ধর্মের আলোয় অবৈদিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, বুধবার, ২৫ শে জুলাই ২০১২।

২৮. বিদ্যা বিনোদ, শ্রীকালিকিশোর, অনুবাদিত, শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, সম্পাদনা শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-৭০০০০১, রাজ সংস্করণ।

২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত (১ম ও ২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯, ২০০৫।

৩০. ভক্তদাস, কবি সম্পাদিত, বৃহৎ সচিত্র বিষ্ণুপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী ৭৯/১ এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, জুন, ২০০৯।

৩১. ভারতী, শ্রীচৈতন্য, মতুয়া দর্পণ, শ্রীশ্রীপূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদ ঠাকুর, সম্পাদক, শ্রীঅনিল বিশ্বাস, বেতাই, নদীয়া।

৩২. মিত্র, উপেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীমদ্ভাগবত, দেশ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৪০৩।

৩৩. মহারাজ, আচার্য কেশবচন্দ্র (সম্পাদনা), হরিগুরুচাঁদ শান্তি মিশনের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব মতুয়া সম্মেলন উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ, ১০ই নভেম্বর, ২০১১, মতুয়া মহাসংঘ, শ্রীধাম ঠাকুরনগর।

৩৪. মোহান্ত, ড. নন্দদুলাল, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রথম প্রকাশ, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ৩৬, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, মার্চ, ২০০২।

৩৫. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন, ১৪১৫।

৩৬. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৭।

৩৭. শ্রীনাভাজী রচিত, বৃহৎ শ্রীশ্রীভক্ত মালগ্রন্থ, বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী, ১৬৭ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৯, মে, ২০০৯।

৩৮. শাস্ত্রী, শিবনাথ, আত্মচরিত, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৩।

৩৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, নবম সংস্করণ, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৯।

৪০. সরকার, ড. সুধাংশুকুমার, উত্তরবঙ্গে নমঃশূদ্র সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, এন.এল. পাবলিশার্স, পশ্চিমবঙ্গ, ১২ জানুয়ারি, ২০১৩।

৪১. সিকদার, রণজিৎকুমার (সম্পাদক), আম্বেদকর রচনাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢালুয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ১৯৯৬।

৪২. সুর, ড. অতুল, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, নভেম্বর, ২০০৮।

৪৩. সুর, অতুল, ভারতের বিবাহের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০।

৪৪. সেন, সুকুমার ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, এপ্রিল, ২০০৪।

৪৫. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীশান্তিমায়ের পাঁচালী ও ব্রতকথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওড়াকান্দি, গোপালগঞ্জ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

৪৬. হালদার, গোপাল, সংস্কৃতির রূপান্তর, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৩৫১।

গ. বাংলা পত্র-পত্রিকা :

১. বারুই, শ্রীসন্তোষকুমার (সম্পাদক), মতুয়াদর্পণ, ২০০৫।

২. বিশ্বাস, নীতিশ (সম্পাদক), ঐক্যতান সংবাদ মতুয়া আন্দোলন সংখ্যা, ঐক্যতান, ডি. এল. ২৪৪/ডি, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, ২০১১।

৩. বিশ্বাস স্বপনকুমার (সম্পাদক), মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, ৬২-তম সংখ্যা, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৯।

৪. বারুই, শ্রীসন্তোষকুমার (সম্পাদক), মতুয়াদর্পণ, ৪৩ সংখ্যা, ২০১০।

৫. মণ্ডল, প্রণব (সম্পাদনা), সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের মুখপত্র, মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, ২০১৫, ঠাকুরবাড়ি, ঠাকুরনগর।

৬. সরকার, আচার্য কেশবরঞ্জন (সম্পাদক), শ্রীহরি যুগদিশা, যুগ্ম সংখ্যা (২০১২-২০১৩) , বিশ্ব হরিগুরুচাঁদ মিশন।

৭. সরকার, মহারাজ কেশবরঞ্জন (সম্পাদক), বিশ যুগদিশা, বিংশতি সংখ্যা, ২০১১।

৮. সরকার, ড. সুধাংশুকুমার (সম্পাদক), চতুর্থবার্তা, ২০১৩।

৯. সরকার, ড. সুধাংশুকুমার (সম্পাদক), চতুর্থবার্তা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২।

১০. সরকার, ড. সুধাংশুকুমার (সম্পাদক), চতুর্থবার্তা, ২০১৭।

১১. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মে, ১৩৩৬।

নির্ঘন্ট

গ্রন্থ নাম

অ— অনালোকিত অতীত ইতিহাসের উত্থান পতনে কাশ্যপ মুনির বংশধর নমঃজাতি : ৪৫

অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা : ৫১, ২৩৫

অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম : ২১২

অগ্নি পুরাণ : ১৩

আ— আরণ্যক : ১২

উ— উপনিষদ : ১২, ৪২

গ— গুরুচাঁদ ঠাকুর : ৫, ৭, ১১, ১৬, ৫০, ৫১, ২১৪, ২১৭, ২৩০, ২৪৩, ২২৯, ২৪৫, ২৪৬, ২৬৩, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৮৭, ২৯৮, ৩০২

গৌতম ধর্মশাস্ত্র : ১২

গীতা : ১৩, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৪

গরুড় পুরাণ : ১৩

প— পদ্ম পুরাণ : ১৩, ২৩

ব— বরাহ পুরাণ : ১৩

	বাঙালীর ইতিহাস	:	৪৭, ৭৩
	বায়ু পুরাণ	:	১৩
	বিষ্ণু পুরাণ	:	১৩
	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ	:	৪৭
	বৃহৎ ভক্তমাল গ্রন্থ	:	২৬৬, ২৬৭
	বৌদ্ধধর্ম	:	২৩১
	বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা	:	২, ৬৩
	বাংলার নবচেতনার ইতিহাস	:	৬৩, ২৩৮, ২৪৫
ভ—	ভারতের সাধক সাধিকা	:	২৬৪, ২৬৫, ২৬৬
	ভবিষ্য পুরাণ	:	১৩
	ভাগবত	:	৬
	ভারত সংস্কৃতি	:	৩২, ৩৩
	ভারতীয় আর্য-সাহিত্যের ইতিহাস	:	৪০, ৪১
	ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	:	৩৬, ৩৮
ম—	মহাভারত	:	৪, ১৩, ২২, ২৬, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২
	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	:	১৩
	মৎস পুরাণ	:	১৩
	মনসামঙ্গল	:	২২
	মনুসংহিতা	:	১৩
শ—	শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত	:	২, ৩, ৫, ৬, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২৬, ২৭, ৪৪, ৫৩, ৬৫, ৭১, ৭৩, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৮, ১০৪, ১১৩, ১১৬, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১৫১, ১৫৪

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ নৃত্য পূজাবিধি : ১০৫
শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা : ২৪১, ২৭৭, ২৭৮
শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন : ১০৭, ১৫৭, ২৬৩, ২৬৭, ২৮৫
শ্রীশ্রীহরিসংগীত : ১০৭, ২৬৩, ২৬৭, ২৮১
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম : ১১৪, ২০৪, ২৫৩, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৮
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত : ৫, ৭, ১১, ১৬, ৫০, ৫১, ৭৮, ২১৪, ২১৭, ২৩০, ২৪৩, ২৩৯, ২৪৫, ২৪৬, ২৬৩, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৮৭, ২৯৮

ব্যক্তিনাম :

অ— অশ্বিনী গোঁসাই : ১০৭, ১০৮, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৭, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪
অম্বিকাচরণ : ২৪৬, ২৫৫
অভিজিৎ সেন : ৫২

আ— আচার্য মহানন্দ হালদার : ৭, ১১, ১৬, ৫১, ১৫৭, ২১৬, ২১৪, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৯, ২৪৬, ২৪৯, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৭, ২৭২, ২৭৪, ২৭৬
আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : ৩২, ৩৩, ৩৪

ক— কবিরসরাজ তারকচন্দ্র : ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ২৫, ২৭, ৪৪, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৮, ১৬১, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৮৪, ২৮৬

	কবীর	:	৪
	কৃত্তিবাস ওঝা	:	৪১
	কাশীরাম দাস	:	৪১
	কৃষ্ণদাস	:	১৫, ১৬, ৫৮
	কালিদাস	:	১৫, ১৬
গ—	গোবিন্দ মতুয়া	:	১৩১
	গোলক গোস্বামী	:	১০২, ১০৫, ১০৭, ১৪৬, ২৯৪, ২৯৫
চ—	চৈতন্যদেব	:	৪, ৩৯, ৫৩, ৫৪
জ—	জগদীশচন্দ্র বসু	:	৩০
ড—	ড. অতুল সুর	:	৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৬
	ড. নীহাররঞ্জন রায়	:	৪৭, ৪৮, ৪৯, ৭৪
	ড. পরমানন্দ হালদার	:	২৮১
	ড. সুকুমার হালদার	:	৮৪
	ড. সি.এস. মীড	:	২০৫, ২০৬, ২১৮, ২৪০, ২৪৪
	ড. সুকুমার সেন	:	৪০, ৪২, ৪৩
দ—	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	১
	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	:	২৪৬, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯
ব—	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	:	৩০, ৪৫
	বুদ্ধদেব	:	৪, ১২, ৩৫, ২৩০

	বদন ঠাকুর	:	১৩১, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১
ম—	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	:	৩০
	মনিমোহন বৈরাগী	:	৪৫, ৫১
	মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস	:	১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ২৯১, ২৯২, ২৯৭
	মিসটাক	:	২১৮
	মিস টমসন	:	২১৮, ২১৯
	মহানন্দ	:	১০২, ১০৬
	মহাত্মা গান্ধী	:	২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯
য—	যশোবন্ত	:	৬, ৭, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৭৮, ১৪২
র—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	৩০, ৫৩, ২৮৫
	রমাপ্রসাদ চন্দ্র	:	৫২
	রামকান্ত বৈরাগী	:	৫৮, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০
	রামভরত মিশ্র	:	২৯১, ২৯৬
	রুদ্র মণ্ডল	:	২৯১
	রামদাস	:	১৪, ১৫
	রাজনারায়ণ বসু	:	১
	রাজা রামমোহন রায়	:	১
শ—	শশীভূষণ ঠাকুর	:	৭, ১১, ১৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮,

২৬৭, ৩০২

শান্তিদেবী : ৮, ৯, ৫৫, ৭১, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১১৭, ২০৩, ২০৪, ২২৯, ২২৭, ২৯৪, ২৯৫

হ— হরিচাঁদ ঠাকুর : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৪৪, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ২১৬, ২২৭, ২২৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৮, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৯, ৩০১, ৩০৪

স্থান নাম :

আ— আরোকান্দি : ৮৭

ও— ওড়াকান্দি : ২, ১৭, ৭২, ২৬৩, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭৩, ২৭৮

ক— কলকাতা : ৩০, ৬৮

খ— খুলনা জেলা : ২০৯

ঘ— ঘৃতকান্দি : ২১৪

জ— জয়পুর : ২২৭, ২৬৮

ফ— ফরিদপুর : ৫, ১৯

প— পূর্ববঙ্গ : ২০২

দ— দত্তডাঙা : ২০৯, ২১৪

ব— বাংলাদেশ : ৩৬, ৪৭, ৫৩, ২১০

স— সাফলাডাঙা : ৫, ১৭, ১৯, ৭১, ৭৯

ভ— ভারত : ১, ২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪২

শ— শ্রীচন্দ্রশেখর : ১৪

র— রাউৎখামার : ৮০, ৮৮, ১৫৮

ল— লক্ষ্মীপাশা : ১৪

ISSN 2319 - 1325
Issue: V & VI
Vol: X & XI

চতুর্থবার্তা

সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা

সম্পাদক

ড. সুধাংশু কুমার সরকার

মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতিবাদী কণ্ঠ : প্রসঙ্গ সমাজ ও শিক্ষা ভাবনা

স্নিগ্ধা মণ্ডল

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার নিটোল বর্ণনা করেছেন সুবোধ চক্রবর্তী তাঁর 'ভারতের সাধক সাধিকা' গ্রন্থের মধ্যে। এখানে তিনি একএক জন মহামানবের আবির্ভাবের পটভূমি বর্ণনা করে তাঁর আর্বিভাবের যথাযোগ্য সময় নির্ধারণ করেছেন। সুবোধ চক্রবর্তী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটটি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ। ভারতের বুকে ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ধর্মোন্মাদের দম্ভ ও আস্ফালন। অপরিসীম ঘৃণা ও অবহেলা মানুষে মানুষে রচনা করেছে বিভেদ ও বিসংবাদ। ধর্ম আবদ্ধ হয়েছে ধর্মব্যবসায়ীদের অতি যত্নে রচিত, বিগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানে। মানবতা, নীতি ও মূল্য বোধ দলিত মথিত।[১]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনা কর্মভাবনার সমস্ত দায়িত্ব দেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের উপর। গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদের সমস্ত কর্মগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন সংসারী ধর্ম বজায় রেখেও। হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী শান্তিদেবী পুত্রকে যথাযোগ্য শিক্ষাদানের পর পুত্রের বিবাহ দেন। পুত্র গুরুচাঁদ প্রথমে মায়ের বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি না দিলে পিতার অনুরোধকে আর উপেক্ষা করতে পারে না। আর এই বিবাহদেওয়ার সময় মাতা পিতা যেভাবে গুরুচাঁদকে সংসার জীবন সম্পর্কে বলেছে তাই আদি তথা সর্বকালিক সর্বযুগের মানুষের সার কথা। আলোচনার প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে হরিচাঁদ ঠাকুরও শান্তিদেবীর গৃহজীবন যাপনের মধ্যেই যেমন আদর্শ গৃহধর্ম রয়েছে তেমনি তাদের ভাবাদর্শেই পুত্র গুরুচাঁদ ও সকলহরি ভক্তগণ সেই গৃহধর্মাদর্শকে আদর্শ করে তাদের জীবন অতিবাহিত করেন। পিতামাতা ও পুত্রের কথোপকথনের

মধ্যেই তাদের মানবিক আদর্শের পাশাপাশি সংসার জীবন সম্পর্কে ধারণাটিও পরিস্ফুট হয়েছে। মাতা ও পিতার বিবাহ সম্পর্ককে পুত্রের ছিল অন্যরূপ ধারণা। কারণ হিসেবে গুরুচাঁদ বলে বিবাহ মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও সমাজ কর্তব্যকে ভুলে নিজের ব্যক্তিগহনে নিমজ্জিত হতে হবে বিবাহ করলে কিন্তু শান্তিদেবী ও হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্রকে গৃহধর্মের সুআদর্শ শিক্ষাদেন। আর গৃহধর্ম পালন করার মধ্যেই সমস্ত মানব তার ধর্ম পালনের যোগ্য হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুরে বিবাহ করতে বললে তাঁর অভিমতটি এভাবে ব্যক্ত করেছে—

বিবাহ করিতে মোর না হয় বাসনা।
মায়াপাশে বন্দীহতে প্রাণেতে চাহে না।।
শেষে হয় ভুলে যাব কর্তব্য আমার।
প্রস্তাব না কর মাগো বিবাহ দিবার।।[২]

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম-বিচরণ পাগল, পৃ.৩৪

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরও তৎপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গ্রন্থরচিত হয়েছে সেগুলির গ্রন্থকার গণ ছিলেন হরিগুরুচাঁদের ভাবাদর্শের, কর্মাদর্শের ধর্মমতের একান্তভাবে কাছের মানুষ। এবং হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদের সমসাময়িক মানুষ। ফলে তাঁদের কার্যাবলী গুলিই সুন্দরভাবে তাদের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ভাবজীবন শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তারকচন্দ্র সরকার, তাঁরপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীশ্রীবিচরণ পাগল তাঁর 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্মে।' এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের ব্যক্তিজীবনের বিশাল পরিসরকে বৃহৎআকারে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার তাঁর শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে। আমার আলোচনার সুবিধার জন্য মূলত এই দুটি আকর গ্রন্থকেই গ্রহণ করলাম। তাই প্রথমে গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন কাহিনীটি গ্রহণ করছি 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম' থেকে এবং পরে গ্রহণ করব সামাজিক উন্নতিকল্পে যে যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' থেকে।

এরপর শান্তিদেবীর সংসার সম্পর্কে যে জ্ঞান ছিল তার পরিচয়পাই পুত্রকে উপদেশ দেওয়ার ছলে। আর এই আদেশ থেকে একথা স্পষ্ট যে শান্তি দেবী শুধুমাত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের মাতা নন তিনি সকল ভক্তেরও মাতা হওয়ারই যোগ্য। তিনি নারী হয়েও তার ব্যক্তিগত জ্ঞানই তাকে তার স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের যোগ্য সহধর্মী নিয়ে শান্তি দেবী তাতে কোন সন্দেহ না থাকলেও তাঁর আর একটি পরিচয়ও আমরা পাই, সেটি হল

মাতৃত্বের। মায়ের যে একটি গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা থাকে সন্তানকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাকে সহজ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে সত্যের জ্ঞানালোক দান করার সেটিও তার চরিত্রে রয়েছে। শ্রীমৎবিচরণ পাগল এভাবে শান্তি দেবীর কথাকে ব্যক্ত করেছেন—

শান্তি মাতা বলে শুন আমার বচন।
পিতৃধর্ম রক্ষা কর সুযোগ্য নন্দন।।
...
সেই ধর্ম পালিবারে অমত কর না।
মোরা না আসিলে তুমি কভু আসিতে না।।[৩]

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম'-বিচরণ পাগল, পৃ. ৩৪

এই যে মায়ের তথা জীব সৃষ্টির যে আসল কথা তিনি ব্যক্ত করলেও পুত্রগুরুচাঁদ কোন সদুত্তর করেনি। তখন পিতা হরিচাঁদ তাঁকে বলেন যে তোমাকে অবশ্যই সংসার ধর্ম পালন করতে হবে এবং আমার ভাবাদর্শ ও তুমিই বহন করে সকলকে মুক্তি ভক্তির তথা সাংসারিক মানুষকে ধর্ম ও কর্মের পালনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধ লাভ করা যায় সেই তত্ত্ব জানাতে হবে এবং ঠাকুরের মতাদর্শ মত যে সকল ভক্ত মানব চলছে তাদের রক্ষার ভারও তোমার উপরই দিলাম তোমাকেই আদর্শ সংসার জীবন পালন করে দেখাতে হবে সংসারি মানবই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এই সংসারে থেকেই ধর্ম পালন করা যায় এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হওয়া যায়। সংসারের সার সত্য যেমন গুরুচাঁদকে বলছেন তাঁর পিতা অপরদিকে সমানভাবে প্রযোজ্য হয় সমস্ত সংসার ধর্ম পালন করা মানুষের পক্ষে হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সংসার সত্য বলছেন যা সর্বযুগের, সর্ব কালের মানুষের পাথেয় ছিল আছে এবং থাকবে। তাই পুত্রকে তিনি বলেন—

১. শুন বাছাধন আমি যাহা বলিতেছি।
তোমালাগি যতকিছু সবই করেছি।।
২. মতুয়ার গণ যত তোমার হইবে।
তোমার চরণে সবে মস্তক নোয়াবে।।
৩. তোমা হতে হবে রক্ষা মতো সম্প্রদায়
বিবাহ না কর যদি সমর্পিত কায়।।

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম'-বিচরণ পাগল, পৃ.৩৫

এর পরবর্তীতে দেখা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর পাত্রীর সন্ধান করেছে ও পাত্রীর সন্ধান পেয়েছে এবং সেই সর্বসুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়েছে। কন্যার

পিতার বাড়ি সাতবেড়ে গ্রামে। সেখানে রামকৃষ্ণের কন্যা সত্যভামা, তার সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিবাহ দেন।

সাত বেড়ে গ্রামে হয় রামকৃষ্ণনাম।
উদিত হলেন প্রভু গিয়ে সেই ধাম।।[৪]

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম'-বিচরণ পাগল, পৃ.৩৫

রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন তার আগমনের কারণ তখন ঠাকুর বলেন—

এত দয়া কেন এই অধীনের প্রতি।
কিবা হেতু আগমন হইল সম্প্রতি।।
ঠাকুর বলেন তবে শুনহে এখন।
কন্যা দেখিবার তরে মম আগমন।।[৫]

এরপর যথাযোগ্য সামাজিক প্রথা অনুসারে মহা আনন্দের সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের বর্ণনাও সুন্দরভাবে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে অর্থাৎ গুরুচাঁদ ও সত্যভামাদেবীকে সকল মতুয়া ভক্তরা যে সম্মান দিয়েছেন তা হল মহাদেব ও পার্বতীর স্থান। তাই বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়া কর্মগুলিতেও তাদের সেই সম্মানই প্রদর্শিত হয়েছে। গুরুচাঁদ ঠাকুরও তাদের এই সম্মানকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। সকল মতুয়া ভক্তগণকে তথা সকল মানবকে মনুষ্যত্ববোধের একেবারে সর্বোচ্চ স্থানের সন্ধান দিয়েছেন। বিবাহকালে তো অবশ্যই গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মলগ্নের আগে থেকেই গুরুচাঁদ মাতাশান্তি দেবীর কাছে শিবের একটি মাতা পুত্রের সম্পর্ক সন্ধান পাওয়া যায়। তাই হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বদাই মহাদেব মহেশ্বর সম্মানে ভূষিত হয়েছে। আমার আলোচ্য বিষয় যেহেতু মতুয়াধর্ম তাই বলে নেওয়া ভাল যে মানুষের মধ্যেই থাকে মহাশক্তি তাই মানবই হয় ভগবান। মানুষের মধ্যেই ভগবান হওয়ার সমস্ত সম্পদ রয়েছে। সেই মানুষের জন্যই ধর্মের দরকার। আবার ধর্মকে ধারণ করে মানুষ। আবার ধর্মকে গঠন করেও মানুষ। যারা যারা আজ পর্যন্ত ভগবান আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় সকলেই মানব সন্তান। বাবা মায়ের সন্তান। তারা সকলের আদর্শ মানব সমাজের মানুষ। তাই হরিচাঁদ শান্তি মায়ের সন্তান গুরুচাঁদ ঠাকুরও সেই ভগবান সন্তানরূপে ভগবান আখ্যায় ভূষিত হয়েছে তার মানব জীবনের মাধ্যমেই। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিধাটিও এদেশের প্রাচীন ধারার অনুসারী হয়ে সেই ভাবেই পরিচিত হয়েছে—

শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবাহ হইল।
পর্ব্বতী শঙ্কর এক আসনে বসিল।[৬]

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম'-বিচরণ পাগল, পৃ.৩৭

সামাজিক মানুষই সমাজের আদর্শ। সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ জ্ঞানবান, ধনবান, মানুষ যে কাজ করে সকলেই সেইভাবে চলতে চায়। বিবাহ প্রথা প্রাচীন কাল থেকেই বহমান ছিল। আজও আছে আর সংসার জীবনের মাধ্যমেই মানুষ সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে পারে। আর সমাজের মানব মৈত্রির বন্ধন হল বিবাহ বন্ধন। কারণ, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দুটো পরিবারের আত্মীয়তার সঙ্গে সেই গ্রাম সমাজেও মৈত্রীভাবের সূচনা ঘটে থাকে। বিবাহের দ্বারা দুটো পরিবারের দুটি মানব সন্তানের মেলবন্ধনের সাহায্যে সেই উৎসবে গ্রাম সমাজের সকলেই আনন্দে মেতে তাদের সহযোগিতা করে। এই বন্ধন যে নারীর পক্ষে অন্য আর একটি পরিচয় বহন করে। নারী জন্ম লগ্নে কারও কন্যা বিবাহের দ্বারা হয় কারও স্ত্রী এবং সন্তান জন্মানোর পর যে কারো মাতা। এভাবেই একজন পুরুষের ক্ষেত্রে ও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। আর এটিই যেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলে। মানব জীবন এই একই বৃত্ত থেকে শুরু হয় আর তার ক্রম পরিণতিই হল তার লক্ষ্য। নব বধূর নতুন গৃহে আসার পর পুত্র ও পুত্রবধূকে শান্তি দেবী তাদের বরণ করে ঘরে তোলে। এবং সেই পরিচয়টি হল—

শান্তি মাতা পুত্রবধূ যতনে লইল।
সত্যভামা কারো পানে কভু না চাহিল।।
গুরুচাঁদ বলে কেন চক্ষু মুদে রও।
সরল ভাবেতে এবে আঁখি মেলি চাও।।

বিবাহের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া ক্রমশ সমাধান করে পরে সংসারের দায়িত্ব দেন হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের উপর। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সত্যভামা দেবীকে আদর্শ গৃহ ধর্ম শিক্ষা দেন নিজে হরিচাঁদ ঠাকুর। 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে 'গৃহাশ্রমের শিক্ষালাভ' অংশের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্রকে আদর্শ গৃহধর্ম পালনের শিক্ষা দান করেছেন সমাজ সংসারের যুগোপযোগী করে। আচার্য মহানন্দ হালদার তাঁর 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' এর বর্ণনায় 'গৃহাশ্রমের শিক্ষালাভ' অংশ থেকে পাই হরিচাঁদের শিক্ষাদর্শভাবনার পরিচয়।

কিছু কাল পরে সেই শ্রীহরি ঠাকুর।
গুরুচাঁদে ডাকি বাক্য কহিল প্রচুর।।
শুন পুত্র তব কাছে মোর সমাচার।
আজি হাতে দিনু তোমা সংসারের ভার।

...

নিজালয় বসি কর্ম্ম কর ধর্ম্মমতে।
ধর্ম্মে দিবে যশমান ধনের সহিতে।।
'রিপুনাশে' ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্ববিধ ফল।
ষড়রিপু হতে পূরে থাক চিরকাল।।[৭]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৬-৪৭)

আবার সংসার ধর্ম পালনের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সংযমী হয়ে জীবন যাপন করলে তবেই আদর্শ গৃহধর্মকে রক্ষা করা যায়। গৃহধর্মের মাধ্যমেই হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্ম্ম পালন ও কর্ম্মকে সঠিক ভাবে পালন করার কথা বলেছেন। যাতে মানুষ ভোগ ও ত্যাগ, কর্ম ও সন্ন্যাস, একই সময়ে পালন করে মানবজীবনকে পূর্ণতার আদর্শে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। ভোগসর্ব্বস্ব হয়ে জীবনাচরণ করা নয় ভোগকে যথাসম্ভব ত্যাগ করে ভগবানের নামগান করার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে গৃহকর্ম করতে পারলেই আদর্শ গৃহধর্ম্ম পালন এবং সন্তান সন্ততিদের সঠিক শিক্ষার দ্বারা তাকে সমাজের আদর্শ মানবে পরিণত করতে হবে। পুত্রকে শিক্ষা যেমন দিয়েছেন তেমনি পুত্রের সঙ্গে সমানভাবে পুত্রবধূকেও সংসার সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদের আদর্শ অনুযায়ীই পুত্র গুরুচাঁদ সামাজিক অগ্রগতির জন্য সকল কর্ম করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত পিতা ও পুত্র মিলে যে ধর্মভাব ও কর্মভাবকে অগ্রসর করেছেন তা সত্যিই মানব ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। এমন অক্লান্ত দুই মহামানবের সত্যই প্রয়োজন ছিল। আর সেই নব ভাবের দ্বারা প্রবাহিত হয়েও মানব তার সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বজায় রেখে মানবেতিহাসের ধারাকে বজায় রাখতে পেরেছেন হরিচাঁদ ও গুরু চাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চলার জন্য। তাই হরিচাঁদের ধর্মাদর্শকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। পুত্রবধূ সত্যভামাকে নির্দেশ দেন সতীনারীর আদর্শ বজায় রাখতে। হরিচাঁদ ঠাকুর যা বলেছেন—

আর দিন ডেকে বলে সত্যভামা যায়।
শুনগো জননী মোর কল্যাণ আশ্রয়।।
...
কেবা পিতা কেবা মাতা কেবা বন্ধু ভাই।
পতি ভিন্ন রমণীর অন্যগতি নাই।।[৮]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭)

মানব জীবনে নারীর স্থান অর্থাৎ সমাজে নারীর যে গতানুগতিক পরিচয় রয়েছে এত কাল তারই পরিচয় দিয়েছেন। হরিচাঁদের ভাবাদর্শ অনুযায়ী সুগৃহিনীর যে ব্যাখ্যা তা হল পতিব্রতা হয়ে নারীর সংসার জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের সেই বাণীকে তুলে ধরলাম—

সুগৃহিনী বলে কারে শুন বলি তাই।
সু অর্থে পবিত্র জান ইথে ভুল নাই।।
পবিত্র রহিয়া যেবা পতি সেবা করে।
লক্ষ্মী আসি বাস করে সদাতার ঘরে।।

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭)

হরিচাঁদ ঠাকুরের এই যে শিক্ষা সেই শিক্ষালাভের পর সত্যভামা দেবী ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানায় যে তারা দুজন যেন তোমার আজ্ঞা পালনে সমর্থ হয়। আর তুমি যে শুধু আমার গুরু নও তুমি সত্যিই জগৎ গুরু। সত্যভামাদেবী তার মনোবাসনা জানায় এভাবে—

ওগো পিতঃ এ অধিনী এই ভিক্ষা চায়।
পতিপদে মন যেন সদা মোর রয়।।
তব আজ্ঞা পালিবারে পারে যেন পতি।
তাঁর দাসী হতে যেন মোর মতি।।
মোরা দোহে হই যেন তোমার সেবক।
তুমি সে পরম গুরু বিশ্বের জনক।।"[৯]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭)

এরপর নিশ্চিন্ত মনে হরিচাঁদ সংসার ভার গুরুচাঁদ ও সত্যভামা দেবীকে অর্পণ করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর সংসার থেকে দূরে গেলেন না কিন্তু সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তিনি তার নামধর্ম করার জন্য সর্বভাবে প্রস্তুত হতে পারলেন। যা মানব চিত্তকে নির্মল পবিত্র করার কাজটি তিনি করতে আরো বেশি মনোযোগ দিতে পারলেন তারই নিখুঁত পরিচয় পাই আচার্য মহানন্দ হালদার রচিত 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থখানিতে। জগৎ জননী হওয়ার সর্ববিধ উপায় তিনি তাকে দান করলেন। এবং এত দিন অর্থাৎ উনবিংশ শতকের আগে প্রায় নারীর ধর্মাচরণ অর্থাৎ জীবন যাপন করার নির্দেশ ছিল না। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুর স্বামী সহধর্মীনিকে স্বামীর যোগ্য সহচর হওয়ার জন্য সেবা করার নির্দেশ দানের

সঙ্গে তাকে ধর্ম জীবন পালনের কথা বললেন। কারণ সমাজের একটি পক্ষকে ধর্মদান করলে একদিক আলোকিত হবে, নারীরা সেই জ্ঞানালোক থেকে বঞ্চিত থাকলে সমাজের অর্ধেক মানুষই অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। তাই সমাজের ধর্মচেতনার আলোকে হরিচাঁদ যেভাবে দিলেন তাতে নারীরও সমাজে পুরুষের মত ধর্ম জীবন পালনে অধিকার থাকা চাই। তাহলে তারা স্বামীর সঙ্গে একযোগে যেমন সংসার ধর্ম পালন করতে সক্ষম হয়ে থাকে তেমনি ধর্মভাবনার দ্বারাও যদি স্বামীর সহযোগী হয় তাহলে তৎকালীন যে শাস্ত্রীয় জ্ঞানযোগ তথা জ্ঞান লাভ করলে নারীও জ্ঞান লাভ করবে। ফলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মে অর্থাৎ তাদের সন্তানরা মায়ের কাছ থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। ফলে সমাজের সার্বিক কল্যাণেও নারীর সর্বক্ষেত্রে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব হবে না। হরিচাঁদ 'হরিনাম'কে জীবমুক্তির জন্য ব্যবহার করেননি কেবলমাত্র মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ কামনাকে পূর্ণতার জন্যই ব্যবহার করেছেন। আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রতিটি পর্ব থেকে পর্বান্তরে তার স্বরূপকে উদ্ঘাটন করব। আচার্য মহানন্দহালদারের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়—

এসব কহিয়া হরি সংসার ছাড়িল।
অবিরাম হরিনাম প্রচার বাড়িল।।
ভক্ত সঙ্গে মনোরঙ্গে নাম গুণ গান।
ঘরে ঘরে নাম রসে উঠিল তুফান।।
নাম অস্ত্রে করে হরি প্রথম আবাদ।
কৃষক সাজিয়া ভূমি কর্ষে গুরুচাঁদ।।

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.৪৭)

উনিশ শতককে বলা হয় নব জাগরণের সময় এই সময় সামজ ও সাহিত্যে মানবতা বোধের জাগরণ ঘটল। যা সমাজে ছিল না। মানুষ ছিল ধর্মভাবাপন্ন। মানব মন তখন থেকে একটু একটু করে দেবতা থেকে সরে এসে যুক্তির দ্বারা বুঝতে লাগল। আর তখন থেকেই কেবল মাত্র ধর্ম হলেই তাকে বিশ্বাস করতে হবে এমন নয় তার মধ্যে মানব জীবনের সার সত্য নিহিত আছে কিনা সেগুলিও যাচাই হতে লাগল মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুর এমন একজন জ্ঞানালোক সম্পন্ন মানব যে তিনি কেবল মাত্র শাস্ত্রকেই বিশ্বাস করতে বললেন না। শাস্ত্রের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তার ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন। শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মানব পবিত্রভাবের অধিকারী হয়। এবং শাস্ত্র

গ্রন্থের নিয়মাবলী তো মানবজীবনের কল্যাণের জন্যই রচিত হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ ভগবানের বিগ্রহ যখন মানব জীবনে বিভেদের সৃষ্টি করে তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে মূল সত্যের সন্ধানের। মূল সত্য থেকে মানব যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখনই আসে ঘোরতর বৈষম্য। সমাজ হল মানব জীবনের ভিত্তি। আর সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সমাজে যে ক্রিয়া কর্মগুলি ঘটে চলে গ্রন্থকার বা লেখক সেই বিষয়ের সঙ্গে মনের ভাবকে মিশিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। লেখক যে সময়ের সমাজের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেন সেই সময়ের সমাজ ইতিহাসের সন্ধান করলেই সেই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপট জানা যায়।

মানব জীবন হল পরিপূর্ণভাবে সৌন্দর্যের বিকাশের সময়। মানব জীবনেই সকল শুভকর্মের দ্বারা মানবজীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়ে তোলা সম্ভব হয় আদর্শ শিক্ষা লাভের দ্বারা। আর মানুষের বসবাস ক্ষেত্র আপন গৃহ আর সেই গৃহের কর্তা মাতা পিতা যদি শিক্ষার অর্থাৎ সর্বভাবে শিক্ষিত হয় সন্তান সন্ততিও সেইভাবেই শিক্ষা লাভ করে জীবন যাপন করবে। শিক্ষার জন্য চাই সংযম যা মানসিক স্থিরতাকে বজায় রাখে ও কর্মে সফলতা আনে। গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মহাসাধু গোলক পাগল নামে খ্যাত ঠাকুরের একজন ভক্ত পরীক্ষা করেছিল। পরীক্ষার কারণ যে হরিপুত্র গুরুচাঁদ যে সংসার জীবনের ভার পেল পিতার কাছে তার কতটা রয়েছে সংযমী মন ও ধৈর্য্য শক্তি তার পরীক্ষা। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। পরে হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদকে সেই উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে তার মনের পরীক্ষার কথা জানায়। আর পিতাকে গোলক পাগল সম্পর্কে অভিযোগ জানায় গোলক 'অলস বুড়া' বলে। তখন হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক পাগলের যথার্থ ভাবনার কথা ব্যক্ত করে বলে— সংসার জীবনের তথা মানব জীবনের মূল সত্যকে উদ্ঘাটন করেন এভাবে—

শোন গুরুচাঁদ তুমি চেন না গোলকে।।
তোমাকে দিয়াছি আমি সংসারের ভার।
...
আর শোন গুরুচাঁদ আমার বচন।
আমি যবে না রহিব কি হবে তখন।।
সংখ্যাতীত নরনারী সকলি আসিবে।
নানাভাবে সবে মিলি বিরক্ত করিবে।।
সকলি সহিতে হবে ধৈর্য্য শক্তি দিয়ে।
সে সব এখনে শেখ একমন হয়ে।

আর শোন জ্ঞানী লোক যেই কথা কয়।
'যে সয় সে মহাশয়' কথা মিথ্যা নয়।।

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৮-৪৯)

মানব জীবনে কর্মের দ্বারাই তাকে তার উদ্দেশ্য সফল করে। আর অধৈর্য্য, অসংযমী মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। কর্ম করতে গেলে শারীরিক ও মানসিক উভয় বিধ চর্চা থাকা চাই তবেই. মানব জীবন কর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করা যায়। কথায় বলে 'বড় গাছে ঝড় লাগে।' কিন্তু সর্বদাই মানব মনকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে তা নাহলে বড় বা মহৎহৃদয়ের মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা নিতে গেলে বাধা বিঘ্নরূপ ঝড় তো আসবেই তাকে স্থিরচিত্তে বা অবিকার চিত্তে সহ্য করে আপন কর্মের প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে তাহলেই ধৈর্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েও কর্মজীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলা যাবে। এই যে মানব জীবনের মহৎশিক্ষা তা আমরা ভক্তগোলক গোস্বামী গুরুচাঁদ ঠাকুরকে পরীক্ষা করার ছলে করলেও আজ এই মহাশিক্ষার দ্বারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হতে পারছি। এভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর সংসার জীবনের যে শিক্ষা পান পিতা এবং মাতা ছাড়াও বহু পিতৃতুল্য ভক্তদের কাছ থেকে তা আজ মহাশিক্ষার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর মাতা শান্তিদেবী ও পুত্রকে পরীক্ষা করেছে 'সংসার ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ'। কিন্তু সেখানে দেখা যায় আর পুত্র হেরে যায়নি মাতার— পরীক্ষার কাছে। উপযুক্ত অর্থপূর্ণ জবাব দিয়েছে মাতাকে। পুত্রের এহেন যুক্তিপূর্ণ বাক্যালাপে মাতা পুত্রকে আশির্বাদ করে বলেন—

তব বাক্যে বাছা মোর ঘুচিল সংশয়।।
যেভাব তোমার মনে তাই যেন থাকে।
অভাব কখনো বাছা ছোবে না তোমাকে।।
আর আশীর্বাদ করি শুন বাছাধন।
তব ঘরে দিবে লোকে দ্রব্য অগণন।।[১০]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৬-৫৭)

হরিচাঁদ ঠাকুরের যে আদর্শ গৃহ জীবন শিক্ষা পুত্রকে দিয়েছেন ঠিক তেমনি একই আদর্শ শিক্ষা পুত্ররূপী ভক্ত দুঃখী মানব সমাজের সকলকে দিয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর যে বাণী সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে 'মাতা পিতাকে ভক্তি কর' আবার কখনো তিনি একেবারে গ্রামের প্রচলিত ভাষায় বলেছেন—

মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। সেই আদর্শ জীবনই পুত্রকে দেওয়ার পাশাপাশি অগণিত মানুষকে তিনি দিয়েছেন। আজও শ্রীহরির সেই বাণীগুলি হরির আশীর্বাদ রূপে সকলে বহন করে চলে এবং শ্রদ্ধা সহকারে তা পালন করে।

গুরুচাঁদ ঠাকুর সে জায়গায় বসবাস করতেন সেই জায়গায় যে পরিবেশ পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় সেখানকার গ্রামাঞ্চল ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও সেখান থেকে শহর বন্দর ছিল অনেক দূর এবং কোন যানবাহনের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র পদব্রজ, পথও অনেক কষ্টসাধ্য। আর সেখানকার প্রধান যাতাযাতের মাধ্যম হল নৌকা। নৌকার সাহায্যে সেখানকার মানুষ শহর বন্দর, তথা দূর দেশে যাতায়াত করত। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' থেকেই শুধু আমরা ওড়াকান্দীর ভৌগোলিক পরিবেশের সন্ধান পাইনা। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের যে কার্যাবলীর স্থানগুলির বর্ণনা থেকেও সেই জায়গার পরিচয় পাই। সেখানে বর্ণনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থের মধ্যে। 'অর্থ উপার্জন' অধ্যায়ের যে বিষয় রয়েছে সেখানে ওড়াকান্দীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।

বিলে ভরা জলা দেশ ওড়াকান্দী আদি।
নিকটে নাহিক কোন স্রোতস্বতী নদী।।
শহর বন্দর দূরে যেতে কষ্ট-সাধ্য।
পদব্রজে গতায়াত বড়ই অসাধ্য।।
বর্ষমধ্যে বেশীভাগ বিলে খালে জল।
নৌকা যোগে যাতায়াত করেন সকল।।

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬১)

জলমগ্ন থাকে অধিকাংশ সময় ফলে জমিতে ধান পাট সরিষাকলাই ইত্যাদি খাদ্য শস্যগুলি অনেক সময় হয় না ফলে অন্নাভাব, আর্থ-সামাজিক উন্নতি থাকে না তাই অন্নাভাব অনাহার দেখা যেত অনেক সময়। এই দুর্ভিক্ষের সময় মল্লকান্দী গ্রামের মানুষ এক সময় সকলে মিলে হরিঠাকুরের কাছে গেছে তাদের জীবন সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য হরি ঠাকুর তাদেরকে বলে কৃষিকাজ ভাল করে করারজন্য এবং দ্বিতীয় কথা বলে বাণিজ্য করে আর্থিক উন্নতির জন্য। কৃষিকাজ সঠিকভাবে করতে পারলে খাদ্যের কোন সংকট দেখা দেয়না আর বাণিজ্য করতে করতে পারলে ঘরে ঘরে অর্থের অভাব হয় না। মানব জীবনের

দুঃখের কারণ যে নিষ্কর্মা হওয়ার জন্য তিনি এই কথাটিকেও ব্যক্ত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানব জীবনকে উন্নত করার কথা বলেছেন যেমন তেমনিভাবেই কর্মের দ্বারা সংসার জীবনেও আর্থিক উন্নতির দ্বারা মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা বলেছেন— সবসময়। মানুষের যে আধুনিক শিক্ষা দরকার তার প্রচলন হল উনিশ শতক থেকে। এর আগে যে শিক্ষা তাহল ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা নেওয়া। উনিশ শতক থেকেই মূলত আধুনিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা এর ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রের মানুষের শিক্ষাচেতনার বিকাশ হয়। মানুষ যে শিক্ষার দ্বারা সত্যিকারের মনুষত্যবোধের পরিচায়ক হতে পারে সে বিষয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর সকলের থেকে এগিয়ে একথা বলাই বাহুল্য। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর দুটো মানুষ কি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা যেমন নিজের উন্নতি বিধান করেছেন এবং সেই একইভাবে সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুর কোন একটি দিককে আলোকিত করে মানব জীবনকে অগ্রগতির পথ উন্মোচন করেন নি। পিতা পুত্রের কর্মাদর্শকে সার্বিকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে তারা আজকের মানবের যে আধুনিক ভাবনা তার মেরুদণ্ড নির্মাণ করেছেন উভয়ে কর্মদ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের ধর্মনবজাগরণের মূলধার আর গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজ সংসারের কর্মের মূলাধার। অর্থাৎ ধর্ম ও কর্মের মেলবন্ধনে মানব জীবনের মূল ভিত্তি তাঁর প্রতিষ্ঠাতা এই দুই মহামানব।

মানব সমাজের যে আদর্শস্থায়ীভাবগুলি নিত্যনতুন হয়েও চির পুরাতন তা হল ধর্ম ও সংসার। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানুষ কোন আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় কোন একজনকে মান্য করে। শিক্ষা বিস্তারে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ' এই অধ্যায়ে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে তখন পাঠশালা করে শিক্ষার সূত্রপাত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। শিক্ষা ছাড়া মানুষের গতি নাই তা বুঝতে পারেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই তিনি শিক্ষার জন্য সভার আয়োজন করে বলেন যে—

দত্তডাঙ্গা সভা মধ্যে গুরুচাঁদ কয়।
শিক্ষা বিনা এ জাতির নাহিক উপায়।।
সেই বাণী সবে মানি নিল দেশে দেশে।
পাঠাশালা করে সবে পরম উল্লাসে।।[১১]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৬)

এইভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজের অর্থাৎ সমাজের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হলে

শ্রীগিরিশ চন্দ্রবসু নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার সম্মান করে বলেন যে তিনিও তার সহযোগী হয়ে গ্রামের তথা সমাজের কল্যাণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে সমাজের উন্নতি করতে চান। তখন তাদের শুভইচ্ছার অনেক আলোচনা করেন এবং সেই কথাই স্থির করে স্কুলের জন্য জায়গারও সন্ধান দেন গুরুচাঁদ ঠাকুর কিন্তু জাতিভেদ প্রথা যে হিংসার প্রধান কারণ তাই স্কুলের প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বসু মহাশয়কে আর নমঃজাতির মধ্যে স্কুল করে দেওয়া সম্ভব হয় না। দেখা যায় নমঃজাতির প্রতি অন্যজাতির ঘৃণা। তাই সকল কায়স্থ ব্রাহ্মণ মিলে গিরিশ বসুকে তার স্কুল স্থাপন করা থেকে বিরত করে দেয়। গ্রামবাসী সকলে পরামর্শ করে স্কুলকে তাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে স্থাপন করে এবং বলে চিকিৎসালয় দিতে চায় দিক। নমঃজাতির প্রতি অন্য জাতির মনোভাবটি এই স্কুল করাকে কেন্দ্র করে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা পায় যদি নমঃশূদ্রগণ।।
কিছুতে নিস্তার মোরা নাহি পাব আর।
নমঃশূদ্র করিবেক সব অধিকার।।[২২]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৯)

শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রাখার যে বাসনা ব্যক্ত হয়েছে তা সুন্দরভাবেই বোঝা যায়। শিক্ষা পেলে আর অজ্ঞানতা থাকে না তাদেরকে ঠকানো যাবে না। এ ভিত্তি থেকে গেছে তাদের হৃদয়ে। আর শিক্ষার অধিকারকে সকলে সম মর্যাদায় পেলে সমাজ দেশ সকলের উন্নতি হবে। তা এই মানুষগুলির মনে জাগরিত হয় নি। তাই এহেন কর্মকে তারা করতে চায়। বিদ্যা বিস্তারের মাধ্যমেই তার মর্যাদা একথা ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের একটি অন্যতম প্রধান দিক হলেও সকলে সমমর্যাদায় সেই জাগরণকে মেনে নিতে পারেন নি। তারই প্রতিনিধিদের পরিচয় আমরা পাই এই শিক্ষার আলোকে পাওয়ার ক্ষেত্রে। বসু মহাশয়ের ছিল নিজ গ্রামের প্রতি মমতা তাই তিনি সমাজ সেবার প্রথম কাজটি নিজের গ্রামেই করতে চেয়েছেন কিন্তু গ্রাম থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের জাতির কথা। সেই দিক নির্দেশ করেছে সকলে। তারই সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই—

চিকিৎসালয় দিবে দাও নাহি করি মানা।
স্কুল দিবে কোন মর্ম্মে কিছু তো বুঝি না।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ কোথা যেথা তব ঘর।

তুমি বাস কর বাপু! নমঃর ভিতর।।
নমঃ জাতি চিন তুমি বিদ্যা শিক্ষা নাই।
বিদ্যাহীন বলে মোরা তাদের চরাই।।
স্কুল যদি পায় তারা বিদ্বান হইবে।
আমাদের মান বাপু কভু না রহিবে।।[১৩]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.১৩৯)

এই যে বসু মহাশয়কে অনেকে মিলে তার স্কুলকে ঘৃতকান্দি থেকে নিয়ে ফুকুরাতে হবে বলে বন্দোবস্ত করে একথা গুরুচাঁদ ঠাকুর যখন শুনলেন তিনি স্থির চিত্তে সকলকে সান্ত্বনা দেন যে ভালই হয়েছে এই কর্মের দ্বারা। নমঃজাতির মানুষের নিজের পায় ভর করে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে। তোমরা নিজেরা নিজেদের কর্মকে করার মত শক্তি অর্জন কর। গুরুচাঁদ ঠাকুরের অভিমতটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে—

প্রাণপণ কর সবে আর কথা নাই।
যেভাবে সে ভাবে হোক স্কুল করা চাই।।
উচ্চবিদ্যালয় যদি করিতে না পার।
যাহা পার তাহা কর কাজে কেন হার?
আমি বলি মধ্য বাংলা কি মধ্য ইংরাজী।
স্কুল কর স্কুল কর কথা সোজাসুজি।।
ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে ওড়াকান্তি গ্রামে।
সেই স্কুল কর সবে মধ্য ইংরেজী নামে।।[১৪]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪২)

বাঙালির ইতিহাসের অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বাঙালির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজল্যাণ কর্মে নিযুক্ত গুরুচাঁদ ঠাকুর আজও প্রায় অপরিচিত রয়েছে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের কর্ণধারদের কাছে। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজ কর্মের দ্বারাই আজ সর্বোচ্চ আসনের দাবীদার। তার শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে তার কার্যকলাপেই শুধু সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। তিনি শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল করেন নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও সমাজের মানুষকে নিয়ে। ওড়াকান্দিতে নমঃ জাতির মধ্যে প্রথম স্কুল হল। তারপর গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই শিক্ষা ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে জনসভা করেছেন এবং সকলকে শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হওয়ার জন্য আহ্বান

করেছেন। এই শিক্ষা চিন্তার প্রথমেই যে বাধা এসেছিল তাহল জাতিগত বিদ্বেষ। তাই তিনি সেই গ্লানিকে সর্বদা স্মরণরেখেও তার কাজকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর এই সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য হল—

শিক্ষা-হারা দীক্ষাহারা ঘরে নাহি ধন।
এই সবে জানি আমি আপনার জন।।
সবাকারে বলি আমি যদি মান মোরে।
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।
খাও বা না খাও তাতে কোন দুঃখ নাই।
ছেলে পিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই।।[১৫]

(আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত',
তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৪)

এই যে শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পটি গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রথম শুরু করলেন তার আগে হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্ম নীতিদান করেছেন নবভাবে। আর গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিভক্তদের সমাজকে আধুনিক শিক্ষার আলোকে দান করে নবভাবে নমঃ সমাজকে শুধু নয় যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় তাহলে দেখা যায় গুরুচাঁদ ঠাকুরের ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার কর্মে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়ে আছেন। শুধু শিক্ষা নয় মানব জাতির যা কিছু কল্যাণময় দিক সার্বিকভাবে তাদের উন্নতি বিধান করেছেন। আজ হরিচাঁদ ঠাকুর আর গুরুচাঁদ ঠাকুর ভগবানরূপে পূজিত হন। ভগবান রূপের কথাটি বাদ দিলেও তাদের মানব জীবন ছিল সমাজের সর্বোচ্চ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত তাই মানুষ হিসেবেও তারা সর্বোচ্চ শিখরের অধিকারী একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

CHATURTHABARTA
(A Journal for Dalit Society & Culture)
October, 2016 & April, 2017
Edited by: Dr Sudhangshu Sarkar
Email: sudhangshusarkar37@gmail.com

ISSN 2319 - 1325
Issue: V & VI
Vol: X & XI

With Best Compliments from

NEW PRIYAFURNITURE

Proprietor :
Provash Sarkar
Mobile : 98320-54307

Deals in Latest Model
of
Wooden Furniture

Shibmandir, Near State Bank of India
P.O.- Kadamtala, Dist.- Darjeeling

দিয়া পাবলিকেশন

প্রকাশনা সহায়তায়

Cover : Tushar Roy, Diya Graphics